GIFT

কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Library
466250

পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

466250

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১১ইং।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
DIGITIZED

কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

466259

ইয়াসমিন আহমেদ
পি, এইচ, ডি, কোর্সের শিক্ষাবর্ষ
২০০৪-২০০৫ইং
পুনঃ- (২০০৯-২০১০ইং)
রেজিস্ট্রেশন নং-১০৭
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩- ১৯৫৮ : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

গবেষক

ইয়াসমিন আহমেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466250

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

সূচীপত্র

⇒ প্রত্যয়ন পত্র I

⇒ মুখবন্ধ II

⇒ কৃতজ্ঞতা স্বীকার III

⇒ গবেষণা সার সংক্ষেপ IV

অধ্যায় – ১	ভূমিকা	পৃষ্ঠা নং
১.১	সমস্যার বিবরণ	১
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৩	গবেষণার অনুকল্প	৬
১.৪	গবেষণার কালানুক্রম	৬
১.৫	গবেষণা পদ্ধতি	৭
১.৬	তথ্য ও উপাত্তের উৎসসমূহ	৮
১.৭	অধ্যায় করণ	৯
১.৮	সাহিত্য পর্যালোচনা	১১

অধ্যায় - ২	অনুসন্ধানের পটভূমি	পৃষ্ঠা নং
২.১	সামাজিক স্থবিরতা	২০
২.২.১	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব	৩৪
২.২	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তৎকালীন পূর্ব বাংলা	২৮
২.৩	পূর্ব বাংলায় সাংবিধানিক রাজনীতির প্রক্রিয়া	৪৪
২.৩.১	বিট্রিশ উপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত রাজনীতির প্রধান প্রধান দিক	৪৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩	কৃষক প্রজা সমিতি থেকে কৃষক প্রজা পার্টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তর ও পাকিস্তানের জন্ম	পৃষ্ঠা নং
৩.১	পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা সমিতি	৬৮
৩.১.১	পূর্ব বাংলায় রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টি	৭৮
৩.২	পাকিস্তানের রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টি	১২৮
৩.৩	কৃষক শ্রমিক পার্টির জন্ম	১৩৮
৩.৩.১	লাহোর প্রস্তাব	১০৩
৩.৩.৩	ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন	১১১

অধ্যায় - ৪	পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন ও কৃষক শ্রমিক পার্টি	পৃষ্ঠা নং
৪.১	সাংবিধানিক রাজনীতি ও এর ক্রমবিকাশ	১৩৯
৪.১.১	মুসলিম লীগের উদ্ভব	১৪৭
৪.২	পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উৎপত্তি	১৪৮
৪.৩	১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন	১৫৯
৪.৪	যুক্তফ্রন্ট	১৬১
৪.৪.১	যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো	১৬৪
৪.৪.২	যুক্তফ্রন্টের অঙ্গ দলসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৬৭
৪.৪.৩	নির্বাচনী প্রচারণা কেন্দ্রিক রাজনীতি	১৭০
৪.৪.৪	নির্বাচনের ফলাফল	১৭৫
৪.৪.৫	নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা	১৭৭
৪.৫	যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক প্রাদেশিক সরকার গঠন	১৮৪

অধ্যায় - ৫	যুক্তফ্রন্ট সরকার	পৃষ্ঠা নং
৫.১	যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম	১৮৬
৫.১.১	১৯৫৪ সনে পাশকৃত আইনসমূহ	১৮৭
৫.২	কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী	১৯৭
৫.৩	কেন্দ্র ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্বন্দ্ব	২০৯
৫.৪	যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন	২১৩
৫.৫	কৃষক শ্রমিক পার্টির ভূমিকা ও রাজনীতিতে কৌশলগত অবস্থান ঃ ১৯৫৮ পর্যন্ত	২১৫
৫.৫.১	সামরিক শাসন জারী ঃ ১৯৫৮	২২৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৬	উপসংহার	পৃষ্ঠা নং
৬.১	কৃষক শ্রমিক পার্টির অবস্থান সফলতা ও ব্যর্থতার পর্যালোচনা (১৯৫৩-১৯৫৮)	২৩০
৬.২	গবেষণার ফলাফল	২৪৫
৬.৩	অভিমত	২৪৬

- পরিশিষ্ট (Appendixes) ২৫০
- গ্রন্থপুঞ্জী (Bibliography) ২৫২
- প্রবন্ধ (Articles) ২৫৬
- দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা (Papers) ২৫৮
- দলিল (Documents) ২৫৯
- ছক (Tables) ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইয়াসমিন আহমেদ উপস্থাপিত "কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত ও উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা কাজ সন্তোষজনক। এটি বা এর কোন অংশ অন্য কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি বা কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

শওকত আরা হোসেন

প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র হিসেবে হাজার সমস্যায় পর্যদুস্ত বাংলাদেশ উন্নয়নের যাত্রাপথে বারবার বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সমস্যা উত্তরণে সামান্য হলেও অন্তত কিছু একটা করার আকাক্ষা মনে মনে বহুদিন থেকে লালন করে আসছিলাম। "কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩- ১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক পি.এইচ.ডি. গবেষণার মাধ্যমে এদেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে যৎসামান্য কাজ করার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত মনে করছি।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এ গবেষণা প্রকল্পটি যে অত্যন্ত সময়োপযোগী তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু আমার পক্ষে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর কতটুকু কাজ করা সম্ভব হয়েছে সেটাই আসল কথা। তবে এতটুকু অন্ততঃ উল্লেখ করতে পারি যে, অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি বস্তুনিষ্ঠ, তথ্য সমৃদ্ধ ও মান সম্পন্ন করার পেছনে আমার শারীরিক ও মানসিক শ্রমদানে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এরপরও অনিচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা ও ভূলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কাজেই আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আবেদন করছি।

পরিশেষে আমার এ ক্ষুদ্র গবেষণা কর্মটি যদি দেশ ও জাতির সামান্যতম প্রয়োজনে আসে তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ইয়াসমিন আহমেদ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও গবেষণা প্রকল্পটি উপস্থাপনা করা সম্ভব হোল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রভূতঃ সমস্যা থাকায় গবেষণা পত্রটি রচনায় অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, দূর্লভ দলিল, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, পরিসংখ্যান এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বহুজনকে বিরক্ত করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ন্যাশনাল আরকাইভস, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এক কথায় গবেষণা প্রকল্পটি অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফল যার অন্তরালে সহযোগীতাকারীদের ঐকান্তিক অবদান মূখ্য হিসেবে কাজ করেছে। তা না হলে হয়তো অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করা সম্ভবপর হতো না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রথমেই যার নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তিনি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শওকত আরা, যাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভাষাও নেই। আমি সদা সর্বদাই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা ও উপদেশ লাভ করেছি। চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি খুবই ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে সময় দিয়েছেন অকৃপণভাবে। তারপরই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম নজরুল ইসলামকে, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও ভূমিকা ছাড়া আমার পি. এইচ. ডি. কোর্সে ভর্তি সম্ভব হতো না। যাঁর বিদেশে অবস্থান আমার গবেষণা কর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করছি আমার বড় বোন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম ও বড় ভাই প্রফেসর ড. মোঃ মুনিরুজ্জামান, উপ-উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এর কাছে। তাদের উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য সব সময়ই এ গবেষণা কাজের জন্য আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। আকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই ড. অরুণ কুমার গোস্বামীকে। যিনি নানা সময়ে গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন।

স্মরণ করছি বন্ধুবর নাজমা ইসলাম, সেলিনা জামান এবং প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জুনায়েদ, মিতি, রুদায়না রাজীব, জেরিন, তানিম ও রিসাদকে। এরা অনেক কষ্ট করে সবগুলো লেখা দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করে এবং উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ- উপচার্য ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদের কাছে। যাঁর লেখা বই থেকে আমি অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ- উপচার্য ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদের কাছে। যাঁর লেখা বই থেকে আমি অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটারে থিসিস কম্পোজ করার জন্য জনাব মোঃ আব্দুল মতিন এবং মোহাম্মদ নূর-উন-নবীকে ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে যাঁর কথা না বললেই নয় তিনি আমার স্বামী জনাব আনিসুর রহমান। তাঁর সহিষ্ণুতা, উৎসাহ আমাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে কাজটি সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে।

স্মরণ করছি বিভিন্ন বইপত্র, পত্রিকার লেখক ও কলামিষ্টদের, যাদের লেখা থেকে সাহায্য না নিলে হয়তো গবেষণাটি রচনা করা সম্ভব হতো না।

গবেষণায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারী আদেশ, অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট, সংসদ বিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও দলের প্রচারপত্র, মেনিফেষ্টো, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, দেশী ও বিদেশী সাময়িকী এবং প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী। এছাড়া রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বিশেষতঃ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের সঙ্গে যারা রাজনীতি করে বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে গবেষণার উপযোগী বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ উত্তরণে যারা আমাকে সাহায্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তাদের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। তাঁরা আমার চলার পথে চিরদিন স্মৃতির স্বর্ণভান্ডারে মহিমান্বিত হয়ে রইবেন।

পরিশেষে শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে, যিনি আমাকে এ কাজটুকু সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন।

ইয়াসমিন আহমেদ

তারিখ ঃ ২৭.১২.৯৯

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার সংক্ষেপ

সামাজিক জাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করণের বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টি এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করছে। শোষণ ও বঞ্চনায় জর্জড়িত বাংলার কৃষক কূলের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তা সাংবিধানিক রাজনীতির দিকে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে এদেশে কৃষক শ্রমিক পার্টি যে ভূমিকা পালন করেছিল তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্পন্ন কোন গবেষণা কর্ম আজও হয়নি। এই কারণে বর্তমান গবেষণাটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দুশো বছর যাবত বৃটিশ শোষণে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের কৃষককূল ধ্বংসের শেষ সীমানায় এসে পৌছে ছিল। তৎকালীন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা কৃষকদের দরদে প্রকাশ্যে আন্তরিকতা দেখালেও প্রকৃত অর্থে কিংবা বাস্তবে কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে যেমন কেউ সংগঠিত করেনি তেমনি কৃষকদের রাজনৈতিক সত্তাকে কেউ পৃথক ভাবে স্বীকার করেননি। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকই প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের জন্য তাদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার চরে সর্বহারা কৃষক প্রজাদের এক বিরাট সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে অসাম্প্রদায়িক নিখিল বঙ্গপ্রজা সমিতির ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যাত্রা শুরু করে।

১৯৩৬ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিকে নিখিল বঙ্গ প্রজাতে রুপান্তরিত করা হয়। পরবর্তিতে ১৯৫৩ সালে পূর্বনাম পরিবর্তন করে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করা হয়।

কৃষক শ্রমিক পার্টি এদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, পরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠেনের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয় ঋণশালিসী বোর্ড, প্রজাসত্ব ও বহুবিধ জমিদারী বিরোধী কার্যক্রমে এই পার্টি নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৩ সালের ২২ মার্চ ঢাকাস্থ ২৭ কে, এম, দাস লেনে কৃষক প্রজা দলের নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ জুলাই জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে সেক্রেটারি করে কৃষক প্রজা দলকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিকদের খুব কাছাকাছি নেয়ার চেষ্টা করা হয়। এই সময় এই দলের সভাপতি ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদেশে আস্তে আস্তে কলকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে যার ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মেই এদেশে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠে। এ কারণে ওই বছরেই 'কৃষক প্রজা' দলের' নাম পরিবর্তন করে 'কৃষক শ্রমিক দল' রাখা হয়।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক দল সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও নেজামী ইসলামী পার্টির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে এবং একই সঙ্গে হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করা হয়। যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে হক সাহেবের নেতৃত্বে মন্ত্রি সভা গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে করাচীর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার ৯২ (ক) ধারা প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি সভা ভেঙ্গে দেয়া হয়।

১৯৫৫ সালে পূর্ব বাংলা থেকে ৯২ (ক) ধারা তুলে নেওয়া হলে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকারকে মূখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক দলগুলোকে কার্যক্রম শুরুর অনুমতি দেওয়া হলে ১৯৬৩ সালে মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও নেযামে ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রথমে যোগদান করলেও, পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানী হলে এই দল দুঃস্থ মানবতার সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচন বয়কট করে।

১৯৭০ সালের মার্চ মাস থেকে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙ্গালীদের ওপর ব্যাপক হামলা ও গণহত্যা শুরু করে। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের শারীরিকভাবে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এবং তাঁর কৃষক শ্রমিক পার্টি উপস্থিত না থাকলেও, সমস্ত প্রকার শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের যে ধারা কৃষক শ্রমিক নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীদের হৃদয়ে বাঙ্গালীদের প্রিয় হক সাহেব এবং তাঁর দল প্রজ্জলিত করেছিলেন, চেতনার সেই শানিত ধারার সূত্র ধরেই এই যুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙ্গালীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কৃষক শ্রমিক পার্টির আদি রুপ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ১৯১৪ সালে যখন যাত্রা শুরু করে তখন এই উপমহাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। সে সময় খুব নগন্য মাত্রার ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলার জনসাধারণের প্রায় সবাই ছিলেন কৃষক আর তখন বিদ্যমান মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও সমর্থক ছিলেন মূলত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক। তারা ছিলেন আইনজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উঠতি পুঁজিপতি এবং নবাব বাহাদুর, খান বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ বিত্তের লোক। কিন্তু বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

আপামর জনসাধারণের মূল পেশা কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব ওই দুটি প্রধান দলে ছিল না। তাই বাংলার কৃষকদের মুক্তির চেতনায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতার কথা সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় সেই রাজনৈতিক দল হলো 'কৃষক শ্রমিক দল' আর নেতা হলেন এই দলেরই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, যিনি হক সাহেব নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। সময় ও ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলা কৃষক শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ যা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত মুক্তির মূল চেতনার প্রতীকরুপে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' এবং এই দলের প্রতিষ্ঠাতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক আওয়ামী লীগের সাথে যুক্তফ্রন্টে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রথমে যোগদান করলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হলে দলটি দুস্থ মানবতার সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচন বয়কট করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত থেকে শুরু হয় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠির ব্যাপক হামলা ও গণহত্যা, নির্যাতন। আজ আর কৃষক শ্রমিক পার্টির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তবে এই রাজনৈতিক দলটি যে মহান উদ্দেশ্যে সামনে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল প্রত্যক্ষভাবে সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়নি। তথাপি সমগ্র বাংলা মূলুকে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি এবং সাংবিধানিক রাজনীতির যে ধারা এই দল এবং এর নেতা সুচনা করে গিয়েছেন তা আজও অম্লান। আর একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' রাজনীতির এই ধারা সমুন্নত রাখার জন্য পরিচালিত সচেতন প্রচেষ্টার সফল পরিণতি। বাংলার আপামর জনসাধারণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি সম্পর্কে বিদ্যমান গবেষণা কর্মগুলো, যুক্তিসঙ্গত কারণেই, সাধারণত কৃষকদের মুক্তির অগ্রদুত হিসেবে শেরে বাংলা এবং কৃষক শ্রমিক দলকে উপস্থাপিত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। এটি নিঃসন্দেহে একটি সঠিক প্রয়াস। কিন্তু যে বিষয়টি এক্ষেত্রে আজও অনুদঘাটিত আছে তা হলো পাকিস্তান আন্দোলন নেতৃত্ব দানকারী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের তুলনায় অসম্প্রদায়িক "প্রজা সমিতি" তথা পরবর্তীকালের "কৃষক শ্রমিক পার্টি" বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক জাগরণ এবং সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জন্মানোর ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর এবং টেকসই ভূমিকা পালন করলেও জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছিল। এই মূল প্রশ্নের অনুসন্ধান করাই হলো অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

ভূমিকা ঃ আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি কাল হতে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মকান্ড উন্নত শিল্পায়িত এবং স্বল্পোন্ত উভয় ধরনের রাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান গবেষণাটি অহিংস রাজনৈতিক মতদ্বৈততা এবং সামাজিক আন্দোলন কর্মকান্ডের নির্ধারক সমূহ উন্মোচনের প্রচেষ্টা বিশেষ। এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় বিশ্লেষণের একক হিসাবে যে সব ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দল (কৃষক শ্রমিক পার্টি) ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব (শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক)। এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিভাবে যুগ যুগ ধরে। অবহেলিত পশ্চাৎপদ এবং প্রধানত কর্তৃত্ব পরায়নবাদী সমাজে, সামাজিক জাগরণ (Social Awareness) সৃষ্টি, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি (Constitutional Politices) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া পথ ও পথেয় হিসাবে কাজ করতে পারে। একটি কর্তৃত্ববাদী ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অসচেতন সমাজে সামাজিক জাগরণ ও অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা যোগ্য।

সামাজিক জাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের বেশির ভাগের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সূচনার ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিক এবং পাকিস্তান শাসনামলের এক ক্রান্তিকালে, ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, যে দলটি এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে সেটি হলো কৃষক শ্রমিক পার্টি, প্রতিষ্ঠা লগ্নে যা' ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। জনগণের বেশির ভাগের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টি এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.১ সমস্যার বিবরণ ঃ

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর চব্বিশ জন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী। প্রতিষ্ঠা লগ্নে এর শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ছিল ১২৫ জন। হোল্ডারদের প্রদত্ত চাঁদায় এই কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২০০০ পাউন্ড। ল্যারী কোলিন্স এবং দোমিনিক লাপিয়ের তাঁদের "ফ্রিডম এট মিডনাইট"[১] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মাত্র তিন মাসের মধ্যে এক রাজকীয় ফরমান বলে ইংল্যান্ডে রানী প্রথম এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উত্তমাশা অন্তরীপের

---

[১] Larry Colling of Dominique Lapieree (1975), Freedom at Midnight, Aven, PP11-12

Dhaka University Institutional Repository

অপর প্রান্তের সকল অঞ্চলে অবাধ পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। এই কোম্পানীর অন্যতম পণ্যবাহী জাহাজ হেক্টর এর সাহসী কাপ্তান হকিন্স কিছু সংখ্যক পাঠান দেহরক্ষীসহ শাহী দরবারে এসে উপস্থিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শ্বেতাব বিদেশীকে শুধু সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্ষান্ত হননি, তাঁকে বিপুল পরিমাণ মহামূল্যবান উপঢৌকন প্রদান ছাড়াও শাহী ফরমানের মাধ্যমে সুরাট বন্দরে বানিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দান করেন। বানিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের পর অল্পকালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানী আশাতীতরুপে সমৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে নীল, গরম মসলা, চিনি, রেশম ও মসলিন জাহাজ বোঝাই করে নিয়মিতভাবে ইংল্যান্ডে পাঠাতে থাকে। ইংল্যান্ডে প্রচুর অর্থাগাম হতে থাকে কোম্পানীর বদৌলতে, যার ফলে পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে সেদেশে শিল্প-পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ ঘটে।

কোম্পানী কর্মক্ষেত্রে শুধু সুরাট বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সাধারনত বনিক পুঁজিবাদের প্রসারের জন্য ঔপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে কোম্পানীর সওদাগরি জাহাজগুলো নতুন নতুন উপনিবেশের সন্ধানে পাল উড়িয়ে দেয়। একই উদ্দেশ্যে জব চার্নক নামে আর এক দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ অতিক্রম করে গঙ্গা তীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে জাহাজ ভেড়ান এবং সেখানেই বসতি নির্মাণ করেন (১৬৯০ খ্রিঃ)। উল্লেখ্য যে, কোলকাতা মহানগরী সুতানুটি এবং অপর দুটি গ্রাম কালীঘাটি ও গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

বাংলায় এসে কোম্পানী কর্মচারীগণ এদেশের রাজনীতির, বিশেষ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ধারাটি গভীর আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেন। কোম্পানীর উচ্চাবিলাষী কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে নবাবের সিংহাসনের দিকে। তিনি সহজেই উপলুব্ধ করেন যে বাংলার শাসনক্ষমতা করায়ত্ব করতে হলে চক্রান্ত ও অস্ত্রবলের আশ্রয় নিতে হবে। মুর্শীদাবাদের রাজনীতিতে যাঁরা শক্তিধর ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককে তিনি সহজে দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নবাবের সিপাহসালার মীর জাফর এবং অন্যান্যদের মধ্যে খাদিম হোসেন, ইয়ার লতিফ খান, মানিক চাঁদ, রায় দূর্লভ, উর্মি, চাঁদ, রাম নারায়ন, রাজ বল্লভ, জগৎ শেঠ, নন্দ কুমার, কৃষ্ণচন্দ্র, প্রমুখ প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ। এঁদের চক্রান্তের দরুন বাংলা, বিহার উড়িষ্যার তরুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন।

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর তৎকালীন বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা পরবর্তীকালে বৃটিশ

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শাসন সম্পর্কীয় পদক্ষেপ সমূহের কারণে এদেশে সামাজিক স্থবিরতা থেকে সামাজিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটে তেমনি আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংবিধান ভিত্তিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। ফলে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক জাগরণ ও সাংবিধানিক রাজনীতি তার স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষের পেশা কৃষি। অনেক পরিবর্তন সত্বেও এখনও বাংলাদেশের বেশীরভাগ জনগণের পেশা কৃষি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল এবং পাকিস্তানী 'অভ্যন্তরীণ- ঔপনিবেশিক' শাসনামলে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশী। অথচ বৃটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল, সর্বভারতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ রাজনীতিতে কৃষক ও শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে ছিল উদাসীন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে। যাদের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক পথে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অর্জনের ঘোষিত লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ গঠিত হয়েছিল মুসলিম সামন্ত প্রভু এবং ইংরেজদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত মুসলিম শিক্ষিত উচ্চবিত্ত নবাব এবং আইনের পেশার লোকদের সমন্বয়ে। বলা বাহুল্য এই সামন্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রনীত বিভিন্ন আইন ও গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষক শ্রমিক পার্টির জন্ম একদিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিবাদস্বরুপ। অপরদিকে এদেশের জনগণের অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে মুসলিম লীগের অপারগতার মূলে ছিল এই সংগঠনের জন্মগত ও শ্রেণীগত প্রকৃতি। বস্তুত বৃটিশ শাসকের উৎসাহ ও প্ররোচনার ফলেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্যের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের উৎসাহ ও প্ররোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করা। তবে শুধু মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাই নয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করার লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আরও অনেক পদক্ষেপ ও কৌশল অবলম্বন করেছে। কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধানত বাংলার যে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করেছে সেই কৃষকদের বঞ্চনা, নিপীড়ন ও দুঃস্থ অবস্থায় উপনীত করার জন্য দায়ী যে আইন সেই আইনটিও প্রনয়নের পিছনে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করেছে। ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভূসম্পত্তি ভিত্তিক একটি ধনীক শ্রেণী তৈরী করার লক্ষ্যে পাস করা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করার লক্ষ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ ১৭৯৩ সালে বাংলার জন্য একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন, যেটি

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির মালিকানা কৃষকদের হাত থেকে জমিদার নামে পরিচিত রাজস্ব সংগ্রাহকদের নিকট স্থানান্তরিত হয়। জমিদারগণ এই মালিকানা স্বত্ত্ব ততদিনই ভোগ করতে পারতেন যতদিন পর্যন্ত তারা সরকারকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে, এর দ্বারা যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত হলো তার সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক পুনঃগঠনের বিষয়টি ছিল লক্ষ্যনীয়। কৃষক প্রজা পার্টি গঠন এবং তা থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির উৎপত্তি ও বিকাশ এবং এর নেতৃত্বে ফজলুল হকের আসীন হওয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে কোম্পানী শাসনামলে বাংলার অর্থনীতির লন্ঠন এবং ধ্বংশসাধন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ (Objective of the Study)

সংসদীয় রাজনীতি সংহতকরণের জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে প্রয়োজন হচ্ছে রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের সমস্ত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। অন্যান্যদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রধান দুটি অবলম্বন হচ্ছে সামাজিক জাগরণ (Social Aswareeness) এবং সাংবিধানিক রাজনীতি (Constitutional Politics) বলা বাহুল্য এ দুটি অবলম্বন সংসদীয় রাজনীতি সংসতকরণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য।

সামাজিক ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সামাজিক জাগরণ। সামাজিক জাগরণের জণ্য প্রয়োজন জণগনের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যা কার্যকর হতে পারে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার নিয়ামক হচ্ছে নিয়ামক হচ্ছে সাংবিধানিক রাজনীতি। প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা এবং রাজনৈতিক দল উভয় সাংবিধানিক রাজনীতির জন্য অপরিহার্য্য।

মুসলিম লীগের ব্যর্থতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানে সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বর্থতার মধ্য দিয়ে। এমন কি চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানে সংহতকরণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বিপরীতক্রমে দেশের বেশীরভাগ মানুষের তথা কৃষক শ্রমিকদের উপর প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' তথা পরিবর্তিত 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' সামাজিক জাগরণ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তানে 'সাংবিধানিক রাজনীতি' প্রতিষ্ঠার পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়ে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' এবং এই দলের মাধ্যমে প্রবর্তিত পথে বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিচালিত হলেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা চলতি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অভ্যস্ত পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলো চালিত হয়নি। যার অনিবার্য পরিণতিতে কৃষক শ্রমিক পার্টির অনুপস্থিতি স্বত্ত্বেও এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার চিরঞ্জীব নেতা শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের মৃত্যুর পর তাঁর প্রদর্শিত সামাজিক জাগরণ এবং সাংবিধানিক রাজনীতির পথ অনুসরণ করে ত্রিশ লোকের জীবনের বিনিময়ে এই নেতার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তানী আভ্যন্তরীণ শাসন থেকেও সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি এবং সংসদীয় রাজনীতির ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টির এই বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সুতরাং বর্তমানে গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

১. বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করা।

২. বৃটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত সাংবিধানিক রাজনীতির ধারা বিশ্লেষণ করা।

৩. সাংবিধানিক রাজনীতি কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।

৪. পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এই দলের নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের অবদান পর্যালোচনা করা।

৫. পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সাংবিধানিক রাজনীতির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা।

৬. সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি ও সাংবিধানিক গতি অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে শেরে বাংলা এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার অনুকল্প (Hypothesis of the Study) ঃ

১. সামাজিক জাগরণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছিল ;

২. সামাজিক জাগরণের গতি সাংবিধানিক রাজনীতির দিকে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সেগুলি কৃষক প্রজা পার্টি রূপান্তরিত কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং ফজলুল হকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল কি;

৩. সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পার্টির সাফল্য কিভাবে মূল্যায়ন করা যথার্থ হবে? উপরোল্লিখিত প্রশ্নালোকে উদ্ভাসিত হবে বর্তমান অভিসন্দর্ভের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ সমূহ।

১.৪ গবেষণার কালানুক্রম (Periodization of the Study) ঃ

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে কৃষক শ্রমিক পার্টি রাজনৈতিক দল হিসেবে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, পশ্চাৎপদ এবং প্রধানত কর্তৃত্বপরায়নবাদী বাংলাদেশী সমাজে, সামাজিক জাগরণ (Social awarness) সৃষ্টি এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি (Constitutional Politics) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার পথ ও পাথেয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা এই অভিসন্দর্ভের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত হওয়া এই ছয় বছর পাকিস্তান শাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বি-জাতিত্বের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই মূলত কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের ইতোমধ্যে সৃষ্ট সামাজিক জাগরণের (Social awarness) ধারাকে অবজ্ঞা করে আসছি। আর এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছাল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি (Constitutional Politics) কে এড়িয়ে চলা। মাতৃভাষার উপর আঘাতকে বাঙ্গালীরা নিজেদের অস্তিত্বের উপর আঘাত হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৫২ সাল ছিল ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তে ধোয়া বাঙ্গালীর গৌরবের বছর। ১৯৫৩ সাল ছিল বাঙ্গালীর সেই গৌরবকে সংহত করার প্রচেষ্টার প্রথম বছর। বলা বাহুল্য ধর্মীয় বিভেদকে সমাহিত করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক বাঙ্গালী জাতি হিসেবে রাজনৈতিক ভাবে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এটি ছিল সব বিবেচনায় একটি মাহেন্দ্রক্ষণ বিশেষ। আর তাই দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালী জাতির ঐক্যবদ্ধতার বিজয়। এই বিজয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টি একটি ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলার মানুষের সামাজিক মানুষের জাগরণের এই চরম ক্ষণকে গোষ্ঠী ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে ৯২ ক ধারা জারি করে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের সরকারকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক জাগরণকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক রাজনীতির যে সূচনা কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল শাসকগোষ্ঠী তাকে পদদলিত করে। অনিয়মতান্ত্রিকতার এই ধারার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু সামরিক বেসামরিক আমলার দ্বারা পরিচালিত স্বার্থপরায়ন শাসকগোষ্ঠী যে কোন ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতায় ভীত। আর তাই দেখা যায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই সংবিধানকে বাতিল করা হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির (Constitutional Politics) প্রতি এই আঘাতকে বাঙ্গালী জাতি সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাই প্রমাণ করে। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান কর্তৃক 'মার্শাল ল' জারির পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সংঘঠিত হয়। এইগণ অভ্যুত্থানেই পতন হয় স্বৈর-শাসক আইয়ূব খানের। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আর এক সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের সাথে শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ক সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এটি ছিল আর একটি সুযোগ। তবে সে সুযোগও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে গণ যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আর্বিভূত হয়। তাই দেখা যায় সামাজিক জাগরণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির আকাঙ্খাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা। এই আকাঙ্খা গড়ে ওঠা এবং ভেঙ্গে পড়া থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে এক পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও বেড়ে ওঠার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। সার্বিক বিবেচনায় তাই ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময় বর্তমান গবেষণার জন্য যথাযথ ভাবেই যুক্তিপূর্ণ।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of the study) :

যেকোন গবেষণা হলো প্রনালীবদ্ধ অনুসন্ধান। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণা করতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণ ঘটনাবলী ও সমস্যা সম্পর্কে প্রনালীবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয়। যেমন ঐতিহাসিক প্রমান্য দলিল সংগ্রহের বর্ণনামূলক প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা জরিপ, অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মতামত জরিপ করে তার বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু সামরিক বেসামরিক আমলার দ্বারা পরিচালিত স্বার্থপরায়ন শাসকগোষ্ঠী যে কোন ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতায় ভীত। আর তাই দেখা যায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই সংবিধানকে বাতিল করা হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির (Constitutional Politics) প্রতি এই আঘাতকে বাঙ্গালী জাতি সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তানের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা তাই প্রমাণ করে। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কর্তৃক 'মার্শাল ল' জারির পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভূত্থান সংঘঠিত হয়। এইগণ অভ্যুত্থানেই পতন হয় স্বৈর-শাসক আইয়ুব খানের। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আর এক সেনা প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের সাথে শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ক সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এটি ছিল আর একটি সুযোগ। তবে সে সুযোগও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে গণ যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আর্বিভূত হয়। তাই দেখা যায় সামাজিক জাগরণ ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির আকাঙ্খাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা। এই আকাঙ্খা গড়ে ওঠা এবং ভেঙ্গে পড়া থেকে শুরু করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে এক পূনঃপ্রতিষ্ঠা ও বেড়ে ওঠার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। সার্বিক বিবেচনায় তাই ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময় বর্তমান গবেষণার জন্য যথাযথ ভাবেই যুক্তিপূর্ণ।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of the study) :

যেকোন গবেষণা হলো প্রনালীবদ্ধ অনুসন্ধান। সুতরাং সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণা করতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণ ঘটনাবলী ও সমস্যা সম্পর্কে প্রনালীবদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হয়। যেমন ঐতিহাসিক প্রমান্য দলিল সংগ্রহের বর্ণনামূলক প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নমুনা জরিপ, অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মতামত জরিপ করে তার বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দলিল শাখা।

কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এক সময় অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রি ছিলেন। আমাদের বর্তমান গবেষণাকে বস্তুনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সেই ঐতিহাসিক মুহুর্তগুলোর প্রামান্য দলিল দরকার তাই বর্তমান ভারতরে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কোলকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা জাদুঘর, বিধান সভা গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বেশীরভাগ অংশ কৃষক তাই সামাজিক জাগরণের বিষয়টিকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হলে গবেষণার জন্য গৃহীত সময়ে সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো জনসংখ্যা, এবং জনসংখ্যার মধ্যে প্রধান পেশাজীবী কৃষকদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বছরগুলোতে যেসব জরীপ করেছে সেগুলোর অফিসিয়াল প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া দৈনিক সংবাদ পত্রে পরিবেশিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সমূহ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া কৃষক শ্রমিক পার্টির উপর এযাবৎ যারা গবেষণা করেছেন তাঁদের গবেষণা কর্মের মধ্যে যেগুলো বাংলাদেশে থেকে এবং পারত পক্ষে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৭ অধ্যায়করণ (Thesis structures) :

অভিসন্দর্ভের জন্য গৃহীত অনুকল্প (Hypothesis) প্রমাণ করে গবেষণার লক্ষ্যসমুহ যথার্থভাবে উপস্থাপনের জন্য এটিকে নিম্মোক্তভাবে ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ

বর্তমান অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়। এখানে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা, অভিসন্দর্ভের লক্ষ্যসমূহ, অধ্যায়নের জন্য নির্ধারিত অনুকল্প, গবেষণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন মৌলিক ধারণার সংজ্ঞা ও অধ্যায়করণ প্রভৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

এখানে স্থান পেয়েছে অনুসন্ধানের ব্যাপক। প্রস্তুতিমূলক পটভূমি, সামাজিক স্থবিরতা থেকে সামাজিক জাগরণের প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে যেয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষনের ফলে বাংলাদেশের কৃষককূলের যে হত দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার সৃষ্টি হয় সে বিষয়গুলো। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাংবিধানিক রাজনীতির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা। সাংবিধানিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

এ অধ্যায়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টির অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, এ অধ্যায় তা আলোচনা করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টির ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এসময়ে কৃষক প্রজা পার্টি রূপান্তরিত হয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

এই অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনা 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' ১৯৫৩-১৯৫৮ স্থান পেয়েছে। এই সাথে আলোচনা করা হয়েছে সাংবিধানিক রাজনীতি ও পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিকাশ এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, নির্বাচন প্রচারণা কেন্দ্রিক রাজনীতি এবং নির্বাচনের ফলাফল। এই অধ্যায়ে একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে নির্বাচনের ফলাফল, পর্যালোচনা, প্রাদেশিক সরকার গঠন প্রভৃতি।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

যুক্তফ্রন্টের কার্যক্রম, এই সরকার কর্তৃক ও ১৯৫৪ সনে পাসকৃত আইন সমূহ, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কার্যক্রম প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্পর্ক, কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের দ্বন্দ্ব, পরিণতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমাপ্তি এবং আরও স্থান পেয়েছে কৃষক শ্রমিক পার্টির সফলতা, ব্যর্থতা এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির কর্মতৎপরতার অবসান প্রভৃতি।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

উপসংহার টানা হয়েছে এই অধ্যায়ে। অভিসন্দর্ভের অনুকল্প প্রমাণের জন্য পরিচালিত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষনের দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে তা উপস্থাপন করে এই অধ্যায়ে মূলত ১৯৫৩-১৯৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কৃষক শ্রমিক পার্টির অবস্থানের আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরও স্থান পেয়েছে সামাজিক জাগরণের মাধ্যমে সৃষ্ট সাংবিধানিক রাজনীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ন্ত্রণে এনে এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মতামত ও সুপারিশসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) :

১৯৫৩ সন থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট কৃষক শ্রমিক পার্টির অবস্থান, ভূমিকা ও কার্যকারিতা বুঝতে হলে দলটির রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হবে। একই সঙ্গে উক্ত সময়ের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের সাহিত্য পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। কারা আমাদের জানতে হবে উক্ত সময়কালের মধ্যে খ্যাতিনাম গবেষক ও লেখকরা কতটুকু কাজ করেছেন। কেনই বা আমার গবেষণার জন্য এই সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের একজন ইতিহাসবিদ প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি' শীর্ষক গ্রন্থে টেড রবার্ট গার (১৯৬৯[৩] এবং ১৯৭১[৪]) এবং লুই ক্রেইসবার্গ (১৯৭৩[৫]) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেছেন ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বা শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় পরাধীন ও শোষিত জনগোষ্ঠির মধ্যে ক্রমান্বয়ে বঞ্চনার চেতনা গড়ে ওঠে। (যখন গণমানসে সাংস্কৃতিক উপাদানভিত্তিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগের আকাঙ্খা ও বিরাজমান পরিস্থিতির (যা বাইরের শক্তির সৃষ্টি) পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অধিকারের মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে বা যদি ক্রমেই বেড়ে চলে তখন আপেক্ষিক বঞ্চনার জন্ম হয়। আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি মানুষকে জাগ্রত করে। তবে এখানেও সংগঠন ও নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রফেসর আনোয়ার বলেন "পৃথিবীর ইতিহাসে যত বাঁক বদল হয়েছে তার পেছনে গণমানুষের ভূমিকার অগ্রগন্যতা স্বীকার করেও বলতে হয় নেতৃত্বের ভূমিকা কোনো না কোনোভাবে তাতে অনুঘটকের কাজ করেছে। বাংলাদেশের অবহেলিত কৃষককূলের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতিগুলোকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতার ভূমিকা অগ্রগণ্য তাদের মধ্যে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এই দলের নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক অন্যতম।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বছরগুলো ছিল তৎকালীন রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণী সময়। তৎকালীন পূর্ব বাংলার তথা আজকের বাংলাদেশের সেই সময়ের (১৯৫৩ - ১৯৫৮) রাজনীতির একটি প্রকৃত, পক্ষপাতহীন এবং ব্যাপক ভিত্তিক উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে সৈয়দ কামরুল আহসান তাঁর Politics and Personalities in Pakistan গ্রন্থাখানি রচনা করেছেন।[৬] এই গ্রন্থে লেখক গুলাম মুহাম্মদ এবং বগুড়ার মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

আলীর মধ্যেকার দ্বন্দ, গুলাম মোহাম্মদ আলীর অভ্যুত্থানের পরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর তৎপরতা সহ তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

টড ল্যাভম্যান (২০০৪) তাঁর গ্রন্থ Issue and Methods in Comparative Politicics, An Introduction[৭] এ বলেছেন 'সামাজিক জাগরণকে কেন্দ্র করে অনেক গবেষণা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সাধারণত গবেষকগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক জাগরণের উদ্ভব, কৌশল, আকৃতি এবং সফলতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী হন। তুলনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হলো সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি হয় কেন, কি ভাবে তারা লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে আগ্রহী হয়ে থাকে, আর কি অর্জন করে তাকে। কৃষক শ্রমিক পার্টির মাধ্যমে এই দলের নেতা শেরে এ, কে, ফজলুল হক বাংলাদেশের অবহেলিত কৃষকদের মধ্যে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টিতে যে ভূমিকা পালন করেছিল এবং তার যে সুদুর প্রসারী প্রভাব সে সম্পর্কে সরাসরি কোনো গবেষণা হয়নি। কৃষক শ্রমিক পার্টির মাধ্যেমে এই দলের নেতা শেরে বাংলা এই দেশে প্রথম কৃষকদের রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করার মাধ্যমে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা রাজনীতিক ও প্রন্ধকার আবুল মনসুর আহমদ (২০০২) তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে ১৯১৪ সাল থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ করা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য শেরে বাংলার দরদী মনের পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। হক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'হক সাহেব খাঁটি মুসলমানও বটে, খাঁটি বাঙালীও বটে। পাশাপাশি আচার্য প্রফুল্ল্য চন্দ্র রায়ের উক্তি উদ্ধৃতি করে তিনি বলেছেন "বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত নির্ভর করে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর। ফজলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক।"

অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বের মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালের মধ্যেই সালিশী বোর্ড স্থাপন শেষ করলেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক প্রজার দাবি মত প্রজাস্বত্ব আইন পাস হলো ও মুসলিম লীগের দাবির মত কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করে কর্পোরেশন পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হলো। ১৯৪০ সালের মধ্যে মহাজনি আইন পাস হয়ে গেল। সালিশী বোর্ড প্রজাস্বত্ব আইন ও মহাজনি আইনে বাংলার কৃষক প্রজা ও কৃষি খাতকদের জীবনে এক শুভ সূচনা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলা, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট দেশব্যাপী যে প্রান চাঞ্চলের বন্যা বইয়ে দিল তাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাসীন দল ভেঙ্গে গেল। জনগণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারীজাতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

মুসলিম লীগের নবাব ও জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্ব কৃষকদের সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং তাদের সাথে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর কৃষকদের কোনো ফলপ্রসু সম্পর্ক ছিল না। এই পরিস্থিতি একদিকে যেমন মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে বাধাগ্রস্ত করেছে আবার বিপরীতক্রমে ১৯২৯ সালে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছে। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি পরবর্তীকালে কৃষক প্রজা পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কৃষকক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠা মুসলিম লীগের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব সৃষ্টি করেছে। পাশা পাশি নির্যাতিত কৃষকদের" প্রতিনিধি হিসেবে অসাম্প্রদায়িক পথে অগ্রসর হওয়ার ফলে ফজলুল হক রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক এজেন্ডার অপ্রতিরোধ্য বিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হন। ফজলুল হক বস্তুত মুসলিম লীগকে কৃষক প্রজা পার্টির এক সাবসিডিয়ারী সংগঠনে পরিণত করেন যা রক্ষণশীল এলিটদের প্রভাবকে ফলপ্রসূভাবে আবদ্ধ করে। আবার ফজলুল হকের প্রাধান্য মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ঐক্যের ফাটল সৃষ্টি করে। প্রথমত, এই অবস্থায় যে সব নেতা প্রাধান্য বিস্তারকারী অবস্থান সৃষ্টি করতে প্রয়াসী তাদের সমন্বে বাংলায় মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্লাটফরম তৈরীর ক্ষেত্রে জিন্নাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা, যারা ধর্মে ছিল মুসলিম, ১৯৩৬-৩৭ সালে সাম্প্রদায়িক এজেন্ডার ভিত্তিতে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে সহায়ক হয়। তৃতীয়তঃ বাংলা মুসলীম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বে ফজলুল হক আসীন হবার ফলে তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর হকের নেতৃত্বকে অবমূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছে।

১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বাংলায় হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দেয়। এসময় প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির সফলতার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন দূরীভূত করার ব্যপারে বিরাট আশাবাদ সৃষ্টি হয়।

১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইন যা ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয় তাতে দ্বৈত শাসনের স্থলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আর এই আইনের ফলে নির্বাচকমন্ডলীর সংখ্যা ছয় মিলিয়ন থেকে ত্রিশ মিলিয়নে উন্নীত হয়। ভোটাধিকারের বিস্তৃতি বাংলায় মুসলিম লীগের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ পূর্ব বালায় যেটি ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ। তবে ভোটাধিকারের বিস্তৃতি,

Dhaka University Institutional Repository

আনুপাতিক ব্যবস্থা এবং মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। মুসলমানরা পূর্ব বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। অপর পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে শিক্ষা, চাকুরী ও পেশাগত দিক দিয়ে ভালে অবস্থানে থাকার কারণে বাংলার আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রধান্য বিস্তার করা তাদের অধিকার হিসেবে গণ্য করে। প্রদেশের পল্লী এলাকায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে দেখা দেয়। কারণ এ অঞ্চলে বেশীরভাগ কৃষক ছিল মুসলিম আর জমিদার ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত।

১৯৩০ এর দিকে মুসলিম লীগ এবং কৃষক প্রজা পার্টির রাজনৈতিক কর্মকান্ড বাংলার পল্লী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। কৃষক প্রজা পার্টির শ্লোগান "লাঙ্গল যার জমি তার" গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জণ করে। জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপের দাবী জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। কৃষক প্রজা পার্টি গঠনের ফলে এ, কে, ফজলুল হক বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে সময় পর্যন্ত মুসলিম লীগ ততটা জপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। বাংলায় দলটির কোনো শক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৬ সালে কোলকাতায় আসেন আর তিনি ১৯৩৭ সালে ঢাকা সফর করেন। ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবার কথা ছিল।

বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালের দিক থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। শিক্ষিত মুসলিম যুবক যারা শিক্ষা কিংবা চাকুরীর উদ্দেশ্যে শহরে গিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম জেনারেশন যারা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং সরকারি চাকুরী গ্রহণ করা শুরু করেছে পাশাপাশি শিক্ষকতা ও আইন পেশায় তারা আসছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত উদার ধারণা ও শহুরে সংস্কৃতিক দ্বারা এরা আলোকিত হচ্ছিল। ধর্ম ও নারী শিক্ষার ব্যাপারে তারা তাদের পিতৃপুরুষের সংস্কার ত্যাগ করছিল।

মুসলিম সমাজে উঁচু (আশরাফ) এবং নীচু (আতরাফ) শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ ছিল। নীচু শ্রেণী থেকে উচু শ্রেণীতে উত্তরনের উদাহরণ ছিল খুব কম। তবে বিংশ শতকের শুরুতে সমাজের নীচু স্তরের মধ্যে কিছু গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আতরাফদের মধ্যে আবার কৃষিজীবীদের উচু বংশীয় বলে গণ্য করা হত আবার নিকারী (মাছ বিক্রেতাদের) নীচু শ্রেণীর বলে মনে করা হত।

নতুন শিক্ষিত মুসলিম যুবকেরা কেবল মানসিক যন্ত্রনা ছাড়াও স্ব-স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হবার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৯৩০ এর দিকে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই করুন। ১৯৩০-৩২ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিতেও পড়ে বিশেষতঃ কৃষি ক্ষেত্রে। বিশ্ববাজারে কাঁচা মাল দাম বিশেষতঃ খাদ্য শস্যের দাম নীচে নামতে তাকে। বাংলার কৃষকেরা বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্বের কৃষক যারা পাট উৎপাদন করে তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। পাট ব্যবসায় সরাসরি রফতানী বাজারের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তা কোলকাতাস্থ বৃটিশ মালিকানাধীন ম্যানুফ্যাকচারিং হাউস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বিশ্ব বাজারের চাহিদার ওপর কাঁচা পাটের দাম রিজার্ভও নির্ভর করত। ১৯৩০ এর দিকে পাটের দাম কমে যাবার ফলে কৃষকেরা পাটের এত কম দাম পাচ্ছিল যে ভবিষ্যতে ভালো দাম পাবার আশায় তারা পাট চাষ বন্ধ করে দেয়। ধানের দামও তখন কম ছিল।

শহরে ব্যবসায়ী এবং মহাজনেরা অর্থনৈতিক মন্দার পর পাট চাষীদের টাকা ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। পাটকল মালিকেরা বর্হিবিশ্বে তাদের উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যাদি বিক্রি করে কাঁচা পাট সরবরাহের জন্য নিয়োজিত ফরিয়ার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল।

দরিদ্র কৃষকেরা অবাঙ্গালী মরোয়ারী মহাজনদের শোষনের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। বহিরাগত এসব শোষক শক্তিগুলো উঁচু সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিত, আবার যত সম্ভব কম মূল্যে উৎপাদিত শস্য কিংবা পাট ক্রয় করত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে মারোয়ারী এবং কৃষকদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষকেরা এদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে 'মেরো' বলে গালাগাল দিত। কৃষকদের অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। অধিকন্তু জল সেচের অভাব, জমির কম উৎপাদনশীলতা, উচ্চ সুদে ঋণ, কৃষকদের অজ্ঞতা এবং অমিতব্যয়ীতা তাদের করুণ অবস্থাকে বৃদ্ধি করছিল। তারা তাদের ঋণকৃত অর্থে বিবাহ কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পিছনে খরচ করত। তারা এমনকি ক্ষুদ্র মাত্রায়ও ব্যবসা করার চিন্তা করত না। তারা ছিল দরিদ্র, অসহায় এবং নির্ভরশীল, অন্যদিকে গ্রামঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। হিন্দু সম্প্রদায় মনোহরী ও খুঁচরা দোকান খুলে বসত। তারা লোহা, টিন, কেরোসিন, কাপড় এবং অন্যান্য পণ্য সম্ভার শহর থেকে কিনে এনে গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের নিকট বিক্রি করত।

কৃষকেরা ক্রমান্বয়ে কৃষক প্রজা সমিতির প্রচেষ্টার দ্বারা সচেতন হয়ে উঠছিল। তারা এভাবে তাদের ওপর যে শোষণ হচ্ছে তা দূর করার জন্য কঠিন শ্রমের প্রয়োজন অনুভব করছিল, তারা তাদের অজ্ঞতা দূর করত চাচ্ছিল এবং ভূস্বামী, জোতদর এবং ঋণদাতা মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করছিল। বাংলার কৃষকদের ওপর প্রজা সমিতির প্রভূত প্রভাব ১৯২৯ সাল থেকে প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছিল। বস্তুত প্রজা আন্দোলন প্রধানত একটি পূর্ব বঙ্গীয় আন্দোলন রুপ লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করে কারণ এই অঞ্চলের কৃষকগণ বেশির ভাগ ছিলেন মুসলমান। যদিও প্রজা সমিতি এবং পরবর্তীকালের কৃষক প্রজা পার্টি (প্রজা সমিতি ১৯৩৬ সাল থেকে কৃষক প্রজা পার্টি নামে পরিচিত হতে তাকে) জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল, তবে তাদের এই আন্দোলন প্রচেষ্টা শুধুমাত্র পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমানদের মাধ্যমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল। হিন্দু নেতৃবৃন্দ, যাদের বেশীরভাগই ছিল জমিদার এবং ধনী ভূ স্বামী (জোতদার) প্রজা/ ভাগচাষী এবং কৃষকদের জন্য তাঁরা কিছু করতে অনীহভাব পোষণ করত। ১৯২৮ সালে ঞবহধহপু অপঃ সংশোধনের ফলে রায়তী সত্বে দখলীকৃত সম্পত্তি বিক্রি এবং হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বৈধতা দেয়া হয়। তবে এখানেও জমিদারদের জন্য শতকরা ২০ ভাগ ফি (অর্থ্যাৎ বিক্রিমূল্যেও ২০ টাকা জমিদারকে দিতে হত) এবং pre-emption এর জন্য জমিদারের অধিকার বলবৎ থাকে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যাপক প্রভাবের সৃষ্টি হয় যাতে বিক্রি স্বল্প সময়ের জন্য থেমে যায়। জমিদারের ফি'র কারণে জমির মূল্য কমে যায় এবং একজন রায়তকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা পেতে হলে অধিক পরিমাণ জমি বিক্রি করতে হত। এই পরিস্থিতি কেবল বাংলার উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যেখানে কৃষকদের নগদ অর্থের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দ্বিতীয় ফসল অর্থ্যাৎ পাট চাষ করা হত। তবে রায়তী সম্পত্তি বিক্রী বা হস্তান্তর একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় নি, কারণ দুঃস্থ কৃষকদের নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং সে কারণে জমিদারের ২০% ফি থেকেই রেহাই পাবার জন্য তারা জমি বন্ধক রাখা শুরু করেছিল। একটি গবেষণায় দেখা যায় ১৯৩৫ সালে ১৬০৩৪১ টি বিক্রি এবং ৩৫৭২৯৭ টি বন্ধকের ঘটনা ঘটে। আবার ১৯৩৬ সালে ১৭২৯৫৬ টি বিক্রি এবং ৩৫২৪৬৯ টি বন্ধক এবং ১৯৩৭ সালে ১৬৪৮১৯ টি বিক্রি এবং ৩০২৫২৯টি বন্ধকের ঘটনা ঘটে। ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বের অধীনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিপরিষদের আমলে ১৯৩৮ সালের Tenacny Act সংশোধনের ফলে সমস্যা বাঁধা দূর হয়ে যায় অর্থাৎ জমিদারের হস্তান্তর ফি এবং প্রি এম্পসন করার অধিকার খর্ব করা হয়। এসময় কৃষকদের স্বার্থে আরও কিছু আইন পাস করা হয় সেগুলো হচ্ছে Bengal Agricultural Tenants Act, Bengal Agricultural Debtors Act, The Money lenders Act প্রভৃতি।

যদিও এটি একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিলনা তবে বাংলার পল্লী অঞ্চলে প্রজা আন্দোলন বস্তুত পক্ষে মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। প্রজা আন্দোলনের প্রচারে বলা হত এই দলটি শোষক ও জমিদারদের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং তারা খ্রিষ্টান বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু সত্য

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা হলো এই যে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই আন্দোলন মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করে। হিন্দু জমিদার ও জোতদারেরা হিন্দু কৃষকদের মনে এই ভীতি অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় যে প্রজা আন্দোলন আসলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করবে।

সৌজন্য প্রকাশের ইসলামী রীতি এবং প্রজা আন্দোলনের সমাবেশে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করার রীতি হিন্দু নেতাদের দ্বারা অজ্ঞ হিন্দু বৃষকদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বোঝাতে সাহায্য করে। ফলে হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রজা আন্দোলন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বাংলাদেশের প্রর্থিত যশা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হারুন-অর-রশীদ তৎকালীন খ্যাতনামা মুসলিম নেতাদের মধ্যে একশতের মত পত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ দলিলসমূহ সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন[৮]। এই গ্রন্থে এ, কে, ফজলুল হক, এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমউদ্দিন, মওলানা আকরাম খান, এবং রাগীব আহসানের সাথে এম, এ, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, বাংলার গভর্নর এবং ভাইসরয়ের স্টাফদের মধ্যে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বছরগুলোতে যে পত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ হয়েছিল সে গুলো স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলায় মুসলিম লীগ সংগঠন সম্পর্কে সূচনা লীগের ভিতরকার মতামত, উপদলীয় কোন্দল ও মতদ্বৈততা, নেতাদের মধ্যে একত্রিত হওয়া এবং পুরঃ একত্রিত হওয়া, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রসমূহ, হক জিন্নাহ সংঘাত, দলে কেন্দ্র বনাম প্রদেশ সম্পর্ক, সংঘাতের নিয়ন্ত্রন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার। পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মতামত, রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ সম্পর্কে বাঙ্গালী মুসলিম নেতৃত্ব, ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টা। বেঙ্গল মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেও ঢাকা কোলকাতা দ্বন্দ, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক প্রভৃতি স্থান পেয়েছে।

ষাট দশকের গোড়ার দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের উপনিবেশবাদী আচরণ, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের স্বরূপ যাঁরা উদঘাটন করেছিলেন অকাট্য যুক্তি ও তথ্য সহকারে শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান তাঁদের অন্যতম। রেহমান সোবহান তাঁর "বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য" বইটিতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত যত্নসহকারে ও প্রচুর তথ্য সহযোগে তুলে ধরেছেন। "১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীরা যে রাষ্ট্রটির উত্তরাধিকার লাভ করে অংশীদার হয় উত্তর পূর্ব ভারতের মুসলিমরা এবং পশ্চিম বঙ্গেও কিছু সংখ্যক লোক সহ ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো থেকে আগত উদ্বাস্তরা।

---

[৮] Inside Bengal Politics 1936-1947 Unpublished correspondence of Political leaders - Dr. Harun-Or-Rashid.

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এই উদ্বাস্তু নাগরিকেরা ভারতের নানা অঞ্চল ও পটভূমি থেকে এসে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। যে সব সামাজিক শক্তি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় তার মধ্যে বাঙালিদের উচ্চাভিলাসী প্রত্যাশা ছিল সর্বাধিক। ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা, ও কারিগরী বৃত্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশ ভালো অবস্থান ছিল। হিন্দি ভাষী উত্তরাঞ্চলের মুসলিমরা ছিল প্রধান শ্রেণী ভূস্বামী ও পেশাজীবীদের অংশ। তাদের মাতৃভাষা উর্দূ ছিল এ অঞ্চলের উচ্চ শ্রেণী হিন্দু মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা। এভাবে দেখা গেল যে, যেসব জনগোষ্ঠী পাকিস্তান পেল তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালীরাই কেবল পর্যায়ক্রমে উত্তর ভারতের মুঘল ও তাদের অনুচরদের বৃটিশ শাসকদের ও হিন্দু জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের শিকার হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর এ অঞ্চলের জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্বশাসন লাভের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা বাংলার বাঙালীদের চেতনার মধ্যে স্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকে। কাজেই এ প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না। উত্তর ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও কারিগরি বৃত্তির ক্ষেত্রে মুসলিমদের বেশ ভালো অবস্থান ছিল। হিন্দিভাষী উত্তরাঞ্চলের মুসলিমরা ছিল প্রধান শ্রেণী ভূস্বামী ও পেশাজীবীদের অংশ। তাদের মাতৃভাষা উর্দু ছিল এ অঞ্চলের উচ্চ শ্রেণী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মাতৃভাষা। এভাবে দেখা গেল যে, যেসব জনগোষ্ঠী পাকিস্তান পেল তাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার বাঙালিরাই কেবল পর্যায়ক্রমে উত্তর ভারতের মুঘল ও তাদের অনুচরদের ব্রিটিশ শাসকদের ও হিন্দু জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভূতের শিকার হয়েছিল। সুতরাং পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর এ অঞ্চলের জনগণের নিয়ন্ত্রণ না থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। এটা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের চেতনার মধ্যে স্থায়ীভাবে কাজ করতে হবে। কাজেই এ প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না।

প্রকাশিত ও বিদ্যমান গবেষণা কর্মগুলো যুক্তিসঙ্গত কারণেই কৃষকদের মুক্তির অগ্রগতি হিসেবে শেরে বাংলা এবং কৃষক শ্রমিক দলকে উপস্থাপিত করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একদিক থেকে ওটি নিঃসন্দেহে একটি সঠিক প্রয়াস, কিন্তু পাশাপাশি এটাও লক্ষ্যনীয় যে আমার গবেষণার বিষয়টি "কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩-১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ"। এর উপর গবেষণালব্ধ

Dhaka University Institutional Repository

কাজ হয়নি। আমাদের জানা প্রয়োজন যে দলটি ১৯৫৮ সনের মধ্যে কেন কতদ্রুত রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লো।

বাংলার আপামর জনসাধারণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির ভূমিকা, পরিণতি, ফলাফল সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। যে বিষয়টি এক্ষেত্রে আজও অনুদঘাটিত আছে তাহলো পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের তুলনায় অসাম্প্রদায়িক "প্রজা সমিতি" তথা পরবর্তীকালের 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক জাগরণ এবং সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি আগ্রহ জন্মানোর ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর এবং টেকসই ভূমিকা পালন করলেও জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছিল।

এই মূল প্রশ্নের অনুসন্ধান করাই হলো গবেষণার মূল বিষয়বস্তু।

---

২. দেখুন সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০০০), মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চাঃ তত্ত্ব ও পদ্ধতি, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী।

৩. Ted Robert Gurr (1969), "Psycholigical Factors in Civil Violence', Vol. XX, January 1969, pp. 247-251.

৪. (1971), Why Men Rebel : A Reader in Political Violence, London.

৫. Lois Kreisberg (1973), The Sociology of Social Conflicts, New Jersey : Englewood Clifts.

৬. Syed Qamarul Ahsan (1969), Politics and Personalities in Pakistan, Dacca : Mohiuddin & Sons, 1969.

৭. Todd Landman (2004), Issues and Methods in Comparative Politics, An Introduction, Second Edition, London and New York : Routledge, p. 124

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ২

অনুসন্ধানের পটভূমি

বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট সময় সীমা ১৯৫৩-১৯৫৮। তবে ভারতীয় ইতিহাসের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের বছর গুলোও এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হিসেবে কার্ল মার্কসের পর্যবেক্ষণ প্রনিধানযোগ্য। মার্কসের মতে দু'টি মিশন কার্যকরী করতেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভাবতে তাদের শাসন কায়েম করেছিল; একটি ধ্ববংসাত্মক, অপরটি পুনঃ উৎপাদনমূলক। পুঞ্জীভূত ধ্বংশের মাধ্যমে পুনঃ উৎপাদনের কাজ নির্গত হওয়া ছিল কষ্টকর[৯]। বলা বাহুল্য, গবেষণার অনুকল্প "সামাজিক জাগরণ" এবং "সাংবিধানিক রাজনীতির" বার্তাবরণ তৈরী হয়েছিল ধ্বংসাত্বক ও পুনঃ উৎপাদনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের বিভিন্ন ধরনের আইন বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের দ্বারা পূর্বের সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সামাজিক বিন্যাসের সূচনা হয়। এর ফলে জমিদার শ্রেণী, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আর হতদরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মিথস্ক্রিয়ার ফলে "সামাজিক জাগরণ" অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। তবে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাও এসময় আবির্ভূত হয় সামাজিক জাগরণের বাহক হিসেবে। কৃষক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত পূর্বের কৃষক প্রজা পার্টিও জন্ম লাভ করেছে ব্রিটিশ শাসনামলে। শুধু রাজনৈতিক দলই নয় সাংবিধানিক রাজনীতির সূত্রপাতও হয় ব্রিটিশ শাসনামলে।

২.১ সামাজিক স্থবিরতা

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এদেশে সংবিধান ভিত্তিক কোনো রাজনীতি কিংবা শাসন ব্যবস্থা ছিল না। রাজা, বাদশা, নবাব প্রভৃতি নামে অভিহিত শাসকগণ তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনার দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করত। আমাদের গবেষণার অনুকল্প প্রমান করার জন্য সাংবিধানিক রাজনীতির ধারার সূত্রপাত সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' যে প্রধান কাজটি সমাধা করতে পেরেছিল তা' হলো সাংবিধানিক রাজনীতির প্রবাহের সাথে এদেশের সাধারণ মানুষদের সম্পৃক্তকরণ। যা বাংলাদেশে ইতোপূর্বের কোনো রাজনৈতিক দল সম্পাদন করতে পারে নাই। সুতরাং এ পর্যায়ে যে সব বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন তা' হলো;

১) ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।

৩) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত সাংবিধানিক রাজনীতির প্রধান দিকগুলো।

---

[৯] Karl Marx, "The Future Results of British Rule in India", in Marx Engles Lenin on India, New Delhi ; Perspective Publications Ltd- 1975, P- 28

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১ ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ কৃষি নির্ভর। এই কৃষি ভিত্তিক কৃষক প্রজা পার্টি থেকে রুপান্তরিত কৃষক শ্রমিক পার্টি যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে ১৯৫৩ - ১৯৫৮ সালের সময় কালে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে কৃষি ভিত্তিক এই সমাজের কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার লক্ষ্যে কৃষক প্রজা পার্টি বা কৃষক শ্রমিক পার্টি যে প্রেক্ষাপটে কাজ করেছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য কৃষকদের দূরবস্থা দূরীভূত করার লক্ষ্যে এই দল এবং এর নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক যে ভূমিকা পালন করেছে সেই ভূমিকা একদিকে সামাজিক জাগরণ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে আবার সাংবিধানিক রাজনীতিতে কৃষকদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। কৃষি তথা কৃষকদের দুরবস্থা দূর করা সম্পর্কিত পদক্ষেপ সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা সমূহভাবে উপলব্ধি করতে হলে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশের কৃষককূল এইরুপ দুরস্থার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করাও অপরিহার্য। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ এবং পরে গৃহীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে এই ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভবের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বিশেষত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরী করেছে"[১০] বাংলাদেশের ইতিহাসবিদগণ দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, তাদের মতে,'এভাবেই পূর্বতন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নতুন সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক ব্যবধানের' সূচনা করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভুত হয়েছে নতুন এক শ্রেণী; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের পটভূমি নির্মান করে দিয়েছে, সাংস্কৃতিক বিকাশের সীমারেখা চিহ্নিত করেছে এবং অর্থনৈতিক বিকাশে ভূমিকা রচনা করেছে।[১১]

এই দেশে মুঘল শাসনামলেও শাসকগণ কর সংগ্রহ করতেন জমিদারদের মাধ্যমে। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের পথে তখন জমিদাররা বিশ শতকের চৈনিক 'ওয়ার লর্ডদের মতো জমির ওপর 'ডি ফ্যাক্টো পজেশন' নিয়ে নিলো। কর্নওয়ালিশ এসে নতুন যা করলেন তা হলো জমির ওপর জমিদারদের মালিকানা দিয়ে দিলেন। জমিদার এখন জমির মালিক বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর সংগ্রাহকও। ইংরেজরা হয়তো দেশীয় কর সংগ্রহ প্রথার জটিলতার জন্যেও এভাবে ঝামেলামুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কারণ এখন তাদের সরাসরি সম্পর্ক জমিদারদের সঙ্গে যারা রায়তদের থেকে যা আদায় করবে তার শ ভাগের ন'ভাগ ইংরেজদের দিয়ে দিবে।

---

১০. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) (২০০২), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা; মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা- ৯-১৮।

১১. Barrington Moore Jr (1967), Social origine of Dictatorship and Democracy, London.

Dhaka University Institutional Repository

তবে বিষয়টি কি এখানেই শেষ হয়েছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর না হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইংরেজরা কেন এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল তা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়েছে। ড. সিরাজুল ইসলামের মতে এর উদ্দেশ্য ছিল 'রাজানুগত্য শ্রেণী সৃষ্টি করা"[১২]। এবং ইংরেজদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। অনেক পরে লর্ড বেন্টিংক নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন যে ধনী ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল তারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে সবকিছু করেছে। লর্ড বেন্টিংক স্বীকার করেন যে, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা পূর্ণ করা ছিল জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভূস্বামী শেণীটির সৃষ্টির পশ্চাতে অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১৩]

ইংরেজরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলো তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু একটি কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার সমাজ কাঠামোয় প্রবলভাবে আঘাত হেনেছিল এবং এই অভিঘাত সম্পর্কে কর্ণওয়ালিশ নিশ্চয় সচেতন ছিলেন না। পরবর্তী ইংরেজ শাসকরা এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ভূমির ওপর ভিত্তি করে যে শ্রেণী গড়ে উঠেছে এবং যে শ্রেণী তাদের ওপর নির্ভরশীল সে শ্রেণীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

কিন্তু দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বর্ণনার ক্ষেত্রে ১৭৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয় সামরিক দিক থেকে একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসে এর প্রভাব বিশাল। বলা বাহুল্য কোন ধরনের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুপস্থিতির মধ্যে রাজনৈতিক দল এবং এর নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রে এটি বিরাট তাৎপর্যমন্ডিত। অবিভক্ত ভারতে কৃষক প্রজা পার্টির ইতিহাসে এর প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এর উপস্থিতি অনিবার্য। সুতরাং প্রাথমিক বিবেচনায় সাধারণভাবে আমরা এখানে ভারতে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করছি। কারণ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসন করেছে, আর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সময়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এরপর থেকে এদেশে ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সামগ্রিক ভাবে ব্রিটিশ শাসন আর বিশেষভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কৃষি ভিত্তিক এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসনতান্ত্রিক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আধা-সামরিক সংগঠনের চরিত্র পরিগ্রহ করে এবং ভারত তথা "ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ বণিক পুঁজির" সর্বাধিক ক্ষমতাশালী প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করে।

---

১২. সিরাজুল ইসলাম (২০০২), চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি, মুন্তাসীর মামুন (সম্পাদিত) (২০০২), প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫০-৬২।

১৩. সুপ্রকাশ রায় (১৯৭২), ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯০ সাল থেকে কোম্পানী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোলকাতা এবং জমিদারের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজস্বমুক্তভাবে ব্যবসা করার জন্য কোম্পানী মুঘল সম্রাটের ফরমান (ডিগ্রী) লাভ করতে সক্ষম হয়[১৪]। কিন্তু বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খান শক্তিশালীভাবে সম্রাটের ফরমানের বিরোধীতা করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বিশেষ মর্যাদা দেয়ার ফলে, মুর্শীদ কুলী খানের মতে, বাংলার নবাবের স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছিল।

কিন্তু নবাবের প্রচেষ্টাকে পরাভূত করার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সব ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে। স্থানীয় বনিক দাদনীদের এড়িয়ে কোলকাতা কাউন্সিল ১৭৫৩ সালে দেশে সরাসরি বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ বানিজ্য চালানোর জন্য কোম্পানী তার কর্মচারী এবং গোমস্তা নামে পরিচিত স্থানীয় ভাড়াকৃত এজেন্টদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গোমস্তাগণ ইউনিয়ন জ্যাক এবং কোম্পানীর দস্তাক ব্যবহারের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল; তারাশুল্ক-যুক্ত পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করতেন। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীকালের নবাবগণ স্থানীয় বনিক এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে মৈত্রী জোট নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতা এবং মুর্শিদাবাদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন। যার জন্য তাকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে গুরুতর মূল্য দিতে হয়। কোম্পানী মুর্শিদাবাদেও নেতৃত্বস্থানীয় বনিক এবং নবাবের কর্মচারীদের কিনে নেন এবং প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বেই নবাবের ভাগ্য নির্ধারিত হয় গিয়েছিল। সেই হিসেবে পলাশীর যুদ্ধ ছিল একটি প্রহসন। কোম্পানী নবাবের কর্মচারী এবং স্থানীয় বনিকদের মধ্যে সাময়িক অভিযানের একটি ধ্রুপদী গোপন নকশা ছিল এই যুদ্ধ।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী বাংলায় "King Maker" এর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়[১৫]। অনেক ধরনের কষ্টকর অধ্যায় সূচনার পর কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী অর্থ হচ্ছে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের অধিকার। তবে এই দেওয়ানীর জন্য কোম্পানীকে দিল্লীর সম্রাটকে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ বার্ষিক ২৬,০০,০০০/- রুপী প্রদান করতে হত। আর এভাবেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফলপ্রসুভাবে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত হয়। ইতিহাসবিদ পানিক্করের মতে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাকে কোম্পানী তার ভরবষভফড়স এর মত শাসন করে। লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে এই রাষ্ট্রটিকে তারা robber state এর বেশী কিছু মনে করত না।

---

১৪. (Firminger 1917 Vol. I-III)

১৫. (Dutt 19700, Vol. I,32.33)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় কোম্পানী শাসনের প্রভাব মূল্যায়ন করে কার্ল মার্কস লিখেন, এশীয় স্বৈরতন্ত্রের স্থলে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বনিক এবং কারিগরদের শোষণ করতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ রাষ্ট্রের সকল বিদ্যমান সামর্থ্যকে কাজে লাগায়। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা বিজয়ের সময় ব্যক্তিগত বানিজ্য সমুদ্র বন্দরগুলোতে সীমিত ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা স্থলভাগের দিক সম্প্রসারিত হতে থাকে। আর কোম্পানীর কর্মচারী বাংলার ব্যবসায় বানিজ্যের ওপর বিশাল একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করে। প্রত্যন্ত জেলাগুলোতে কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী গোমস্তাগণ দরিদ্র কৃষকদের জন্য অবর্ণনীয় দুর্দশা এবং যন্ত্রনা বয়ে আনে এবং স্থানীয় কারিগরদের চুক্তিবদ্ধ দাসে পরিণত করে তোলে। তারা ইংরেজ সীপাহিদের পোষাক পরিধান করে সমস্ত দেশ চষে বেড়াত। রায়ত বনিকদের বন্দী করে রেখেছিল, আর নবাবের কর্মচারীদের সাথে অপমানজনক আচরণ করত। খলচরিত্রের বাঙ্গালিদের মধ্য থেকে ভাড়া করা এই সব গোমস্তাগণ যাদের চরিত্র বা অবস্থান বলতে কিছু ছিল না, তারা ইংরেজ বনিক, গোমস্তা অথবা মুহুরীদের হয়ে কাজ করত। বস্তুত ব্রিটিশ বনিক এবং ব্রিটিশ পাবলিকের নিকট বাংলা ছিল একটি বিরাট ভান্ডার বিশেষ, যেখানে কোন ধরনের জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব ছাড়াই বানিজ্যিক লেনদেন করা হত।

নিজ দেশে আগন্তক হিসেবে পরিগণিত হওয়া স্থানীয় বনিকগণ তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জন দেয়ার সাথে সাথে ইংরেজ বনিক পুঁজিপতিদের অধস্থ বনে যায়। তখন থেকে বাঙ্গালী বনিকদের স্বাধীনতা তিরোহিত হয়ে যায় এর পরিবর্তে তারা বেনিয়া (অধীনস্ত বনিক) চরিত্র পরিগ্রহ করে এবং একটি কম্পারেডর শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় যারা স্থানীয় বাজারের পরিবর্তে মেট্রোপলিটন এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবসা করা শুরু করে। আর এভাবেই বাংলায় একটি স্বাধীন স্বায়ত্বশাসিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভবিষ্যতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পাশাপাশি কৃষকরাও করের বোঝার সম্মুখীন হয়। বছরের পর বছর তাদের ওপর এই করের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পূর্বে ১৭৬৪- ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৮,১৭,০০০ রূপী। অথচ কোম্পানী যখন দেওয়ানী লাভ করে তখন বাংলায় সংগৃহীত মোট ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৪,৭০,০০০ রূপী। ১৭৭১- ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে এই অংক দাঁড়ায় ২৩,৪১,০০০ রূপীতে। আর ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাস হয় তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমি রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন ৩৪,০০,০০০ রূপীতে। সমকালীন একজন পর্যবেক্ষকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য ঃ

> বর্গাদারগণ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সরকারের সাথে চুক্তি থেকে চাষীরা নিজেদের জন্য ভালো কিছু করতে ছিলেন অক্ষম ....। অনেক নীচুস্তরের প্রজা, নিঃস্ব হয়ে পড়ে অন্য স্বৈরাচার থেকে রক্ষা পাবার আশায় দেশত্যাগ করেছিল, যে লেনিটি অস্বীকার করা হয়েছিল।[১৬]

১৬. Low 1792, Vol. iii, IXV11

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানী শাসনের পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার ব্যবসায় বানিজ্য দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, এর সাথে অর্থনীতিও ধ্বংসোম্মুখ হতে থাকে, ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের দক্ষতা ও কারিগরীগুণ লোপ পেতে থাকে। বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর আবাসিক প্রতিনিধি Brecher ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় বোর্ড অব ডাইরেক্টরের নিকট লিখেন।

এটি চিন্তা করলে একজন ইংরেজকে ব্যথা দেয় যে কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর থেকে আরও খারাপ হচ্ছে এবং আমি শংকিত এটি ভেবে যে এঘটনা সন্দেহাতীত...। এই সুন্দর দেশ, যা সবচেয়ে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তা' ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যখন প্রকৃতপক্ষেই প্রশাসনে ইংরেজদের বিশাল একটি অংশ আছে।[১৭]

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে দেশ একটি কঠিন দূর্ভিক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয় যেখানে দারিদ্র এবং মরনশীলতা ছিল তুলনাহীন। যখন জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং জমির বিশাল অংশ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল তখন কোম্পানীর কর্মচারীগণ যারপর নাই আন্তরিকা এবং নিষ্ঠার সাথে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করত[১৮]। এটি ছিল পূর্বতন প্রশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন পরিস্তিতিতে যারা ক্ষমাশীলতা এবং নমনীয়তা দেখিয়ে কিছুটা সুযোগ করে দিত।

নিশ্চিতভাবেই, এই নতুন ব্যবস্থা একটি নতুন আকৃতির শোষণমূলক কৌশলে পরিণত হয় যাতে জনগণ ভূমি রাজস্বের অংশ থেকে কার্যকরভাবে বঞ্চিত হত যা বাংলার মধ্যেই বন্টন হবার কথা ছিল। আর এভাবে এর বেশীরভাগ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের দ্বারা ইংল্যান্ডে পাচার হচ্ছিল। ইংল্যান্ডে এবং ভারতে লাভজনক ব্যবসায়ী বৃত্তি পাবার জন্য তাদেরকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বাধীনতা দেয়া হত। বেঞ্জামীন ডিইসরাইলির মন্তব্যকে অন্যভাবে বলা যায় বাংলা ছিল ইংরেজ বনিকদের জন্য কোটি রোজগারের উপায় বিশেষ। দত্ত'র পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক; তারা ভারতকে বিশাল জমিদারি অথবা উপনিবেশ মনে করত, যার মুনাফা ভারত থেকে উত্তোলন করে ইউরোপে জমা করা হত...। তারা ভারতের রাজস্ব দিয়ে পণ্য ক্রয় করত এবং তাদের মুনাফার জন্য তা'ইউরোপে বিক্রী করত। তাদের বানিজ্যের মজুদের ওপর ভারত হতে উচ্চ সুদ জোরালোভাবে আরোপ করত।

---

১৭. (Dutt 1949. 103)

১৮. (Huntter 1868, 380-381)

Dhaka University Institutional Repository

যেকোন আকারে ওগুলো সব ভারতে অতিরিক্ত করের দ্বারা আদায় হয়ে, প্রশাসনের প্রয়োজন মেটানোর পর ইউরোপে চলে যেত।

কোম্পানী দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মচারীদের "নবাব" বলে ডাকা হত। অসদুপায়ে অর্জিত লাভ থেকে যারা বাড়ী পেত (এবং) তাদের অর্থের জন্য অভিনন্দিত হত কিন্তু তাদের ঔধত্যের জন্য এবং লাম্পট্যের জন্য ঘৃনার্হ ছিল যা ইংরেজ সমাজকে কলুষিত করেছিল এবং এমনকি সংবিধান বিপর্যয় করে তুলছিল। বাংলায় কোম্পানীর শাসন বিশেষ পর্যালোচনার সম্মুখীন হয় ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে যখন তারা ইংল্যান্ডের সরকারের কাছ থেকে ঋণের জন্য আবেদন করেছিল।[১৯] ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ভারতে বিষয়াদি অনুসন্ধানের জন্য একত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সুপারিশ করে যে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর অধীনে চার সদস্যের কাউন্সিল এবং গভর্নর জেনারেলের ওপর ক্ষমতা অর্পিত থাকবে। কাউন্সিলদের প্রধান প্রধান দায়িত্ব ছিল যে রেগুলেশনের দ্বারা দেশে কর বসানো হবে সেগুলো পরীক্ষা করা, যাদেরকে এই কর দিতে হবে তাদের সামর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংগ্রহের অংক ঠিক করা। ওয়ারেণ হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত করা হয়।[২০] চারজন কাউন্সিলরের মধ্যে কোলকাতাস্থ কোম্পানীর একজন কর্মচারী রিচার্ড বারওয়েল কাউন্সিলর হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। অবশিষ্ট কাউন্সিলদের ইংল্যান্ড থেকে প্রেরণ করা হয়, তারা হলেন ফিলিপ ফ্যান্সিস, জেনারেল ক্লাবেরিং এবং কর্নেল মন্সন।

২.১.২ বাংলায় একটি সামাজিক শ্রেণীর লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসকদের প্রচেষ্টা ঃ

ইংল্যান্ড থেকে তিনজন কাউন্সিলর পৌছানোর পূর্বে রিচার্ড বারওয়েলের সহায়তায় ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার জন্য একটি নতুন রাজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কঠোরভাবে কাজ করছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল ইংল্যান্ড হতে কাউন্সিলরগণ এসে পৌছানোর পর ওয়ারেন হেস্টিংস তাদের নিকট এই পরিকল্পনা দাখিল করেন। বিগত বছরগুলোতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনাটি তৈরী হয়েছিল। এই পরিকল্পনার সুপারিশে বলা হয়েছিল প্রথমতঃ জমিদারদের নিকট বাংলার অন্যসব জেলাগুলোকে জীবনের জন্য অথবা যৌথ জীবনের তরে লীজ দেয়া হবে যদি তাদের প্রস্তাব অন্যের সমান অথবা সমানের কাছাকাছি হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি জমিদার সময়মত রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে তার জমিদারি জনসমক্ষে বিক্রী হবে। এটাও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে জমির মালিকানা হতে অথবা একজন রাজস্ব কর্মকর্তা যে তার জেলাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হত। তৃতীয়তঃ যেকোন ক্রেতার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারেরা জমিদার হবে।

---

১৯. (Weitzman 1929:13)

২০. (Francies 1782: i-ix)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ দেওয়ানী লাভের পর থেকে যেসব কর আরোপ করা হয়েছিল তার সবই পুরোপুরি বিলোপ সাধন করা উচিত। পঞ্চমতঃ জমিদারের সাথে যদি সেটেলমেন্ট না হয় অথবা যদি সে তার নিজস্ব জমি আবাদ করাতে পারে, সে ক্ষেত্রে জমিদারী এমন কাউকে লীজ দেয়া হবে যারা সম্পদশালী এবং কৃষি ও পণ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধন করতে আগ্রহী। এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ হবে জমিদারের ভাতা। ষষ্ঠতঃ প্রত্যেক জমিদার বা আবাদকারী, যেখানে তার দখল ছিল, সেখানে সে আইনগত ভাবে ফৌজদারী কর্তৃত্ব এবং মফস্বল এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। সপ্তমঃ কোলকাতার কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এর ওপর দেশের জন্য যে আইন প্রয়োজন মনে করত তা বিধিবদ্ধ এবং অনুমোদন দেয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হবে।[২১]

বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য হেস্টিংসের পরিকল্পনা অধিকতর সতর্ক পথ অবলম্বন করছিল বলে মনে হয়, যেখানে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ফুরসৎ ছিল না। হেস্টিংস এবং তার সহকর্মীগণ মনে করতেন যে রাষ্ট্র অথবা জমিদার, অথবা রায়ত কারও একচ্ছত্রভাবে জমির ওপর অধিকার নেই।[২২] ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এই অবস্থান সমালোচনার সম্মুখীন হয় যখন ব্রিটিশ বেঙ্গল আর্মির অফিসার লে. কর্ণেল আলেকজান্ডার ডাও বাংলায় কোম্পানী শাসনের একটি সমালোচনামূলক প্রতিবেদন তৈরী করেন। (Henry Pattulo) ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করার মাধ্যমে ডাওয়ের সূচিত সমালোচনার সাথে যুক্ত হন। ডাওয়ের মতে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না করে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধির লুণ্ঠনকারী নীতি কার্যত এর ব্যবসায় ও বানিজ্য ধ্বংস করে দেয়।

দেশের লুপ্ত উৎপাদনশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য ডাও একটি নতুন ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিশ্চয়তা ও মেনে নেয়ার নিরাপত্তা বিধান করা হবে। সেহেতু এটা জরুরী যে ব্রিটিশ জাতির উচিত তার স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের কিছু অংশ এর অধিকৃত অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য প্রসারিত করা।[২৩] ডাওয়ের ন্যায় পাট্টুলোও বলেন যে দেশের ভূসম্পত্তি ভোগ-দখল সংক্রান্ত ব্যবস্থার ব্যাপারে কোম্পানীর ঔদাসীন্য এবং নির্লিপ্ততা এর অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। ডাও এবং পাট্টুলো উভয়েই এই মত পোষণ করেন যে সম্পাদন যোগ্য খাজনার প্রতি কোম্পানীর পছন্দ রায়তাদের ওপর অতিরিক্ত চাহিদা আরোপ করেছে, যা পুঁজিবাদী চাষীদের উদ্যোগ হতে বাংলাকে বঞ্চিত করেছিল। তাদের মতে কৃষি তৈরী করেছে উদ্বৃত্তমূল্য, যার গঠন প্রক্রিয়া সঞ্চালন নয়, উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

---

২১. (Act of India 1782:3-13).

২২. (Weitzman 1929:72)

২৩. (Dow 1792, Vol. Iii, Ixxxiii)

Dhaka University Institutional Repository

তারা অভিযোগ করেন যে রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো সার্বজনীন মান অনুসরণ করা হয় নাই। শুধু মুনাফালোভীদের থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী কৃষকদের ওপর কর আরোপ করার ক্ষেত্রে কোম্পানী ভিন্নতার অভাব দেখাতে পারে নাই। যদি কোম্পানী পুঁজিবাদী কৃষকদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতো এবং বৈধতাকে স্বীকার করত তাহলে পরিস্থিতি অবশ্যই পরিবর্তন হতো। সুতরাং ডাও এবং পাট্টুলো মনে করেন যা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার নিশ্চয়তা রাজ বা রায়তদের মধ্যে একটি আস্থার বন্ধন হিসেবে কাজ করত। বিদ্যমান স্থবির অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত করণের দ্বারা কৃষি অর্থনীতির পুনর্বাসনের জন্য জোড় সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রশ্নে একে অপরের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। একজন বানিজ্যপন্থি হিসেবে ডাও বিশ্বাস করতেন যে ব্যবসায় ও বানিজ্যের তুলনায় কৃষির অবস্থান হচ্ছে পরে। অপর দিকে, পাট্টুলো দেশের অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন এবং কৃষি উন্নয়নে ফিজিওক্রাটীয় অবস্থানকে সমুন্নত রেখেছেন। পাট্টুলো মনে করতেন কৃষির ভিত্তিতে একটি যুতসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষিজীবী শ্রেণীসমূহের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। এই উৎসাহ তখনই আসবে যখন কৃষকগণ তাদের জমির মালিক হবেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কৃষি উন্নতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কর্ণওয়ালিশের চিরস্তায়ী বন্দোবস্তও বেশীরভাগে এর লক্ষণ হয়েছিল। এভাবে এমনকি ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় ফিলিপ ফ্রান্সিস পৌছানোর পূর্বে ভূমি ব্যবস্থা কিভাবে নির্ধারিত হবে সেই ধারনাসমূহের দ্বারা রাজনৈতিক কলুষিত ঘটে।

২.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তৎকালীন পূর্ববাংলা

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকান্ড সম্পর্কে ফিলিপ ফ্রান্সিসের একটি ধারনা ছিল। আর ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যাপারে তার মতামত ইংল্যান্ডে থাকাকালে যে প্রাথমিক জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন তার দ্বারা রঞ্জিত ছিল।[২৪] তার সময়ের চরমপন্থী ধারনার সংস্পর্শে এসে এবং ফরাসী চরমপন্থী চিন্তাবিদদের উৎসাহী সমর্থক হিসেবে তিনি বাংলায় কোম্পানী শাসনের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ফ্রান্সিসের কাছে মার্কেন্টাইলইজম ছিল প্রতিক্রিয়ার ভান্ডার এবং প্রগতির পথে একটি বাঁধাস্বরুপ।[২৫] ফ্রান্সিস মনে করতেন কোম্পানীর যদি দক্ষ মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকত তাহলে বাংলায় অব্যবস্থাপনা এড়ানো যেতো।[২৬]

---

২৪. (Weitzman 1929:18-21)

২৫. (Weitzman 1929:59; Guha 1963:61-89)

২৬. (Weitzman 1929:7,21)

Dhaka University Institutional Repository

তার বিগত দিনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান তুলে ধরা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে এই পরিকল্পনা বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করে। প্রথমত: কোম্পানী শাসনের শুরু থেকে রায়তদের ওপর যেসব কর আরোপ করা হয়েছিল তার সবই বিলোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত: কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত এমন সঙ্গতিসম্পন্ন উপায়ের লোকদেরকে জমি লীজ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। কাউন্সিলের নিকট গভর্ণর জেনারেলের এপ্রিল পরিকল্পনা পেশ করার পূর্বে জেনারেল ক্লাভেরিং এবং কর্ণেল মনসুন সহ ফ্রান্সিস স্বীকার করেন যে বাংলার অর্থনৈতিক অবনতি ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দূর্ভিক্ষের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু অধোগতির প্রধান কারণ এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল, যা জনগণের আকর্ষণকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং সরকারের প্রতি সকল প্রকার আস্থাকে ধ্বংশ করে দিয়েছিল। ফ্রান্সি, ক্লাভেরিং এবং মনসুন এর একটি রাজনৈতিক ত্রিমাত্রিকতা ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আবির্ভূত হয়, যা বাংলায় হেস্টিংসের পরিকল্পনাকে বিরোধীতা করতে সম্মত হয়। সেই ব্যবস্থাটা কি ছিল যার জন্য ফ্রান্সিস আগ্রহী ছিলেন? তার পূর্বস্থিরিকৃত অবস্থানের প্রকৃতি তার স্মৃতিআলেখ্য এবং ব্যক্তিগত পত্রাদিতে প্রতিফলিত হয়েছিল যা তিনি ইংল্যান্ডে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট লিখেছিলেন। পুনঃ পুনঃ তিনি তাঁর মূল বিষয়ে ফিরে এসেছেন কিভাবে দেশের উত্তরাধিকারী ভূ-সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল বাংলার ভূ-মালিক অভিজাত সম্প্রদায় কোম্পানী শাসনের দ্বারা রাতারাতি সম্পূর্ণ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি এব্যাপারে স্থিতিবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন।[২৭]

ফ্রান্সিসের ধারনা অনুযায়ী সমাজের চিরায়িত কাঠামো সমুন্নত রাখার মত কোন দায়িত্বশীল ভূ-মালিক অভিজাত সম্প্রদায় বাংলায় তখন ছিল না। ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগী দালাল যারা ছিল নেতৃস্থানীয় সামাজিক শক্তি, সামাজিক দায়িত্বশীলতার সূক্ষ বিষয়াদি হতে তারা আলাদা হবার প্রবনতাসম্পন্ন ছিল। সুতরাং দেশের উৎপাদনশীলতার দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে ভূ-মালিক অভিজাত সম্প্রদায়কে তাদের অতীত সম্মানজনক অবস্থানে ফিরিয়ে আনা। ফ্রান্সিসের অনুকল্প হলো; সঠিক মালিক হিসেবে বিবেচিত জমিদারদের সাথে কোম্পানীর একটি নির্ধারিত ব্যবস্থা করা দরকার। কোনো প্রমান ছাড়াই ফ্রান্সিস এই উপসংহারে উপনীত হন। জমিদারদের পক্ষে তার বক্তব্যকে আরও জোরদার করার জন্য ফ্রান্সিস যুক্তি উপস্থাপন করেন।

---

২৭. (Weitzman 1929:243-244)

Dhaka University Institutional Repository

"কোম্পানী একটি প্রাক অথচ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিলেন যে শাসক শক্তি ছিল মৃত্তিকার স্বত্বাধিকারী।[২৮]

কয়েক বছর যাবৎ ফান্সিস যে ধারনা নিয়ে চর্চা করেছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য তার পরিকল্পনাটি ১৭৭৬ সালের ২২ জানুয়ারি কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হয়। তার পরিকল্পনায় অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বর্ধিত অব্যবস্থাপনার জন্য স্বত্বাধিকারী শ্রেণী এবং রাজস্ব সংগ্রহের প্রাচীন পদ্ধতির অনুপস্থিতিকে দায়ী করেন। কোম্পানী শাসনের অপচয়ের মূলে ফ্রান্সিসের মতে, এই বিশ্বাস হতে উৎপত্তি লাভ করেছে যে, মৃত্তিকার স্বত্ত্বাধিকারী হচ্ছে ভারতের শাসক শক্তি। জমিদার এবং তালুকদারদের (অধঃস্তন জমিদার) সম্পত্তি যেহেতু উত্তরাধিকারযোগ্য সেহেতু তা ব্যক্তিগত এমন দাবীর যৌক্তিগতা প্রমানের জন্য ফ্রান্সিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দেওয়ান (অর্থমন্ত্রী) রেজা খানের কর্তৃত্ব তুলে ধরেন। ফ্রান্সিসের যুক্তি অনুসারে মুঘলদের বুদ্ধিমান নীতির ফলে বাংলার সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। নির্ধারিত রাজস্বের মডারেট নীতি অনুসরণের দ্বারা মুঘলরা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রবল লালসার বিপক্ষে ভূ-সম্পত্তি ভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবারপর থেকে কোম্পানী নিজেকে রায়ত এবং জমিদারদের মাঝামাঝি স্থানে উপস্থিত করেছিল। তবে ফ্রান্সিসের মতে কোম্পানীর নীতির এরুপ বৈপরীত্য মুনাফা লাভের তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রণীত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে সর্বোচ্চ করদাতাকে কোম্পানী ভূমি প্রদান করছিল। সাধারণত প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যে ভূমিগুলো তোলা হত, যেখানে মালিকদের বিপক্ষে দর হাকার জন্য আগন্তকের আমন্ত্রণ জানানো হত। এই সব মালিকদেরকে তাদের জমিদারীর দখল ও ব্যবস্থাপনা হতে বহিস্কার করা হয় অথবা কৃষকদের ওপর নির্ভর করে একে ধরে রাখার অনুমোদন দেয়া হয়। এদের অনেকেই ছিল কোলকাতার বনিক যারা তাদের ব্যবসা সম্পর্কে কিছুই জানত না, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রকৃত মালিককে কৃষক বা প্রজা হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য হত।[২৯] রাজস্ব কৃষকগণ বেশীরবাগ ক্ষেত্রে জমির ওপর স্বল্প স্বার্থ আছে বলে বিবেচিত হত এবং নির্ধারিত হুস্তাবাদ (খাজনার তালিকা) এর অভাবে রায়তদের ওপর নিজস্ব রেট আরোপ করত, আর এভাবে দরিদ্র রায়তদের জমি থেকে বিতাড়িত করত। লুণ্ঠনমূলক এই কর ব্যবস্থা, সম্ভাব্য সবচেয়ে বেশী মাত্রায় রাজস্ব বৃদ্ধি করা ছিল যার লক্ষ্য।

---

২৮. (Firminger 1917, Vol.I, ccci).

২৯. (Firminger 1917, Vol.I, ccxciv)

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রকৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল শত্রুভাবাপন্ন, আর তাই প্রত্যেক মালিককে সরকারের শত্রু প্রতিপন্ন করার প্রবনতা সম্পন্ন ছিল।

বাংলায় রাজস্বের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ফ্রান্সিসের মতামত মুঘল জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তে পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্তবাদী নিয়ম nulli terre sans seigeur এর দ্বারা রঞ্জিত ছিল। মুঘল আমলে ভূ-সম্পত্তি ছিল রাষ্ট্র এবং কৃষকের মধ্যে বিভক্ত অধিকার। তখন যতদিন পর্যন্ত কর প্রদান করতেন কৃষক ততদিন পর্যন্ত এর মালিক থাকতেন। তবে ভারতে জমিদারগণ সম্পত্তির মালিক ছিলেন এই ধারনা শুধু ফ্রান্সিস একাই পোষণ করতেন না। কোম্পানীর অনেক কর্মচারীর চিন্তা ভোগ দখলের শর্তাবলী ও জমিদারীর ইংরেজ মতবাদের দ্বারা মালিকানার রোমান ধারনা এবং জমিদারী সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংকীর্ণ ধারণায় আবদ্ধ ছিল।[৩০] ফ্রান্সিস মনে করতেন প্রত্যেক চাষীকে জমির ব্যাপারে জমিদারের সাথে একটি চুক্তিতে আসা উচিত। আর সেই চুক্তি হবে মুক্ত বাজারের মূল্য অনুযায়ী। সুতরাং জমিদার এবং রায়তদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সরকারের কাজ করা ছিল অর্থহীন। এছাড়া যদিও তাদেরকে নিজেদের, ওপর ছেড়ে দেয়া হত তবে তারা শীঘ্রই একটি চুক্তিতে আসবে, যাতে প্রত্যেক পক্ষই নিজের সুবিধা পাবে। তাই জমিদারদের সাথে একটি মীমাংসায় পৌছানো এবং রায়তদেরকে জমিদারদের সুরক্ষা অধীনে নিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শাসক এবং রায়ত ব্যতীত এই রাষ্ট্র আর কোনো কিছুরই সমষ্টি নয়, রায়তগণ জমির, এই কথাটি সত্য নয়। তার নিজের অথবা সরকারের মুনাফার জন্য এমনটি হওয়া তার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। প্রত্যেক নিয়মিত সরকারের জন্য দরকার হচ্ছে, জনগণের বেশীর ভাগ হবে শ্রমিক, আর অল্প কয়েকজন বেশী সংখ্যকের শ্রম দ্বারা সমর্থিত হবেন, যারা শান্তি, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার মধ্যে তাদের প্রতিদান লাভ করেন, যা যথাযথ কর্তৃত্ব এবং নিয়মিত অধীনতার সঙ্গী ।

রায়তদের ওপর ফ্রান্সিসের সদাশয় স্বৈরশাসন ছিল ইংরেজ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী সম্প্রদায়ের স্মৃতিচারণ যারা নিম্নশ্রেণীর ভাগ্য এবং স্বার্থের উপর শাসন করত। তাদের ভাগ্যকে ভূসম্পত্তির অধিকারী সম্প্রদায়ের ওপর ছেড়ে দিলে নিম্ন শ্রেণীগুলো আর্থিক ও মানসিক সাহায্য লাভ করবে। উদার নীতি বা Laissez faire এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দর্শনকে ফ্রান্সিস জনপ্রিয় করাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতগতভাবেই মালিক শ্রেণী ছিল দায়িত্বশীল; সেহেতু সুরক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তাকে প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৭৮১ সালে তিনি ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

৩০. (Francis Megarry and Wide 1959:13-39)

Dhaka University Institutional Repository

ফার্মিংগার যথার্থভাবেই বলেন যে, ১৭৭৫-১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের বিশাল রাজস্ব বিতর্ক ফ্রান্সিস রাজত্ব প্রশ্নের চেয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরে বেশী নিয়োজিত ছিলেন। তার সময়ের অন্য সব ফিজিওক্রাটিদের মতন ফ্রান্সিস এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক আইনের নীতি দ্বারা অনুপ্রানিত ছিল, যেগুলো ছিল অবশ্য পালনীয় এবং স্থায়ী সত্য, হোক তা বাংলা অথবা ইংল্যান্ডে।[৩১]

কিন্তু জমির একচ্ছত্র মালিক হিসেবে জমিদারদেরও অধিকারের ব্যাপারে ফ্রান্সিসের সুপারিশমালা ইংরেজ সংসদ সদস্যদের মধ্যে অনুকুল ছাপ একে দেয়। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্ণর জেনারেলের পদ অলংকৃত করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে রওয়ানা দেন ঠিক তখন কোর্ট অব ডাইরেক্টরস এই মর্মে ভোট প্রদান করেন যে, "পূর্ববর্তী বছরগুলোর প্রকৃত সংগ্রহের" ভিত্তিতে জমির স্থায়ী মালিক হিসেবে জমিদারদের গ্রহণ করা উচিত। ফিজিওক্র্যাটীয় প্রভাব কাজ করতে শুরু করে। ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি লিখেছেন-

"... ব্যবস্থাটির উপযোগীতা সম্বন্ধে আমার মনে যেহেতু
স্পষ্ট প্রতীত আছে, তাদের নিকট, আমার দেশের নিকট
সর্বাধিক সনির্বন্ধভাবে কোন সময় ব্যয় না করে বন্দোবস্তের স্থায়ীত্ব
ঘোষণা করার সুপারিশ করা আমার কর্তব্য মনে করা উচিত"।

কোম্পানীর একজন অভিজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্ট জন শোর চির স্থায়ী বন্দোবস্তর ব্যাপারে আপত্তি জানান। তিনি বাংলার বিভিন্ন কৃষি শ্রেনীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য সতর্কভাবে পদক্ষেপ দেয়ার জন্য কর্ণওয়ালিশকে উপদেশ দেন। যদিও জমিদারদের সাথে একটি সমঝোতা তৈরীর জন্য প্রস্তাবনার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।[৩২] এই আপত্তির ব্যাপারে কর্ণওয়ালিশ অলংকারিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, সেই পদক্ষেপগুলো কি যার সফলতার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ না থাকতে পারে ? অথবা কি সেই অভিজ্ঞতা যা চাওয়া হচ্ছে, এবং একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অল্প কয়েক বছরের জন্য বিলম্বিত করে দেয়া হলে সম্ভত কি ধরনের অগ্রগতি সাধিত হবে?[৩৩] বন্দোবস্তের ব্যাপারে কর্নওয়ালিশের যুক্তি, ফ্রান্সিসের মত একই উদার নীতি বা Laissez faire এর যুক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছিল খধরংংব্র ভধরৎব এর এই আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের এবং ভূ-সম্মত্তির স্বার্থ সবচেয়ে ধনীক শ্রেণীর লোকদের হাতে পড়া উচিত, যারা রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং অবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

---

৩১. (Firminger 1917, Vol. IIxvii)

৩২. (Firminger 1917, Vol. II, 478,515-518)

৩৩. (Forrest 1927, Vol.ii, 77)

Dhaka University Institutional Repository

আর এভাবে দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি এগিয়ে নেবে।[৩৪] ফ্রান্সিসের ন্যায় কর্ণওয়ালিশও একটি জটিল সমস্যার জন্য একটি সহজ সমাধান খুঁজছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনার সাথে কর্নওয়ালিশ চিন্তা করেন যে জমিদারদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিবর্তণ আসা উচিত। কর্নওয়ালিশের বিবেচনায় জনস্বার্থের ব্যাপারে আরও পরিপক্ক হবার সাথে সাথে জমিদারদের হওয়া উচিত এর ট্রাষ্টি। জমিদানদের লোভ প্রতিহত করার জন্য কর্নওয়ালিশ বড় বড় খন্ডিত করার মাধ্যমে ছোটছোট জমিদার সৃষ্টির জন্য বলেছিলেন। রায়তদের ওপর জমিদারের অত্যাচারের ক্ষেত্রে এটি একটি নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করবে। তবে চূড়ান্ত পর্যালোচনায়, তিনি জোড় দিয়েছিলেন যে রায়ত এবং জমিদারদের মাঝখানে দাঁড়ানো সরকারের কর্তব্য নয়। কর্নওয়ালিশের মতে, সরকারের কাজ হচ্ছে, আইন প্রণয়ন করা, কোন হস্তক্ষেপ করা নয়। হুইগ দমনের ভাবধারা অনুসারে কর্নওয়ালিশ বলেন, 'কোন ব্যক্তি জমির মালিক হলো এটা সরকারের কাছে অর্থহীন, যদি সে এটি চাষাবাদ করে, রায়তদের রক্ষা করে, এবং সরকারী রাজস্ব প্রদান করে।'[৩৫] সেহেতু কর্ণওয়ালিশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি দায়িত্বশীল সামাজিক শ্রেণী অনুসন্ধান করে নেয়া যারা দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করবে এবং সরকারের নিকট অনুগত থাকবে। হুইগদের মত কর্নওয়ালিশ দৃঢ় মত পোষণ করতেন যে, প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে প্রতারণামূলক। প্রভু হিসেবে কাজ করতে হলে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অবশ্যই ন্যুনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে এবং এমনকি তা' পৃথক এবং ভারসাম্যপূর্ণ হবে। এমন একটি সামাজিক শ্রেণী যার সাথে সরকার সমঝোতায় উপনীত হতে পারে তা' খুজে পাওয়া ছিল আবশ্যিক। নতুবা, রাষ্ট্র এবং রায়তদের মধ্যেকার সকল সামাজিক মধ্যস্থতাকারীগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কোম্পানীর নির্ভেজাল স্বার্থ সমুন্নত রাখা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে এজন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রধান জমির মালিক এবং ব্যবসায়ীগণ এমন এক অবস্থায় উপনীত হওয়া উচিৎ যেন শিষ্ঠতার সাথে তাদের পরিবারবর্গকে সমর্থন করতে তা সক্ষম হয় এবং তাদের নিজ নিজ বর্ণ এবং ধর্মের প্রথা অনুযায়ী তাদের শিশুদের উদার শিক্ষা দিতে পারে- পদমর্যাদার নিয়মিত উন্নতি যেন সমর্থন করা যায়, যা এই দেশের ন্যায় অন্য কোথাও সুশীল সমাজের নিয়ম রক্ষার জন্য এমন প্রয়োজনীয় নয়।[৩৬]

---

৩৪. (Forrest 1927, Vol.ii, 75,77)

৩৫. British parliamentary papers 1812, Vol.vii, 473)

৩৬. (Keith 1921 Vol.1:150).

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের অভিজ্ঞতায় জড়িত বিভিন্ন বিবাদমান মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ সুশীল সমাজ যা কর্নওয়ালিশ ধারণ করছিলেন তা কখনও ভাবতে দেখা যায়নি। অপর দিকে সাম্রাজ্যের রক্ষাপ্রাচীর হিসেবে কাজ করতে পারে এমন একটি মধ্যবর্তী সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল ঔপনিবেশিকদের একটি প্রচেষ্টা বিশেষ। আকাঙ্খিত সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর অধিকার নিরুপণ করাকে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিল। বিশেষত: যখন রায়তদের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছিল এবং জমিদারদের জমির নিরংকুশ মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী জমির মালিকানা রায়তদের হাত হতে জমিদার হিসেবে পরিচিত রাজস্ব সংগ্রহকারীদের হস্তান্তর হচ্ছিল। আর এভাবে, জমিদারেরা জমির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিল। পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছিল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার আদর্শসূচক ইংরেজ ধারণার প্রেক্ষিতে। জমিদারগণ যেহেতু নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল, সেহেতু ভোগদখলের অসমাপ্ত প্রশ্ন কৃষি অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করছিল।

২.২.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত পরিপূর্ণভাবে প্রণীত আইন ছিল না। বরঞ্চ, কর্নওয়ালিশ নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে রায়ত এবং জমিদারদের মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নত করার জন্য অনেক কিছু করার ছিল। কিন্তু তার উত্তরাধিকারগণ চিরস্তায়ী বন্দোবস্তকে এমন একটি ঘটনা হিসেবে গণ্য করেছিলেন যা কোনোভাবেই আর ফেরানো বা অন্যথা করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, জমিদারগণ এই বন্দোবস্তকে মীমাংসা অযোগ্য একটি বিধান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যা তাদেরকে রায়তদের সাথে কোন ধরনের পছন্দনীয় চুক্তিতে উপনীত হতে নিরংকুশ ও একচেটিয়া এখতিয়ার দিয়েছিল। একশ বছর পর ব্যাডেন পাওয়েল লিখেছিলেন যে বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী প্রকৃতির কারণে জমিদারগণ রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য থেকে কেবল বঞ্চিত করে নাই, রাজস্বের বোঝা অন্য সামাজিক শ্রেণীর ওপর দিয়েছিল।[৩৭] জমিদারেরা রাষ্ট্রকে আদায়কৃত রাজস্বের আনুপাতিক হারে প্রদান করত না, তারা রাষ্ট্রকে এককালীন অর্থ প্রদান করত। উদাহরণ স্বরুপ দীঘাপতিয়ার জমিদারের আদায় ছিল দুই লক্ষ রুপির অধিক কিন্তু তাকে ভূমি রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রকে দিতে হত ১৮০১৩/রুপি।[৩৮]

---

৩৭. (Badeen-Powell 1889:Vol.i.403)

৩৮. (Gupta 1910:83).

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত সকল কৃষকেরা অফিসিয়ালভাবে চুক্তি প্রজায় পরিণত হত। জমিদারগণ বাধ্যতামূলকভাবে একটি কবুলিয়ত ইস্যু করতেন। এর এক কপি জমিদারের কাছে থাকত, অন্য কপি পাট্টা বা ডিড থাকত রায়তদের কাছে। কিন্তু বাস্তবে জমিদার এই ডকুমেন্ট তৈরী করার ব্যাপারে ছিল উদাসীন। ফলে প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে কখনও নিখুত দর নির্ধারিত হত না। এ অবস্থা ১৮৫৯ পর্যন্ত বহাল ছিল যখন "এ্যাক্ট অব টেন" পাস হয়েছিল যেখানে নীতিগতভাবে জমিতে রায়তের অধিকার স্বীকৃত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত রায়ত জমিদারকে খাজনা পরিশোধ করত।

তবে এই বন্দোস্তের সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক দিক ছিল এই যে, এটি সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে এবং উৎপাদন অবস্থার সাধনে ব্যর্থ হয়। প্রজাদের খাজনার ওপর জীবিকা নির্বাহক জমিদারগণ পরগাছায় পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের বেশীরভাগ অনুপস্থিত (absence) জমিদারে পরিণত হন। যারা বসবাস করতেন কোলকাতায় এবং যাই হোক না জমিদারিতে কেন আগ্রহ পোষণ করতেন না। জমিদারি জীবিকা অর্জনের একটি উপায় এবং পূর্বের চেয়ে অধিক লাভজনক একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী রায়ত এমন এক ব্যক্তিকেই বোঝাত যে জমি চাষ করত। ১৭৯৩ সালের আইন, যা চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। এই আইনে দুই ধরনের চাষীর কথা বলা হয়েছিল- খুদ-কাস্থ এবং পই-কাস্থ। খুদ কাস্থ যে গ্রামে বসবাস করত সেই গ্রামেই জমি চাষাবাষ করত। তারা আবাসিক চাষী হিসেবে ও পরিচিত ছিল। আর এই খুদ-কাস্থগণ বছরের পর বছর খাজনা পরিশোধ করে জমি ভোগ দখল করত। আর এখানে থেকেই ভোগদখলের অধিকার উৎপত্তি লাভ করে। যদিও ক্রয় অথবা বিক্রয় অথবা বকেয়ার কারণে খুদ-কাস্থদের বিতাড়ন করা যেত না, তাদের প্রদেয় খাজনা বৃদ্ধি করা যেত, যদি না তারা প্রমান করতে পারত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বিশ বছরেরও বেশী সময় ব্যাপী তাদের খাজনার হার অপরিবর্তিত ছিল। তত্ত্বগত দিক দিয়ে খুদ-কাস্থগণ জমিদারদের মতই মুনাফা ভোগ করত, যতদিন পর্যন্ত ঐস্থানের প্রতিষ্ঠিত রাজস্বের হার প্রদান করতে থাকত। পাই কাস্থগণ ছিলেন অনাবাসী চাষী, যেসব গ্রামে তারা বসবাস করত না সে সব গ্রামের জমি তারা চাষাবাদ করত। পাই-কাস্থগণ অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তাদের জমিগুলোতে স্বত্ববন থাকত। আর তাদের খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারত। খুদ-কাস্থর ন্যায়, জমির ওপর পাই-কাস্থগণ স্থায়ী অধিকার ভোগ করত না, এবং তাদেরকে যে কোন সময় জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেত।

Dhaka University Institutional Repository

একজন রায়তের খাজনা ছিল দু'ধরনের একটি মূল খাজনা আর অপরটি হলো অতিরিক্ত খাজনা। ১৭৯৩ সালের আইনের রেগুলেশন নং- আট এর ৫৬ এবং ৬১ নম্বরের বিধান অনুসারে রায়তগণ জমিদারের কাছ থেকে পাট্টা পাবার হকদার ছিল যার মধ্যে জমি দখলে রাখার শর্তাবলী নির্দিষ্ট করা থাকত। এর বিনিময়ে রায়ত একটি লিখিত সম্মতিপত্রে জমি দখলে রাখার শর্তাবলী উল্লেখ করা থাকত যা কবুলিয়ত নামে পরিচিত ছিল। জমিদার এবং রায়তদের মধ্যে সম্মতিপত্র চুক্তিনামা বাতিল করা যেত, কেবল তখনই যখন জমিদার প্রমান করতে পারত যে পাট্টায় যে খাজনার কথা বলা হয়েছে তা' বিদ্যমান স্থানীয় হারের চেয়ে কম। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর রেগুলেশন নং- VIII এর ৫৫ নম্বর সেকশনে অবৈধ কোন কর-আবওয়া আরোপ করার ওপর কড়াকড়িভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই সাথে এও বলা হয় যে, যে কোনো জমিদার এই রেগুলেশনের বিধান ভঙ্গ করলে তাকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে। কিন্তু একই সাথে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের XLIV নং রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী জমিদারগণ রায়তদের কে ১০ বছরের অধিক মেয়াদের জন্য পাট্টা দিতে পারতেন না। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে মেয়াদের শেষে জমিদারগণ রায়তের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়ে নিতে পারতেন। যদিও ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের VIII নং রেগুলেশনে, XLIV নং রেগুলেশনের অপব্যবহার রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। VIII নং রেগুলেশনে এমন কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না যার দ্বারা জমিদারকে বিরত রাখা যেত।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলের ভূমি ব্যবস্থার সাথে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যায় ? বিভিন্নভাবে এটি করা যায়ঃ প্রথমতঃ চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত রায়ত এবং জমিদারদের সম্পর্ক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভেদ্য, রক্ষাব্যুহের অধীনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকারে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে যা' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃথকীকরণ চিহ্নিত করেছে।[৩৯] দ্বিতীয়তঃ একজন রায়ত সাধারনতঃ বিগত দিনে দীর্ঘ পেশার কারণে জমির মালিকানার অধিকার লাভ করত। তাকে উচ্ছেদ করা যেত না যদিও তারা হস্তান্তরের অধিকার লাভ করত। তাকে উচ্ছেদ করা যেতনা যদিও তার হস্তান্তরের অধিকার নিষিদ্ধ ছিল। নতুন ব্যবস্থাধীনে জমিদার ইচ্ছা করলে কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। ১৭৯৩ সালে চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত সূচিত হবার পর থেকে রায়তদের রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে অসংখ্য রেগুলেশন ও উপবিধি সংযুক্ত এবং বিয়োজিত হয়েছে কিন্তু তার কোন ফল হয় নাই। খাজনা বৃদ্ধি করা যেহেতু জুমিদারের এখতিয়ারধীন ছিল সেহেতু রায়তগণ ছিল জমিদারদের লোভের শিকার।

---

৩৯. (Alavi 1980:22)

Dhaka University Institutional Repository

এর নীট ফলাফল ছিল এই যে, রায়তদের প্রদানযোগ্য খাজনার বৃদ্ধি পেলেও জমিদার কর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ ছিল স্থির। এইভাবে বিবেচনা করা হলে দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদার এবং রায়তদের সম্পর্ক সঙ্গায়িত করে নাই।[৪০] জমিদার এবং রায়তের এইরুপ অনির্দিষ্ট সম্পর্ক গ্রাম অঞ্চলে উত্তেজনার এক অব্যাহত উৎস হিসেবে বিবেচিত হত, এবং সর্বোপরি আধুনিক যুগে বাংলার রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক পরীক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে।

পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে ১৭৯৯ সালে রেগুলেশন VII পাস হবার মধ্য দিয়ে যাকে বলা হত "সপ্তম"। এই রেগুলেশন দ্বারা সম্পদ ও মালামাল ক্রোক করার নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয় জমিদারদের। রায়তগণ যখন তাদের জমি জায়গা পরিত্যাগ এবং অন্য কোন জায়গায় চলে যেত অথবা স্থানীয় প্রথাসম্মত হারের চেয়ে বেশী খাজনা আদায়ের অভিযোগে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করার কারণে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল এই রেগুলেশন পাস করার আসন্ন কারণ। এর ফলে বিশাল সংখ্যক মামলা জমে যায় সিভিল আদালতে নিস্পত্তি করা যা ছিল অসম্ভব।[৪১] এই আইনী কৌশল, রায়তদের সামাজিক প্রাকৃতিক ধারনার সাথে মিলিত হয়ে রাজস্ব হতে জমিদারদের বঞ্চিত করত, এবং সেহেতু বকেয়া প্রদান ছিল আরও নাজুক। অতিদ্রুত রেগুলেশন VII রায়তদের জন্য সর্বাধিক ভীতিকর আইনে পরিণত হয়।

রেগুলেশন VII এর সাথে সবচেয়ে কুখ্যাত বৈশিষ্ট্য ছিল যদি জমিদারের এইরুপ বিশ্বাস করার কোন কারণ থাকত যে রায়তদের নিকট প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ না করেই সে পালিয়ে যাবে তবে আইনী আদালতে না যেয়েই জমিদারকে এই রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে পাওনা বুঝে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। আইন অনুযায়ী জমিদারকে স্থানীয় কমিশনার অথবা জেলা সিভিল কোর্টকে জানানো উচিৎ ছিল। এই সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একজন জমিদার রায়তকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলে পাঠাতে পারত এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা জমিদারকে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। বস্তুতপক্ষে রেগুলেশন VII পল্লী অঞ্চলে সুগভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই রেগুলেশনের প্রনেতা এটা পত্যক্ষ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে বাংলায় কৃষি ক্ষেত্রের অস্থিতিশীলতা উদ্ভূত হয়েছিল চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত কর্তৃক রায়তদের আইনী মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে অপারগতার কারণে।

---

৪০. (Baden-Powell 1889, Vol.i.406)

৪১. (Report of the land Revenue Commission 1940 Vol.i.21)

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাটি আরও জটিল রুপ ধারণ করে স্থানীয় কোনো হার বা ব্যবহার বিধির অনুপস্থিতিতে যা ভূ-স্বামী এবং রায়তদের মধ্যে গোলমালের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারত। অতিরিক্ত সামাজিক অস্থিরতা পরিহার করত নায়তদেরকে আইনের হাত হতে রক্ষা করার জন্য এই রেগুলেশন বাতিল করার লক্ষ্যে সরকার একটি সংশোধনশীল প্রস্তাব করে যা প্রায় অকার্যকর ছিল।[৪২]

১৭৯৯ সালের রেগুলেশন VII এর মালক্রোক আইনের কঠোরতা হতে রায়তদের রক্ষা করার জন্য ১৮১২ সালের রেগুলেশন V প্রনীত হয়েছিল, যা 'পঞ্চম' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পঞ্চম আইন সমস্যার কারণের চেয়ে লক্ষণ নিয়ে বেশী ব্যাপৃত ছিল। রেগুলেশন V সিভিল কোর্টে জামানত দিয়ে ক্রোক বিলম্ব করার জন্য রায়তদের যথেষ্ট সময় প্রদান করেছিল, এবং পরে দাবী সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে পনের দিনের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হত। তবে রেগুলেশন V রায়তদের দাবী মেটাতে ব্যর্থ হয়। লোভী জমিদারগণ ১৮১২ সালের রেগুলেশন অব্যাহতভাবে অবজ্ঞা করতে থাকে। রাষ্ট্র জমিদার এবং তাদের লোভী এজেন্টদের সুরক্ষা দেয়া অব্যাহত রাখে, যারা এই ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল এবং পল্লী জনসংখ্যার ওপর চেপে বসেছিল।[৪৩, ৪৪] রায়ত এবং জমিদারদের মধ্যে চলতে থাকা সংঘাত ইংরেজ সরকারী কর্মচারীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবাসিক রায়তগণ (খুদ-কাস্ত), মাটিতে যাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ নিহিত ছিল, জমিদারদের শিকারে পরিণত হয়। এভাবে জমিদারদের স্বৈরাচার ব্রিটিশ রাজের সর্ব নিম্নপর্যায়ের স্পর্শ করে যার ওপর সাম্রাজ্যের গঠনশৈলী দন্ডায়মান ছিল। এই পরিস্থিতিতে উৎসাহ ব্যঞ্জক বানিজ্য ভিত্তিক কৃষির ভবিষ্যৎ বিবর্ন মনে হচ্ছিল। একই সাথে কৃষির উন্নতির জন্য জমিদারগণ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছিল এমন কোন প্রমাণের সমর্থন পাওয়া যায় না।[৪৫] প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে জমিদারগণ কৃষির উন্নতিতে আগ্রহী ছিলেন না। নির্ধারিত আয়ে তাদের আত্ম-তৃপ্তির কারণে কি এটি হয়েছিল ? অথবা বিনিয়োগ হিসেবে কৃষিতে উৎসাহদায়কের অভাবেই কি এমন হয়েছিল? ঔপনিবেশিক সরকার সামন্তবাদের অবশিষ্টগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা অব্যাহত রেখেছিলে। পাশাপাশি এটি দেশের উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের চেষ্টা করে নাই। ইংরেজ বনিক পুঁজিকে রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ফলে-

---

৪২. (British parliament papers 1831-32, Vol.Xi:465)

৪৩, ৪৪. (British parliament Papers 1831-32, Vol. xi: 477- 481: Calcutta Review 1844:191)

৪৫. (Slections from the Records of Begal, 1854, No. xvi:13-14).

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশী বনিক পুঁজি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং এরা ক্রমান্বয়ে ইংরেজ পুঁজির উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়ে উঠেন। জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেশে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকে। শিল্পের অগ্রগতির অনুপস্থিতিতে, জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ তাদের জীবিকার জন্য কৃষি-জমির উপর নির্ভরশীল থাকে, আর এভাবে সরবরাহ যেহেতু ছিল সীমিত, চাষাবাদে বিনিয়োগের চেয়ে বর্গা দেয়াই জমিদারগণ অধিক মুনাফা দেখতে পান। দ্বিতীয়তঃ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প এবং শহুরে জনসংখ্যার দ্রুত হ্রাস দেশের অর্থনীতির উপর একটি বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কুটিরশিল্প, যা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা অন্যকোন বিকল্প শিল্প দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় নাই।[৪৬]

বাংলার অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে কৃষি আত্মপ্রকাশ করে। বনিক পুঁজিপতিদের জন্য জমিদারি ক্রয় করা একমাত্র লাভজনক ব্যবসায়ী প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ আধুনিক পদ্ধতির চেয়ে উৎপাদনের উপায় এবং শ্রম এদুটির একটাকে আর একটা থেকে পৃথক করা হত না। ফলে, উৎপাদনের শক্তিগুলোকে উন্নত না করেও কৃষি ক্ষেত্র থেকে উদ্বৃত্ত পাওয়া সম্ভব ছিল।

এই বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদার বা ভুমি মালিক, মধ্যস্বত্বভোগী, ভূমিহীন কৃষক মহাজন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। নতুন ভূমি বন্দোস্তের ফলে হিন্দু মুসলমান সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বেশীর ভাগ জমিদারি বানিয়ারা হস্তগত করে। সিরাজুল ইসলাম তাঁর গবেষণা নিবন্ধে দেখিয়েছেন, বানদিয়াদের বেশির ভাগই ছিলেন শহর বাসী হিন্দু ধনী ব্রাম্মন। আর ইংরেজগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইচ্ছে করে হিন্দুদের মধ্যে থেকেই এই নতুন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইলো। এই হিন্দু দেওয়ান সেরেস্তাদের মুন্সী মুৎসুদ্দীদের সাহায্যে ইংরেজরা এক নতুন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করলো।

হান্টার লিখেছেন, "এ পর্যন্ত যেসব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোটখাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করল এবং তাদের ঘরে সেই সব ধনদৌলত জমা হতে লাগল যেগুলো পূর্বে মুসলমানদের আমলদারীতে তাদের ঘরেই জমায়েত হত"। এর পরে হান্টার আবার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "গত ৭৫ বছরের বাংলার মুসলমান পরিবারগুলি হয় উৎখাত হয়ে গেছে না হয় আমাদের শাসনামলে নয়া সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে।"।

---

৪৬. (Dutt 149:112-120)

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হলো নতুন একটি শ্রেণীর জন্ম যাদের আমরা এক কথায় ভদ্রলোক বলতে পারি। ভদ্রলোকদের একদল থাকতেন গ্রামে যাদের মধ্যে ছিল ভূ-স্বামী ও তার আমলা গোষ্ঠী। আর এদর ওপর নির্ভর করে শহরে থাকত চাকুরে ব্যবসায়ী, অনুপস্থিত জমিদার প্রভৃতি।

"Thus if one foot of the bhandrolok was implanted in the permanent settlement land system, the other stepped into the offices, judiciary, schools and professions opened up by new colonial adminstration in Calcutta..."

দুই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের (বিশেষ করে গ্রামে অবস্থানরত জমিদার ও অনুপস্থিত জমিদার) চরিত্রে অমিল যাই থাকুক একটা মিল ছিল "যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খদ্দ না হয় সে বছর বড় দু:খে দিন কাটি উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মসুর, শাকপাতা, শালুক, গগলি ভিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। .. .. "খুঁদ কুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া খাই সেদিন জন্মতিথি।.."

এই যখন রায়তদের অবস্থা তখন ভদ্রলোক মহোদয়, "জলেশ্বর ধোলাই ধুতি পরিয়া মদিরা সহযোগে থানার শেষে কুর্সিতে বসিয়া সালমৌতে মাখা তামক টানিতে টানিতে আফিমের মৌতাতে গুমোট বরষায় ঝিমাইতেন। বা ঢাকাই পাড় ছিঁড়ে পরতেন; মুক্তাভস্মের চুন দিয়ে পান খেতেন, ভেঁপু বাজিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন এবং কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন।

এক কথায়-

"The bhadrolik were first the rent receivers in a predominantly agrarian economy of insecure tenants share cropers and casual labourers. Second, this Hindu elite had become landlords in a predominantly Moslim population. Third the bhadrolik were literate, English speaking and prosperous in a society overwhelmingly illiterate parochial and poor. Through their education, their professins and their cosmopolitan experience the bhadrolok displayed t the mass of society the culture of their colinial overlords."

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হবার আঠারো-উনিশ বছর পরে, ১৮১২ সালের 'সিলেট কমিটি' বিখ্যাত Fifth Report এর লেখকরা-সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বাংলাদেশের জমিদাররা জমির বা সম্পত্তির মালিক নন। 'জমিদার' হলো একটা 'Office' অর্থ্যাৎ রাজকীয় দায়িত্ব - নির্দিষ্ট একটি 'পদ'মাত্র, তার সঙ্গে জমিদারীর মালিকানাস্বত্তের কোন সম্বন্ধ নেই। পঞ্চম রিপোর্টে বলা যায় যে এই বিশেষ রাজপদেও দায়িত্ব হিসেবে জমিদারদের কর্তব্য হলো- "To sperintendent that portion of the country committed to his charge, to do justice to the ryots or peasants to furnish them with the necessary advances for cultivation." এবং কালেক্টর হিসেবে "to collect the rent of Government" এই রাজ কর্তব্য পালনের জন্য জমিদাররা কতকগুলো সুযোগ সুবিধা পেতেন, যেমন বিনা খাজনায় তাঁরা ভোগ করতেন এবং তার সঙ্গে অন্যান্য পাওনাও তাঁদের থাকত, যা তাঁদের সংগৃহীত রাজস্বেও শতকরা দশভাগের বেশি নয়। জমিদারের আয় হিসেবে এটা যে খুব কম তা নয়। এই রাজপদের উৎপত্তি হিন্দু রাজাদের সময় থেকে সন্ধান করা যায়। গোড়াতে এঁরা বলে পরিচিত ছিলেন, পরে মুসলমান রাজত্বকালে 'কোড়ী' নামে পরিচিত হন। এক ক্রোড় বা কোটি 'দাম' প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্বের এক একটি অঞ্চলে এঁদের কালেক্টর নিযুক্ত করা হত বলে এঁদের 'ক্রোড়ী' বলত। মুসলমান আমলের শেষ দিকে 'জমিদার' কথাটি বেশি প্রচলিত হয়- "which literally signifying a possessor of land, gave a colour to that misconstruction of their tenure which assigned to them an hereditary right to the soil." অতএব সিলেক্ট কমিটি তাঁদের fifth report বলেন যে ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারদের এমন অধিকার দিয়েছেন যা তাঁরা কোনকালে ভোগ করেননি। (rights hitherto unknown and unenjoyed in Begnal). এই কথা বলে তাঁরা মন্তব্য করেন যে বাংলাদেশে স্থায়ী জমিদারীত্ব এমন লোকদের দেওয়া হয়েছে যাঁদের কোন রকম দায়িত্ব পালন করবার যোগ্যতা নেই। এই জমিদারদের fifth report এ যে সমস্ত বিশেষনে ভূষিত করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি হলো এই ঃ

Idiots or of weak understanding; poor creatures sunk in sloth and debauchery; extragagant, necessitous, and therefore exacting; ignorant and rapacus; harbourers of dacoits, obstractive zemindars, more plague than profit. ইডিয়ট নির্বোধ উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী অমিতব্যয়ী স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর স্বার্থপর ডাকাতপোষক এগুলি

Dhaka University Institutional Repository

হলো জমিদারদের বিশেষণ। এই জমিদার শ্রেণীর হাতে ইংরেজ শাসকরা বাংলার গ্রাম সমাজের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিত হলেন।

১৭৯৩ সালে চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত করে যখন এই গুরুদায়িত্ব জমিদারদের দেওয়া হলো, তখন বাংলাদেশের অবস্থা কি ? এই বন্দোবস্তের আগেই ইংরেজদের রাজস্ব সংগ্রহের নানারকম কৌশল প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশের বনেদী জমিদার ও দূর্ভিক্ষের ফলে বাংলার গ্রাম প্রায় শ্মশানে পরিনত হয়েছিল বলা চলে। এই ঐতিহাসিক দূর্ভিক্ষের চিত্র জন শোর তাঁর একটি কবিতায় জীবন্তরূপে এঁকেছেন;

"Still fresh in memory's eye the scence I view,
The shrived limbs, sunk eyres, and lifeless hue;
Still hear the mother's shrieks and infant's moans.
Cries of despair and agonising moans,
In wild confusion dead and ding lie;-
hark to the jakal's yell and vulture's cry
The dog's fell howl, admidst the glare of day
They riot unmolested o their prey!
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's efface."

দূর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে দেখা যায় যে বাংলাদেশের কৃষকদের প্রায় তিনভাগের একভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং প্রাচীন জমিদারদের মধ্যে অনেকে দারুন দুরবস্থায় পড়েছেন। হান্টার লিখেছেন যে ১৭৭০ সাল থেকে বাংলাদেশের পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর ধ্বংশের কারণ সন্ধান করা যায়। বাংলার গ্রাম সমাজের এই চরম দুর্দিনে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় এবং তাঁদের এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেয়া হয় যাতে তাঁরা অন্তত নিজেদের সুদিনের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তারা অনেকে তা করতে পারেন নি। চিরদিনের বিলাসিতার অভ্যাস ও স্বভাবশৈথিল্যের জন্য জমিদারদের মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্ট দিনক্ষণের মধ্যে তাঁদের দেয় রাজস্ব সরকারকে দিতে পারেননি। নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা রাজস্ব বাকি ফেলেছেন এবং প্রজাদের দুরবস্থা ও খাজনা অনাদায় তার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আসল কারণ হল, এদেশের জমিদাররা রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারেও সূর্যাস্ত আইনের মতো কোন কঠোর আইনকানুনের বন্ধন মেনে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। ফলে অনেকেরই জমিদারী 'লাটে' উঠে এবং নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। নিলামে এই সব

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারী যাঁরা কেনেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশ হলেন কলকতা শহরের দেওয়ানী- বেনিয়ানী-মুৎসুদ্দিগিরী করে, হাটবাজারের ইজারা নিয়ে, প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন। কর্নওয়ালিশ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের একটি চিঠিতে (৬ মার্চ ১৭৯৩) পরিস্কার লিখিছিলেন- "The large capitals possessed by many of the native, which they will have no means of employing... will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured."[৪৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কর্নওয়ালিসের এই উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। এদেশের যে বনিকদের কথা কর্নওয়ালিস এই চিঠিতে ইঙ্গিত করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই কলকাতা শহরের দেওয়ান বেনিয়া-মুৎসুদ্দি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তিও যাঁর স্বাধীন ব্যবসা বানিজ্যের প্রতি যথেষ্ঠ উৎসাহ ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর সঞ্চিত ধন বানিজ্য থেকে জমিদারী ও ভূ-সম্পত্তিতে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যান্য বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দির কথা বলাই বাহুল্য। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, লাহা ও মল্লিকরা, পাইকপাড়ার রাজা সিংহরা, হাটখোলার ও রামবাগানের দওরা, সকলেই প্রায় সঞ্চিত ধনদৌলত দ্বারা শহরের ও গ্রামের জমিদার হন। অর্থ্যাৎ তাঁরা শহরের সম্পত্তি কেনেন, গ্রামের সম্পত্তি কেনেন। এক কথায় বলা যায়, তাঁরা নাগরিক ও গ্রাম্য ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে অনায়াসলব্ধ উপার্জন ও মুনাফা (unearned income & profit) লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার দিকে সবসময় তাঁদের নজর বেশি থাকত বলে, বেশিরভাগ সময় শহরে তাঁরা থাকতেন। শুধু বিলাসিতার জন্য নয়, নাগরিক সমাজে তাঁদের আভিজাত্য প্রদর্শনের পথ অনেক বেশি উন্মুক্ত ও প্রশস্ত বলেও তাঁরা শহুরে হয়ে গিয়েছিলেন।

হান্টার এই সময়কার হাতে লেখা নথিপত্র সন্ধান করে চারটি খন্ডে সংকলন করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "In these four volumes of Bengal Records, I cite many hundred letters written at that disastrous period, and showing how the disintegration of estates went on in every district of Bengal," চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তের চোদ্দ বছরের মধ্যেই অনেক জমিদারী খন্ড খন্ড হয়ে ভেঙ্গে যেতে থাকে। ভাঙ্গনের সুযোগে যাঁরা এই সব জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হতে দিতেন, তাঁরা হলেন শহরের ধনিক শ্রেণী।

---

৪৭. Second report of the Secleal Committe, 1808-12, aPP IX, 103.

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল মার্কস তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Greater part of the province's langholding fell reapidly tinto the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in land."[৪৮] বাস্তবিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী কেনাবেচার ইতিবৃত্ত যদি সরকারী দলিল দস্তাবেজ থেকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যেত, তাহলে কার্ল মার্কসের কথা কতখানি সত্য তা প্রমাণ করা সম্ভব হত। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কয়েকজনের জীবনবৃত্তান্ত থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছু থাকে না।

জাস্টিজ জর্জ ক্যাম্বেল ১লা জুন, ১৯৬৮ সনে বলেন- "প্রত্যাশা ও বাস্তব ফলাফলের মধ্যে যে কতখানি পার্থক্য ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর, তা এই সমস্ত উক্তি ও আলোচনা থেকে বোঝা যায়।"

জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন চিরতরে বন্ধ ও তাদের ডাল ভাতের সংস্থান করার নীতিকে ভিত্তি করে ১৯১৪ সনে শের-ই-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তিনি প্রথম প্রজা আন্দোলন শুরু করেন তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তাঁর নির্দেশে খান বাহাদুর হাশেম আলী খান (১৮৮৮ ১৯৬২) কোলকাতার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সাথে সাথে প্রজা আন্দোলনের শুরু করেন। হাশেম আলী খান, পটুয়াখালীর সর্বত্যাগী বানী কণ্ঠ সেন, গৌরনদীর দুর্জয় সাহসী মাজেদ কাজী, উকিল মফিজ উদ্দিন, আগৈলঝরার আপনভোলা, ভেগাই হালদার, কলসকাঠির মুন্সি ইয়াসিন হাওলাদার প্রমুখ ফজলুল হকের নেতৃত্বে বরিশালে শক্তিশালী রায়ত প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন।

২.৩ পূর্ব বাংলায় সাংবিধানিক রাজনীতির প্রক্রিয়া

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনী বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করে বাংলা তথা সমগ্র ভারত বর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুত্রপাত ঘটান। আর তখন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশ শাসন এবং শোষন করে আসছিল। বলা বাহুল্য এই কোম্পানীর শাসন চলা কালেই ১৭৭৬ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়ন ও কার্যকর হবার মধ্য দিয়ে এদেশে কৃষক নিপীড়ণের অন্যতম প্রথা জমিদারী ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। জমিদারদের নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

---

৪৮ Karl Mark, Notes on Indian History, Moscow, P. 101

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক প্রজা পার্টি থেকে রুপান্তরিত কৃষক শ্রমিক পার্টি পরিবর্তিত কালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে ভূমিকা পালন করে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। অভিসন্দর্ভের অনুকল্প (Hypothesis) রাজনৈতিক দল (কৃষক প্রজা পার্টি) এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব (শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক) সামাজিক জাগরণ ও সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংসদীয় রাজনীতি সংহতকরণের জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ শাসন শুরু হবার পরে বহুকাল অবধি এদেশের সমাজ জীবন ছিল শোষণ আর বঞ্চনায় জর্জরিত। কৃষি ভিত্তিক এই সমাজে কৃষকদের উপর পরিচালিত এই শোষণ ও বঞ্চনার বিপক্ষে আন্দোলন তথা সামজিক জাগরণের পেক্ষাপট পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে সাংবিধানিক রাজনীতির সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকার তাদের সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এই পথ ধরেই ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে নেয়ার সাথে সাথে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান শুরুর চিহ্নিতকরণ হিসেবে কাজ করে। ভারতীয়দেরকে তাদের দেশের প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে এযাবৎ আর কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু লর্ড লাডস্টোন এটিকে প্রত্যাখান করেন। ১৮৬১ সালেই কেবল প্রথম এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের মত ব্রিটিশ রাজ্যের অনুগত মুসলমানগণ এই অভিমত পোষণ করতেন যে সাম্প্রতিক দূর্যোগ সংগঠিত হত না যদি আইন সভায় বা Legislative Coucil স্থানীয়দের natives বলে আখ্যায়িত করতো। তিনি বলেন,ÒIt is highly conducive to the welfare and properity of Government indeed it is essentil to its stabiity that the people alone can check the error in the bud, and warn us of dangers before they burst upon and destroy us. The man who have ruled India should never forgotten that they were here in the position of foreigners that they differed from its natives in religion, in customs, in habits of life and thought. The security of a Government it will be remembered, is founded on its knowledge of the charachter of the governed, as well as on its

Dhaka University Institutional Repository

careful observance of thier rights and privileges. The evils which resulted to India from exclusion of natives from Legislative Council of India were vaaious. Government could never know the unsuitability of any of the law and regulation which it passed. It could never hear, as it ought to have heard, the voice of the peope n such a subject. The people had no means of protesting against what they might feel to be a foolish measure of giving public expressions to their own wishes. But the greatest mischief lay in this that the people misundersstood the views and intentions of Gvernment."

২.৩.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত রাজনীতির প্রধান প্রধান দিক ঃ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী প্রথমবারের মতন সমগ্র উপমহাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের অধীস্থ শাসনের আওতায় নিয়ে আসে। এর পাশাপাশি এই শাসনাধীনে থাকার ধারাবাহিকতা ভিতর থেকে অথবা বাইরে থেকে বিঘ্নিত হবার আশংকামুক্ত থাকে। যদিও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ শাসনের আওতামুক্ত ছিল। এসব অঞ্চল দেশীয় রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। আমাদের অভিসন্দর্ভের বিবেচনা হলো বাংলাদেশ। আর এ অঞ্চলটি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসনের অন্ত র্ভূক্ত হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের যে যুদ্ধে বিজয়ী হবার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা তৎকালীন দক্ষিণ এশিয়ায় একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি ছিল বাংলা অঞ্চলের 'পলাশী'। এই স্থানটি বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও যে দল থেকে রুপান্তরিত হয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের অনুসন্ধানের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত রাজনৈতিক দলটি তার আলোচিত অবয়ব ধারন করতে সক্ষম হয় সেই কৃষক প্রজা পার্টি তার কার্যক্রম শুরু করেছিল অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসকস্থল থেকে। এই অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত পলাশী নামক স্থানের আম্রকাননে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বাহিনীকে মীর জাফর গংদের সহযোগিতায় পরাস্ত করতে পেরেছিল।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এদেশে সাংবিধানিক রাজনীতির পথ অনুসরণ করেই কৃষক প্রজা পার্টি ব্রিটিশ শাসনের শেষ দুই দশকে আবুল কাসেম ফজলুল হকের নের্তৃত্বে অবিভক্ত বাংলার নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

জনসমর্থনের প্রয়োজনীয়তা শূন্য নবাবের শাসন থেকে জনসমর্থনহীন ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে অধিকার বঞ্চিত কৃষককূল যখন কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ফলে সৃষ্ট জমিদারদের দ্বারা "বোঝার উপর শাকের আঁটির" মত আরও করুণ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন কৃষক প্রজা পার্টি এবং এর নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক তাদের জাগরণের বার্তা শুনিয়ে উজ্জীবিত করেছিলেন। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ও সমাজকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল যে রাজনৈতিক দল তা ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ছিল না। আবার রাজনৈতিক দলের (কৃষক প্রজা পার্টি) পাশা পাশি যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেই নেতৃত্ব অর্থ্যাৎ আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন যদিও কৃষক পরিবারের সন্তান তবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা রুপান্তরিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনতা তার মধ্যে কাজ করেছে। আর এই সচেতনতার ফলেই তিনি কৃষক প্রজাদের মুক্তির জন্য কাজ করতে তথা নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ক. আইনশৃঙ্খলা ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে কল্যাণকর যে প্রভাব দেশের উপর পড়েছিল সেটি হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যবস্থা। ভারতে মুসলিম বিজয় কিংবা তারও পূর্ব থেকে মাৎস্য ন্যায়ের পরিস্থিতি হতে শুরু করে অনেক ধরনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল উপমহাদেশের শান্তি ব্যাহত করছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা এ ধরনের গোলমেলে অবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন একটি নিরাপদ এবং স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এটি তারা পেরেছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

খ.প্রশাসন এবং ন্যায় বিচারের নতুন ধারণা ঃ শুধু একক কর্তৃপক্ষের অধীনেই নয় ব্রিটিশ শাসন উপমহাদেশে একটি একীভূত প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু করতে সক্ষম হয়েছিল। মুঘল শাসনামলের জেলার আকৃতিতে প্রনীত কেন্দ্র থেকে নীচুস্তর পদসোপান ভিত্তিক প্রশাসনের কাঠামো সৃষ্টি হয়েছিল। এই আকৃতিটি আপেক্ষিকভাবে একীভূত করে তৈরী করেছিল। আর এর ফলে আইন ও প্রশাসনের নতুন নীতিমালার ভিত্তিতে কর্তৃত্বের একটি দক্ষ কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। যদিও মুঘলদের দ্বারা সূচিত কার্যাবলীর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতের জেলা প্রশাসন, তবে জেলা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের নীতিমালা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এটি ছিল পুরোপুরি বেসামরিক সম্পর্ক ভিত্তিক।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ শুধু জেলার অফিসারই ছিলেন না, তারা বিচার কার্য পরিচালনার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর দায়িত্বও পালন করতেন। সময়ের বিবর্তণে এ্যাংলো স্যাক্সন নীতিমালা এবং জুরীসপ্রুডেন্সের এবং ব্রিটিশ সাধারণ আইন ও পূর্ব নজীরের সূত্র ধরে আদালতের নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আরও পরে ব্রিটিশ শাসকেরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধান করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে অনেক উন্নতি মূলত শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের উপর ভিত্তি করে। যার ফলে বেসামরিক প্রশাসনের প্রকৃতি আরও পরিবর্তন হয়ে যায়, এবং মানুষ ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ধরনও পাল্টে যায়, প্রচলিত ধারনার প্রতি যা একটি বড় অভিঘাত সৃষ্টি করে।

গ. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঃ ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে টমাস ব্যাবিংটোন মেকলের পথ নির্দেশনা মূলক মন্তব্যের সূত্র ধরে ব্রিটিশ রাজ একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করার কথা বলা হয়। এ সময় অনেক আত্ম-নির্মিত মানুষ এবং যারা বস্তুত পাশ্চাত্যের চমৎকারিত্বে অভিভূত ছিল তারা যথারীতি ইংরেজী ধ্রুপদী সাহিত্য, আইনগত ও বৈজ্ঞানিক কার্যাদি এবং সাংবিধানিক চুক্তিসমূহ অধ্যয়ন করছিলেন। ইংরেজীর সূচনা এটিকে অধিকতর বৃহত্তর পরিধিতে সম্ভব করে তুলেছিল। ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক আরোপিত আকারে হয়নি। কারণ কোম্পানী মূলত স্বদেশী ভাষাসমূহের প্রতি অধিকতর আগ্রহী ছিল। ইংরেজী ভাষা প্রবর্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ভারতীয় নেতাদের বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে আর এই নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজা রাম মোহন রায়। বংশানুক্রমিকভাবে সম্পূর্ণরুপে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে যারা উদারনৈতিক ধারনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, পশ্চিমা বিশ্বকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখত, আর বিদেশী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে করণিকের কাজ করতে আগ্রহী ছিল। অনেকে আইন অধ্যয়ন করেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত হন। কেউ কেউ আবার শিক্ষকের পেশা শুরু করেন। আবার কেউ কেউ ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্বল্প সংখ্যক আবার বিদেশে বিশেষত ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেন। অনেকে আবার ঔষধ ও হিসাব রক্ষণ পেশার ন্যায় সমাজ সংস্কার, সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হন। এর পাশাপাশি কেউবা আবার রাজনীতির পেশা শুরু করেন।[৪৯]

---

৪৯. এই শ্রেণীর বিভিন্ন খন্ডের উৎপত্তির ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য দেখুন – B.B. Misra (1961), The Indian Middle Classes ; Their Growth in Modern Times, London ;

Dhaka University Institutional Repository

এটা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী। এই শ্রেণীর মাধ্যমে ব্রিটিশ উপমহাদেশে তাদের শাসন অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। আর এই শ্রেণীর মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সাংবিধানিক সরকারের ধারনা বেগমান হয়েছিল। নতুন পেশাগুলোতে এই শ্রেণীর মানুষই কাজ করে। এবং এই শ্রেণীর মধ্য থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে। বলা বাহুল্য কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হক এই শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা সৃষ্ট নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। আর এভাবে বস্তুতপক্ষে তারা ব্রিটিশ রাজ্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই শ্রেণী কালক্রমে ব্রিটিশের কাছ থেকে ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করে এবং নিজেদেরকে একটি আধুনিক জাতি এবং একটি 'সার্বভৌম ' গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে।

ঘ. সামাজিক সংস্কার ঃ একটি ক্ষুদ্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক সুচিত আধুনিকায়নের ফলে এদেশে সবচেয়ে কঠিন একটি সমস্যার সৃষ্টি হয় আর তা' হলো, সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যবধান। তবে নতুন শ্রেণীর উৎপত্তির ফলে এদেশে পরিবর্তনের একটি পেক্ষাপটও সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আবহ আস্তে আস্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত হয়।

তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সংহত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকগণ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার জন্য একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেন, যেটি চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির মালিকানা কৃষকদের হাত থেকে জমিদার নামে পরিচিত রাজস্ব সংগ্রাহকদের নিকট স্থানান্তরিত হয়। জমিদারগণ এই মালিকানা স্বত্ব ততদিনই ভোগ করতে পারতেন যতদিন পর্যন্ত সরকারকে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রতি বছর প্রদান করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনগত বৈশিষ্টের বিপরীতে, এর দ্বারা যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত হলো তার সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক পুনঃগঠনের বিষয়টি ছিল অধিকতর লক্ষ্যণীয়। কৃষক প্রজা পার্টি তার থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির বিকাশ এবং এর নেতৃত্বে ফজলুল হকের আসীন হওয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে কোম্পানী শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতির লুণ্ঠন এবং ধ্বংশসাধন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা প্রয়োজন। উৎপাদন সম্পর্কের ওপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে এই অধ্যয়ের প্রাথমিক বিবেচনা হচ্ছে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে কৃষক প্রজা পার্টি ঃ ১৯২৯ সাল নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়ারই ফসল। কোনো নির্দিষ্ট একক রাজনৈতিক মতবাদের অনুসারীদের দ্বারা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয় নাই, বরঞ্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি (All Bengal Tenants Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আব্দুর রহমান এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্যতীত আরও পাঁচজন সহ সভাপতি ছিলেন। এ, কে, ফজলুল হক ছিলেন পাঁচ জনের মধ্যে প্রথম সহ সভাপতি। ১৯৩০ এর দশকের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার প্রায় সব জেলায় প্রজা সমিতির শাখা গঠিত হতে দেখা যায়। প্রজা সমিতি কেন্দ্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় অনুমান করে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার অংশকে সঙ্গে করে নিখিল বঙ্গ সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করলেন। তবে ফজলুল হক কর্তৃক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে সমিতির সভাপতির পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১৯৩৪ সালে ভারতের আইন সভার সভাপতি নির্বাচিত হলে স্যার আব্দুর রহমান নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। সমিতির সদস্যরা পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা এ বৃহৎ আঞ্চলিক ভাগে বিভক্তি হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে এ, কে, ফজলুল হক সভাপতির পদের প্রত্যাশী ছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা দলের পক্ষ থেকে খান বাহাদুর এ, মমিন এ পদের জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ পরিস্থিতিতে বিতর্ক মীমাংসার জন্য উভয় দল বিদায়ী সভাপতি স্যার আব্দুর রহমানের মধ্যস্থতা মেনে নিতে সম্মত হয়।

১৯৩৪ সালে স্যার আব্দুর রহিম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রজা সমিতির সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং খান বাহাদুর মোমেনকে সভাপতি মনোনীত করে যান। প্রগতিশীল দল কৃষক-প্রজাদের নেতা এ, কে, ফজলুল হককে সভাপতি করতে চায়। এ, কে, ফজলুল হকের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ। ১৯৩৪ সালে ঢাকায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বিরোধী দল নির্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ কলে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রজা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করা হয় কবি নজরুল ইসলামের রচিত সঙ্গীত এবং আব্বাসউদ্দিন আহমদের কণ্ঠের গান দিয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ, কে, ফজলুল হক। ডাঃ আর, আহমদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, আশরাফ আলী চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখের সমর্থনে এ, কে, ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি এবং কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ সমিতির

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক-প্রজা। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের অধিকাংশ আসনে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে কৃষক সমাজ বাস্তবত বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এ, কে, ফজলুল হক জমিদার ও সরকারি নিপীড়নের হাত থেকে প্রজাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রাজনৈতিক স্লোগান ছিল "লাঙল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার"। তিনি কৃষক সমাজের ডাল-ভাতের রাজনীতি করতেন। বাংলার অবহেলিত শোষিত কৃষক-প্রজাকূল ফজলুল হকের ডাল-ভাতের রাজনীতিতে বিপুলভাবে সাড়া দেয় এবং শক্তিশালী সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করে। ফজলুল হক ভারতের ইতিহাসে কৃষক সমাজকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে সমর্থ হন।

কৃষক প্রজা পার্টি থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট

১৯৫৩ ১৯৫৮ সালে যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং যার মূল ক্রিড়ানক ছিল "কৃষক শ্রমিক পার্টি" এবং এই দলের নেতা ফজলুল হক তার উৎস মূল ব্রিটিশ অনুসৃত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের মধ্যে যতদুর পাওয়া যাবে তা' তার পূর্বের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের পশ্চাৎপদ আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার এই পর্যায়ে কোন প্রেক্ষাপটে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এই পর্যায়ে তাই প্রয়োজন। তবে ১৯০৬ সালে নবাব ভিকার উল মূলক ও নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেই উদ্যোগে যুবক আবুল কাশেম ফজলুল হকও সামিল হয়েছিলেন।[৫৩] মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল "ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রগতির জন্য একটি রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করা এবং "সরকারের নিকট তাদের প্রয়োজন এবং আকাঙ্খা শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরা"। উল্লেখ্য যে ওই একই বছর হিন্দু মহাসভা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এভাবে দেখা যায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ১৯০৬ সালে একটি নির্দিষ্ট আকার লাভ করে। তবে অতি দ্রুত মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আলীগড় মতবাদেও ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণীর হাতে চলে যায়, এবং ১৯১০ সালে এই দলের প্রধান কার্যালয় লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তর করা হয়। ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণীর এলিটগণ অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের নিঃশর্ত আনুগত্যের

Dhaka University Institutional Repository

ছাপ মেরে দেয়। এসময়ে মুসলীম লীগের স্থায়ী সভাপতি আগা খান দলের বাংলা শাখাকে লিখেন, "ভারতের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে লীগ অপরিহার্য্য মনে করে এবং ব্রিটিশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও জনসাধারণের মনে ব্রিটিশদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম জাগ্রত করার জন্য মুসলমানদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করা উচিত।" এই নিঃশর্ত আনুগত্যও বিনিময় এ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পৃথক নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যারা বঙ্গ ভঙ্গ স্থায়ী হবার আশা করেছিলেন তারাও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যখন "মিমাংসিত" ঘটনাকে "অমিমাংসিত" পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে তখন বাঙ্গালী মুসলমানেরা সাংঘাতিকভাবে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের মধ্যে তাদের কোন সহমর্মিতা নাই এই ভেবে তারা দুঃখিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যে অঙ্গীকারবদ্ধ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গ রদ করা সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতিকে তাড়াহুড়া করে নিন্দা জানাতে অস্বীকার করে।[৫০]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমান যুবকগণ এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মুসলমানগণ তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এমন ধারণা দ্বারা তাড়িত হন। তবে বয়স্ক মুসলমানগণ, বিশেষত মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়, বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে যুবকেরা বিক্ষোভ দেখিয়ে পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না করতে পারে সে ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। পুনঃগঠিত বাংলায় যে মুসলমানেরা সংখ্যাঘরিষ্ঠ হয়ে ছিল তাতেই তারা খুব পরিতৃপ্ত ছিলেন। আর বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে বাঙ্গালী মুসলমান যুবকদের বিরত থাকতে সফল হবার কারণে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং অন্যান্যরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অধিকতর উত্তম হিন্দুদের চেয়ে ন্যুনতম যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানদের যাতে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। আর এভাবে বাংলার প্রশাসনিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সফলতার সাথে সাম্প্রদায়িক বিষ অনুপ্রবেশ করানো হয়ছিল। এই ছাড় দ্বারা প্রধানত উচ্চ মধ্য বিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী মুসলিমরা লাভবান হয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে বাংলার অধঃপতিত দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকদের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা রাজনীতিবিদদের কাজ নয়।

---

৫০. Shila Sen, Muslim Politics in Bengal, 1939-1947, Delhi, Impex Indian, n.d) P- 35

Dhaka University Institutional Repository

এইসব ছাড়া বাংলার শিক্ষিত যুবক মুসলমানদের তেমন সন্তুষ্ট করতে পারে নাই যারা কোলকাতাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। ফজলুল হক এসময় সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেছিলেন। তবে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ তাঁকে রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য তাগিদ দেন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দেয়ার পর তিনি বয়স্ক নেতাদের প্রতি তাঁর অসন্তোষ গোপন করার কোন চেষ্টা করেন নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ হচ্ছে বাঙ্গালী মুসলমান এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আলাদা হবার লক্ষণ এই মর্মে বাংলা আইন সভায় তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা মুসলিম লীগের আলীগড় মতানুযায়ী 'নোবল' ভূমি নির্ভর অভিজাত সম্প্রদায় এবং কেতাবী ভদ্রলোকদের" কে বিক্ষুব্ধ করেছে। উত্তর ভারতের মুসলমানদের ন্যায় বাংলার আলোকিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফজলুল হক ছিলেন এই সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বার্থগত পার্থক্যের ওপর জোড় দিয়ে একটি গুরুত্ব ভূমিকা পালন করেন।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময়ে সংঘটিত তুর্কী-গ্রীক যুদ্ধ ও বলকান যুদ্ধ ভারতীয় মুসলমানদের কঠিন আঘাত দেয়। তখনকার একজন জাতীয়তাবাদী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলীম লীগে যোগদানের ক্ষেত্রে জিন্নাহর স্পষ্ট বলেন যে, "মুসলিম লীগ ও মুসলীম লীগ স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কোন ক্রমে এবং কোন সময়ে বৃহত্বর জাতীয় স্বার্থের প্রতি অনানুগত্য হিসেবে দেখা দেবে না।" এই দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পন্ন ঘটনাটির একটি সুদুর প্রসারী গুরুত্ব ছিল। এটা উল্লেখ করা যায় যে, একই বছর মুসলীম লীগ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেখানে "ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভাতের জন্য উপযুক্ত স্ব-শাসিত সরকারের ব্যবস্থা অর্জনের" আদর্শ গ্রহণ করা হয়। এটি আগা খানের জন্য অতিরিক্ত কিছু ছিল, যিনি মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতির পদ থেকে সরে এসে লীগের প্রতি তাঁর সমগ্র অনুদান বন্ধ করে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং এভাবে ভারতে প্যান-ইসলামী মনোভাবের প্রতি আঘাত হানে। বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে "খিলাফত" এর কারণকে লুফে নেন। ফজলুল হকসহ এই সমস্ত নতুন নেতাগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্কের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন।

১৯১৬ সালে যুবক ফজলুল হক ছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। ফজলুল হক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবাধীন। দেশবন্ধু, অন্যান্য কংগ্রেস

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের সাথে অসদৃশভাবে হিন্দু মুসলিম সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে দেখতেন। জিন্নাহ এবং ফজলুল হকের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই জায়গায় এবং একই সময়ে মিলিত হয়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয় যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রদেশগুলোতে সংখ্যালুঘু সম্প্রদায়সমূহকে সমানুপাতিক গুরুত্ব দেয়া হবে। সে অনুযায়ী উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের বেশী প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়। বাংলায় জনসংখ্যার ৫২.৬ ভাগ ছিল মুসলমান সেখানে আইন সভায় তারা আসন পাবার কারণ শতকরা ৪০ ভাগ। কিন্তু পাঞ্জাবের জনসংখ্যার ৫৪.৮ ভাগ মুসলমান, তারা পেত মোট আসনের শতকরা ৫০ ভাগ। বাঙ্গালী মুসলমান ও পাঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে এইরুপ বৈষম্য বাংলায় গভীর অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ্ণৌ চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর আহবানে গ্রাম গঞ্জে প্রজা সমাবেশ হয়। তাঁর নির্দেশে ১৯১৪ সনে কোশ মুহম্মদ চৌধুরী জামালপুর জেলার কুমারচরে এক কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ, কে, ফজলুল হক। তিনি অভিভাষণে কৃষক প্রজাদের দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। জামালপুরে চাকরি জীবনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একদিন প্রজাদের জমিদারদের নিপীড়ন ও মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করবেন। এবং তিনি সেই জামালপুর থেকেই প্রজা আন্দোলনের ডাক দিলেন।

১৯১৯ সালের সংস্কার আইন চালু করার পর ফজলুল হক বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি সংগঠিত করেন। তিনি এবং বাংলার অন্যান্য মুসলমান নেতৃত্ববৃন্দ প্যান ইসলামী শ্লোগান বা সংখ্যালঘুর মনোস্তাত্বিক জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন না। তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম মুসলমানদের স্বার্থ দ্বন্দ সম্পর্কিত মনোভাব থেকেও মুক্ত ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন যা' শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফজলুল হক সহ এই দলের নেতারা প্রধানত নব্য উত্থিত মধ্য বিত্ত শ্রেণীর ছিলেন। বস্তুতঃ অনেক হিন্দু জোতদার শ্রেণীর লোকও এই শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। এইসব নেতারা কৃষক প্রজা পার্টিকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন । মূলত কৃষকদের সমস্যাগুলোকে গুরুতের সাথে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়েই তারা দলটিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন । একারণে তাঁরা চরম ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলেন। এর মধ্যে ছিল জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপ, বিশাল আয়তনের

Dhaka University Institutional Repository

জমির মালিকানায় বিধি নিষেধ আরোপ করা এবং অতিরিক্ত সুদযুক্ত ঋণ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা। তাঁরা ভেবেছিলেন যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের "দ্বৈত শাসন" এবং "হস্তান্তরিত ব্যবস্থা" এই ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুযোগ করে দেবে। কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলে শোষিত মানুষের বেশীরভাগ ছিল মুসলমান এবং সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল হিন্দু সেহেতু মৌলিক আর্থসামাজিক সমস্যাগুলোকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে এর যথাযথ প্রেক্ষাপটে দেখেছেন এবং মূল থেকে একে উৎখাতের চেষ্টা করেছেন। তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অনেক ক্ষোভ এবং সন্দেহ আছে সুতরাং তাদেরকে জাতীয় ফ্রন্টে রাখতে তাদের ক্ষোভের কারণ দূর করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বেঙ্গল কাউন্সিলে মুসলমানেরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে আর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্দিষ্ট এলাকার সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতির আলোকে ৬০ঃ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করবে। সরকারী নিয়োগের শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নীতিমালার আলোকে দেশবন্ধুর অভিভাবকত্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিখ্যাত বেঙ্গল প্যাক্ট প্রনীত হয়। কিন্তু ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের কাকিনাড়া অধিবেশনে মুসলমানদের প্রতি বেঙ্গল প্যাক্ট অতিরিক্ত উদার মনোভাব দেখিয়েছে এই অজুহাতে তা' বাতিল করে দেয়। এর ফলে মুসলমানেরা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে হিন্দুদের দ্বারা শাসিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কে যত্নশীল নয়।[৫১]

সর্বভারতীয় পর্যায়ে এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার পর দেশবন্ধু প্রাদেশিক স্তরে এটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে বেঙ্গল প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট উপস্থাপন করলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে দেশবন্ধু মৃত্যুর পর তাঁর স্বরাজ পার্টি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আর বেঙ্গল প্যাক্ট পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর কেউ থাকল না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান সমস্যাটি সাম্প্রদায়িক নয় এবং সঠিক অর্থে রাজনৈতিকও নয়। মুসলমানদের ভীতির কারণ হচ্ছে হিন্দুদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য।

---

৫১. "The Muslim Peasantry of Bengal become totally disillusioned with the congress and at the same time they were aware of the ineffectiveness of the Muslim League to prolect their interest Shaukat Ara Hussain, Politics and Society in Bengal. (1921-1936 : A Legislative Perspective (Dhaka : Bangla Academy, 1991), P. 36 "

Dhaka University Institutional Repository

বেঙ্গল প্যাক্ট এই ভীতি দূর করতে চেয়েছিল আর বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অংশের হিন্দুরা এর প্রশংসা করেছিলেন। কাকিনাড়া কংগ্রেসে এর প্রত্যাখান এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলায় এর সমাধি হয়ে যায়। ফলে বাংলার রাজনীতিতে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মুসলমানদের বৃহৎ অংশের মনে কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন এই ছাপ পড়েছিল।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি চুক্তিতে উপনীত হবার বিপক্ষে ছিলেন মুসলিম লীগের একজন পাঞ্জাবী নেতা স্যার মোহাম্মদ শফী। ফলে মুসলিম লীগে যে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলিম মিলনের পথ থেকে জিন্নাহ বিচ্যুত হন নাই। ইতোমধ্যে ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনে দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র নির্ধারণের জন্য মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে যা' মতিলাল নেহেরু কমিটি নামে পরিচিত। এর প্রতিবেদনে মতিলাল নেহেরু কমিটি পৃথক নির্বাচকমন্ডলী ব্যবস্থা, কড়াকড়িভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বাতিল করে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক চতুর্থাংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখে। উল্লেখ্য লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছিল। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারা থেকে মুসলমানদের সরে আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এবং চূড়ান্ত পর্বে জিন্নাহ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ত্যাগ করেন। বিশের দশকের প্রারম্ভেই কংগ্রেস একটি গণ সংগঠনে পরিণত হয়েছিল যা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেসের এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ত্রিশের দশকে বিশাল গণ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং গোল টেবিল বৈঠক (১৯৩১) ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সুতরাং ১৯৫৩ সালের সংস্কার অনুসারে ১৯৩৭ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন কংগ্রেস তার শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস নিরংকুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে কংগ্রেস খুব কম মুসলিম ভোট লাভে সক্ষম হয়। এছাড়া বস্তুনিষ্ঠভাবে জাতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে এই দল তেমন আগ্রহ পোষণ করে নাই।

ত্রিশের দশকে কংগ্রেস যখন শক্তি সঞ্চয় করেছিল তখন পাকিস্তানের ধারনা ক্রমান্বয়ে আকৃতি প্রাপ্ত হচ্ছিল। তবে ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ সম্মেলনে মুহাম্মদ ইকবাল যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে উত্তর পশ্চিম ভারতরে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। বাংলা বা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পরিনত করার কথা বলা হয় নাই। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় আন্দোলন বা কেমব্রীজ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি তাঁর ভাষায়, দুই জাতির দুই

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য মুসলমানদের টিকে থাকা আর হিন্দুদের প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সম্বন্ধে তিনি তিক্ত বক্তব্য দিতে থাকেন। এমনকি তাঁর ধারণায় পাকিস্তানের মধ্যে পাঞ্জাব, আফগানিস্থান (অর্থ্যাৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান ছিল। ১৯৩৭ সালে বাংলার নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির বিজয়ের পর রহমত আলী দুটি অতিরিক্ত মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলতে থাকেন। এর একটি হলো বঙ্গ-ই-ইসলাম (বেঙ্গল ও আসাম) এবং উসমানিস্তান (হায়দ্রাবাদ)। কিন্তু তাঁর ধারণা অনুযায়ী এই দুটির কোনটিই পাকিস্তানের অংশ হবে না। নিস্পাপ মুসলিম রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিকগণ শুরু থেকেই ভৌগলিক এবং রাজনৈতিকভাবে এর অবাস্তবতা সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন যে রাষ্ট্র পাকিস্তান নামে ১৯৪৭ সালে আবির্ভূত হয়।

সর্বভারতীয় পর্যায়ের এই সব অগ্রগতি বাঙ্গালী মুসলমানেরা কম বেশী দার্শনিক আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিল। সে সময় বাংলায় মুসলিম লীগ একটি দূর্বল দল ছিল। বাঙ্গালী মুসলমাদের ব্যাপক সমর্থনপুষ্ট একমাত্র রাজনৈতিক দল তখন ছিল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই দল শক্তি সঞ্চয় করছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এই দলটি বাংলা আইন সভায় ১১৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে এই দল লাভ করে ৭৭টি আসন, আর মাত্র ৪০টি আসন পেয়েছিল মুসলিম লীগ। একইভাবে আর একটি নেতৃস্থানীয় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দল পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। পাঞ্জাবে ফজলি হুসাইন এবং সিকান্দার হায়াত খানের নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট পার্টি জয়লাভ করে। ওই বছরের (১৯৩৭) নির্বাচনে পাঞ্জাবে মাত্র একটি আসন জয় লাভ করতে পেরেছিলো মুসলিম লীগ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সর্বভারতীয় পর্যায়ে মোট ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৮টি আসনে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করেছিলেন। এর মধ্যে ২৬ আসন লাভ করেছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এই বিজয়ের ক্রীড়ানক ছিল আব্দুল গাফফার খানের সাংগঠনিক যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা। এই ফলাফলের পরে সারা ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করা সম্পর্কে কংগ্রেসের দাবী গুরুত্ব লাভ করতে পারে নাই।

পাশাপাশি এই নির্বাচনের কঠিন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মুসলিম লীগকে সচেতন করে তুলেছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদেশ বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরুপে পরাস্ত হয় অপর দিকে মুসলমানেরা যে প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই উত্তর প্রদেশে কিছু সফলতা প্রমান করতে পেরেছিল সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ মুসলিম ভোটের খুব কম অংশ লাভ করতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে পেরেছিল যে একে কংগ্রেসের সাথে চলতে হবে। আর এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে উত্তর প্রদেশে, যেখানে মুসলিম লীগ কয়েকটি আসন লাভ করেছিল, সরকার গঠনে কংগ্রেসের অংশীদার হতে চায়। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি হয় নাই। তবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামের ক্ষেত্রে কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কংগ্রেসের এই ধরনের সিদ্ধান্তে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের নেতারা বিক্ষুব্ধ হয়। ফলে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান ঘুচানোর সম্ভাবনা দুরীভূত হয়ে পড়ে আর পাকিস্তানের দাবী একটি ঐকান্তিক পর্যায়ে উপনীত হয়। ইউনিয়নিষ্ট পার্টি এবং কৃষক প্রজা পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন না করতে পারার কারণে মুসলিম লীগের দাবীর সমর্থণ অটুট রাখতে সহায়ক হয়।

বাংলায় ফজলুল হক কখনও দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জানতেন যে বাংলার সমস্যা মৌলিক ভাবে অর্থনৈতিক এবং তার জন্য একটি চরম সমাধান প্রয়োজন। তিনি কংগ্রেসকে প্রগতিশীল আর সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করে তিনি নির্বাচনে জয়ী হবার পর কংগ্রেসের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলায় কংগ্রেস ও কেপিপি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে এখানে হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধান করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত। কিন্তু সর্বভারতীয় পর্যায়ের কংগ্রেস নের্তৃত্ব অন্য কোন ধারণা পোষণ করতেন আর তাই এই দলটি তার বাংলা শাখাকে ফজলুল হকের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে অনুমতি দেয় নাই। আর এভাবে বেঙ্গল প্যাক্টের ন্যায় বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আর একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হারিয়ে যায়।

একজন পুরোদস্তর রাজনীতিক ফজলুল হকের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বিরোধী শিবিরে থাকা সম্ভব ছিল না। যে কোন কারণেই হোক না কেন কে.পি.পি-র সাথে কোয়ালিশন গঠনে অস্বীকৃতি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে গভীর সন্দেহের জন্ম দেয়। এই সাথে মুসলিম লীগের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরপরই ফজলুল হক মুসলিম লীগের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৩৮ সালে বাংলায় কেপিপি লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। আদর্শগত দিক থেকে এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক সরকার, একটি ছিল প্রগতি এবং ভুমি ভিত্তিক অভিজাত বিলোপ করার পক্ষে অপরটি কায়েমী স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করত। বিস্ময়করভাবে হিন্দু মহাসভা (সাধারণ হিন্দু ভূমিভিত্তিক আভিজাত্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি) এই কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

যখন ফজলুল হককে জনপ্রিয় সমর্থনের জন্য মুসলিম লীগের ওপর নির্ভর করতে হলো তখনই কোন কালক্ষেপন না করে হক এবং তাঁর অনুসারীদেরকে মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে নিতে ভূল করলেন না। বাংলায় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে কংগ্রেস কর্তৃক আশাহত হবার পর তিনি বিশ্বাস করতে থাকেন যে, "হিন্দু কংগ্রেস" কখনো মুসলিম বাংলার সাথে হাত মেলাবে না। কৃষক প্রজা পার্টির বুদ্ধিজীবীদের মতে বাংলার ঘোষিত মুসলিম গ্রামবাসীদের প্রতি কৃষক প্রজা পার্টির সমর্থনের বিপরীতে হিন্দু ধর্মীয় ভূমির মালিক অভিজাত শ্রেণীর প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনের কারণেই মূলত কংগ্রেস কে.পি.পি.র সাথে কোয়ালিশন গড়তে রাজি হয়নি। বাংলার মুসলিম জনসাধারণের জনমতের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া ফজলুল হকের আর কোন উপায় ছিল না। কংগ্রেস অথবা অন্য কোন দল মূলত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য কোন দৃঢ় প্রয়াস গ্রহণ করে নাই। আর এভাবেই বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে বেড়ে ওঠার পথ করে দেওয়া হয়।

বিচিত্র স্বার্থসমূহের প্রতিনিধিত্বের সরকার পরিচালনার প্রয়োজনে এ সময় ফজলুল হক কে বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এবং কৃষক লীগের কৃষক প্রজা পার্টির এই দুই দলের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এই দুই দলের একটি সদস্য অপরটি সদস্য হতে পারত। বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসময় লক্ষ করে যে কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবার পরেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হিন্দু স্বার্থ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়ে আছে। তখন তারা চিন্তা করতে থাকল হিন্দু প্রাধান্যের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে বাংলাকে মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করতে হবে। সুতরাং তারা মুসলিম লীগকে সমর্থন করার জন্য মনস্থির করল। চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে দরিদ্র মুসলমানদের তারা এই সংগঠনে যোগ দেয়ার জন্য প্রলুব্ধ করল। আর এভাবে বাংলায় মুসলিম লীগ একটি নির্ধারণী শক্তিতে পরিণত হল।

কৌশলগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জিন্নাহ এসময় ফজলুল হককে মুসলিম লীগের একটি অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। এই কমিটির কাজ ছিল কংগ্রেস প্রশাসনের অধীনস্থ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কৃত অপকর্মগুলো অনুসন্ধান করা। ফজলুল হক কংগ্রেস সরকারগুলোর অধীনে মুসলমানদের করুন দশার চিত্র সম্বলিত একটি হতাশাজনক প্রতিবেদন পেশ করেন। তখন সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনীতিতে বাংলার মুসলিম রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ এর শেষের দিকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জিন্নাহ তেমন ঐকান্তিক মনোভাব পোষণ করতেন না। ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস এর কাছ থেকে কিছু মৌলিক সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য তিনি পাকিস্তানের দাবীকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আর এই দাবী উত্থাপন করার সাথে সাথে জিন্নাহ মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন এবং নিজেকে এর অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি বাংলা এবং পাঞ্জাবকে পাকিস্তান দাবীর সাথে সংযুক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুটি প্রদেশে মুসলিম লীগ কোন ভোট পায়নি। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাবের যা পরে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত লাভ করে, উদ্যোক্তাদের পছন্দের "প্রস্তাবক" হয়ে ওঠেন ফজলুল হক। যদিও ফজলুল হকের অতীত কর্মকান্ড এবং পরবর্তীকালের তৎপরতা প্রমাণ করে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি বিষয়ও এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে পাঞ্জাবের রাজধানী শহর লাহোর মুসলিম লীগের এই ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। উল্লেখ্য ফজলুল হকের ন্যায় পাঞ্জাবের মূখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াত খান মুসলিম লীগের আয়ত্তাধীনে ছিলেন না। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে তাঁর ইউনিয়নিস্ট পার্টি পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের জন্য পা রাখার জায়গা রাখেনি। তবে দলের অনেক নেতা ও কর্মী অতি দ্রুত বিশাল সংখ্যায় মুসলিম লীগে যোগদান করে। এর ফলে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। যদিও পাঞ্জাবের রাজনীতির ক্ষেত্রে ইউনিয়নিস্ট পার্টির পরিচিতি সমুন্নত রাখেন।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে বাংলার মূখ্যমন্ত্রি এ, কে, ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আর পাঞ্জাবের মূখ্যমন্ত্রি খিজির হায়াত খান তা সমর্থন করেন।

যুদ্ধের বছরগুলোতে কংগ্রেস সরকার পরিচালনা থেকে বাইরে ছিল তবে মুসলিম লীগ সরকারের সাথে অংশীদার ছিল। আর এইভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদত্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিধানের সর্বোচ্চ সদ্ব্যব্যহার করতে মুসলিম লীগ সক্ষম হয়। এসময় বাংলা প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অধিকার দেয়া হতে থাকে। হিন্দু-নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম এবং আইন সভার অমুসলিম সদস্যগণ এটিকে সমালোচনা করতে থাকে। এই দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এভাবে আলাদা হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলার মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো পাঞ্জাব, বেঙ্গল ও আসামের মূখ্যমন্ত্রিদের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। জিন্নাহর সাথে কোন আলাপ আলোচনা ছাড়াই তিনি করেন। এতে জিন্নাহ খুবই বিক্ষুব্ধ হন এবং এই তিন মূখ্যমন্ত্রিকে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল হতে পদত্যাগের নির্দেশ প্রদান করেন। পাঞ্জাব ও আসাম প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রিগণ খুব বিনয়ের সাথে পদত্যাগ করেন কিন্তু বাংলার মূখ্যমন্ত্রি ফজলুল হক প্রতিবাদের নিদর্শন হিসেবে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেন যে বাঙ্গালী জাতির সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। আর তাই আমি এক ব্যক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারি না । (The genious of Bengali race reolts against autocracy and I could not, therefore, help protesting against autocracy of a single individual). স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই রুপ বিদ্রোহের চেতনার মধ্যে পূর্ব বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সঠিক গঠন প্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়া যায়।

এই পরিস্থিতিতে বাংলা মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগী মুসলিম লীগের সদস্যবর্গ যারা বাংলা মুসলিম লীগ দল গঠন করেছিলেন এবং "লীগের সর্বোত্তম ট্রাডিশন বজায়" রাখার লক্ষে প্রধানমন্ত্রি ফজলুল হক কর্তৃক গঠিত প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের মধ্যে বিভক্তি প্রকাশ্য রুপ লাভ করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক এবং মুসলিম বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা ফজলুল হক এভাবেই জিন্নাহ কর্তৃক মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত হন। অথচ মুসলিম লীগ দলটিকে তখনও বেঙ্গল লেজিসলেচার মুসলিম লীগ পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বেগম ইশরামউল্লাহ একটি ক্ষুদ্র এবং গুরুত্বহীন সংগঠন মনে করতেন। বাংলার রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে দূরীভূত করতে ফজলুল হক সাময়িকভাবে প্রায় সফলকাম হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর নতুন প্রগতিশীল পার্টির সমন্বয়ে ফজলুল হক তাঁর দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এই কোয়ালিশনের অংশীদার কংগ্রেসের শরৎ বসু গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ, সিডিউলড কাস্ট সদস্যগণ, ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণ। তবে ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ ফজলুল হক নিজের ভাষায়, "I was decoyed (by the Governor) into signing the letter of resignation of my office". ফজলুল হকের পদত্যাগের পরে মুসলিম লীগের নেতা এবং চরম প্রক্রিয়াশীল হিসেবে পরিচিত খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলাকে এভাবে করায়াত্ত করার পর ১৯৪৪ সাল নাগাদ জিন্নাহ আর এক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাবেও জয়লাভ করেন।[৫২]

---

৫২. D.N. Ban** (1969), East Pakistan- A case study in Muslim Politics, New Delhi, Vikas.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের এক অপ্রত্যায়িত ভোটে পরাজয় বরণ করেন। এ সময় এখানে গভর্নরের শাসন আরোপ করা হয় এবং কিছুকালের জন্য ফজলুল হক এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে নেতৃত্ব অদল বদল হতে থাকে। তবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মূলতঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বদৌলতে বাংলা আইনসভায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এক্ষেত্রে এটি লক্ষনীয় যে ভারতের অন্যান্য অংশে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে অথচ বাংলায় অর্থনৈতিক সংস্কারকে স্বল্পমাত্রায় হলেও গুরুত্ব দিতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলমান আসনের খুব কম অংশই কংগ্রেস লাভ করেছিল, কারণ এর বেশীরভাগই মুসলিম লীগ জয় লাভ করেছিল। তবে বরাবরের ন্যায় অতিদ্রুত কংগ্রেস নিজেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবী করে।

বাংলায় ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৫টি লাভ করে মুসলীম লীগ অপরপক্ষে কংগ্রেস পায় মাত্র ৮৪টি আসন। বাংলায় কারচুপির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কংগ্রেস শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করেছিল। তবে সোহরাওয়ার্দী কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসকে আহবান জানান। বাংলার মুসলমানদের কাছাকাছি আসার ক্ষেত্রে এটি কংগ্রেসের জন্য ছিল আর একটি সুযোগ। কারণ সর্বভারতীয় মুসলমান নেতৃত্বের কবল থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এটি সোহরাওয়ার্দীর মানসিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী ছিল। সোহরাওয়ার্দীর এই আহবানকে কংগ্রেস দর কষাকষির আর একটি সুযোগ হিসেবে গণ্য করে। কংগ্রেস দাবী করে যে, মূখ্যমন্ত্রীত্ব বাদে মন্ত্রি পরিষদের সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সমান সমান হবে। এই সাথে স্বরাষ্ট্র এবং বেসামরিক সরবরাহ দপ্তর দুটোর একটি কংগ্রেসকে দিতে হবে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের কারণে মুসলিম লীগের নির্দেশ অনুসারে কোয়ালিশনে অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের প্রতি জানানো আহবান প্রত্যাহার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তিনি বলেন, "I was quite ready, willing and ansious to go into a coalition with the Congress and thus give an example to the rest of India. We might have ushered in a new era". এভাবেই সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পের কবল থেকে বাংলাকে মুক্ত রাখার সুযোগ হারিয়ে যায়।

তাঁর নির্দেশে ১৯২১ সনে বরিশালের আগৈলঝারায় কৃষকদের এক স্মরণীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আণীকণ্ঠ সেন, উকিল ললিত কুমার বল, মাজেদ কাজী, হাসেম তালুকদার, ভেগাই হাওলাদার ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেন। প্রায় পাঁচ হাজার মহিলাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

মাজেদ কাজী। ললিত কুমার বল ও যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক প্রধান। বিশেষ কারণে এই সভায় ফজলুল হক উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে বরিশালের উকিল হাশেম আলী খান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নমশূদ্রদের জন্য পৃথক প্রজা সম্মেলন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতা মিসেস সরোজিনী নাইডু, সরলা দেবী, শরৎ গুহ, হিন্দু মহাসভা নেতা পদ্মরাজ জৈন বরিশাল থেকে আগৈলঝারা সম্মেলন অভিমুখে রওনা দেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও ভেগাই হাওলাদারের অনুরোধে নেতৃবৃন্দ আগৈলঝরার পথ পরিত্যাগ করেন। প্রজা আন্দোলন ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং আগৈলঝরা সম্মেলন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হবার ফলে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সমিতি প্রভৃতি গঠন ও পুনর্গঠনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

১৯২৪ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রজা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ. কে. ফজলুল হক। ইতিপূর্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রজা আন্দোলন চলছিল। তবে তাদের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিলনা। ঢাকার সম্মেলন বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি যোগ দেন এবং এ সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ সমিতি গঠন করা হয়। ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলার জমিদার সাহা মহাজনেরা দেনার দায়েও চক্রবৃদ্ধি সুদের বিনিময়ে স্থানীয় কৃষকদের খাস জমি প্রায় সবই কেড়ে নিয়েছিল। ফলে কৃষক প্রজা ও জমিদার মহাজনদের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। শুরু হয় তুমুল প্রজা আন্দোলন। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে আয়োজিত হয় বিরাট প্রজা সম্মেলন। পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের সভাপতি আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন, "জমিদারদের নির্দেশ ছাড়া যাতে আপনারা আপনাদের জমি চাষাবাদ করতে পারেন, যাবতীয় মানবিক অধিকার ভোগ করতে পারেন এবং যাবতীয় অতিরিক্ত আদায় বা আবোয়াব না দিতে হয় আমি সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের আমার একটি কথা শুনতে হবে। আপনাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমার এই ঘোষণা মানতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে বলছি, জমিদারদের কোন জমি আপনারা চাষাবাদ করবেন না। এবার কর্তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নামুন, ফসল বুনুন। যতদিন আপনাদের জমি উদ্ধার না হয় ততদিন আপনারা জমি চাষ করবেন না। ফজলুল হকের নির্দেশমতো কৃষক প্রজা জমিদার ও সাহাদের চাষ করেনি সে বছর। ফলে বাধ্য হয়ে জমিদার মহাজনেরা কৃষকদের জমি ছেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। হাজার হাজার কৃষক ঋণ মুক্ত হয়। মানিকগঞ্জ সম্মেলন প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ফজলুল হকের সাহস ছিলো বাঘের মত। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সে যুগে সম্ভব হয়েছিল এই ঘোষণা করা যে, প্রজারা জমিদারদের জমি চাষ করবেন না। জমিদার ও মহাজনেরা তাঁর ভয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি। এ আন্দোলনের সাফল্যে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বাংলার লাঞ্ছিত কৃষকদের মধ্যে আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য ১৯২৭ সালে প্রজা সমিতি গঠন করেন। তিনি হন সমিতির সভাপতি। ১৯২৯ সালে কলকাতার নিখিল বাংলা প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অনেক মুসলমান কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে প্রজা সমিতিতে যোগ দনে। সম্মেলনে স্যার আব্দুর রহমান সভাপতি, এ, কে, ফজলুল হক, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন, আব্দুল করিম, মুজিবর রহমান সহ-সভাপতি, মাওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদক, শামসুদ্দিন আহমদ ও তমিজ উদ্দিন খানকে যুগ্ম সম্পাদক করে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের প্রজা নেতা হাশেম আলী খান। পূর্ব বঙ্গে ছিল ঢাকার নবাবদের জমিদারি। সম্মেলনে নবাবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলনের শুরু হয় এবং ১৯৩০ সালের মধ্যেই প্রজা সমিতি একটি শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রজা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা হলেন এ, কে, ফজলুল হক, স্যার আব্দুর রহিম, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন, মৌলভী আব্দুল করিম, সৈয়দ নওশের আলী, শামসুদ্দিন আহমেদ, ডা. আর. আহমেদ, জে. লে. ব্যানার্জী, ঢাকার আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, রেজায়ে করিম, নইমুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী, ময়মনসিংহের খান বাহাদুর ইসমাইল, মাওলানা শামছুল হুদা, আবুল মনসুর আহমেদ, বরিশালের খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, বানী কণ্ঠ সেন, উকিল মফিজদ্দিন, মাজেদ কাজী, ভেগাই হাওলাদার, হাশেম তালুকদার, ললিত কুমার বল, সৈয়দ কুতুবুদ্দিন, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, সাবেক স্পিকার আব্দুল ওহাব খান, খান সাহেব হাতেম আলী জমাদার, কবি মোজাম্মেল, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া, বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, সদরুদ্দিন উকিল, উকিল মোবারক আলী, ফরিদপুরের পীর বাদশা মিয়া, বিরাট চন্দ্র মন্ডল, খুলনার আহমদ আলী, সৈয়দ মোস্তাগাউসুল হক, আব্দুল হাকিম, পাবনার সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, রংপুরের আবু হোসেন সরকার, দিনাজপুরের আব্দুলাহেল বাকী,

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রামের মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী ও বগুড়ার রাজিব উদ্দিন তরফদার প্রমুখ।

১৯৩০ এর দশকের অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার প্রায় সব জেলায় প্রজা সমিতির শাখা গঠিত হতে দেখা যায়। প্রজা সমিতি কেন্দ্রিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় অনুমান করে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার অংশকে সঙ্গে করে নিখিল বঙ্গ সমিতি থেকে বেরিয়ে এসে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করলেন। তবে ফজলুল হক কর্তৃক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে সমিতির সভাপতির পদ নিয়ে দ্বন্দ দেখা দেয়। ১৯৩৪ সালে ভারতের আইন সভার সভাপতি নির্বাচিত হলে স্যার আব্দুর রহমান নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। সমিতির সদস্যরা পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা এ বৃহৎ আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে এ, কে, ফজলুল হক সভাপতির পদের প্রত্যাশী ছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা দলের পক্ষ থেকে খান বাহাদুর এ, মমিন এ পদের জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ পরিস্থিতিতে বিতর্ক মীমাংসার জন্য উভয় দল বিদায়ী সভাপতি স্যার আব্দুর রহমানের মধ্যস্থতা মেনে নিতে সম্মত হয়। তবে তিনি সমিতির প্রথম সহ সভাপতি ফজলুল হকের পরিবর্তে খান বাহাদুর এ. মমিনকে সমর্থন করেন। এ প্রেক্ষাপটে ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় তার বিশাল সমর্থকদের নিয়ে প্রজা সমিতি ত্যাগ করলেন এবং ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেন।

গ্রামীন সমাজের নেতা হিসেবে ফজলুল হক আসন্ন ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে জনগণের মন জয় করার জন্য একটি কৃষি ভিত্তিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কে, পি, পি, কর্ম সূচিতে কৃষককে জমির একচ্ছত্র মালিকানা দিয়ে জমিদারি প্রথা বিলোপ, খাজনার হার হ্রাস, কৃষক সম্প্রদায়ের ঋণ মওকুফের মাধ্যমে মহাজন শ্রেণীর শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তিদান, কৃষকের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ, দেশব্যাপী খাল খননের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি, সর্বগ্রাসী কচুরীপানা পরিস্কার করে নৌচলাচল সচল করা, বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা চালু ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কৃষক কূলের কাছে ফজলুল হকের বক্তৃতা ছিল তাঁর কর্মসুচির মতই আকর্ষণীয়। ফজলুল হকের আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং সে কারণে তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষক সমাজের কাছেও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেন। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচন ইশতেহার শেষ পর্যন্ত 'ডাল ভাত' এর একটি শ্লোগানে পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দী ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। কৃষক ভোটাররা হকের প্রতি বিশাল সমর্থন জানায়। যদিও তার দল মাত্র এক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন হিসেবে প্রতিদ্বন্দীতাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি তৃতীয় স্থান লাভ করে। কংগ্রেস পায় ৫২টি আসন, মুসলিম লীগ ৩৯টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি পায়

Dhaka University Institutional Repository

৩৬টি। বড় এই তিনটি দল কর্তৃক প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ১২৭টি। ২৫০ আসনের অবশিষ্ট ১২৩ টি আসন লাভ করে অন্যান্য খন্ডিত দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। কৃষক প্রজা পার্টি কর্তৃক প্রাপ্ত ৩৬টি আসনের মধ্যে ৩৩টি ছিল পূর্ব বঙ্গ থেকে, ফলে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন এই দলটি পূর্ব বাংলার একটি দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

দূর্ভাগজনক ভাবে, অভাবনীয় নির্বাচনী বিজয়ের পর পরই কৃষক প্রজা পার্টির পতন শুরু হয়। এই দলের নেতা ফজলুল হক মুসলিম লীগ ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দল ও স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থনে ও অংশগ্রহণে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে হককে দলকে সংহত করার পরিবর্তে ক্ষমতার রাজনীতিতে বেশী মনোযোগী হতে দেখা গেল। তার মন্ত্রিসভার ১১ জনের মধ্যে মাত্র দুইজন ছিলেন প্রজা পার্টির সদস্য। মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট সব সদস্যরা ছিলেন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যা লঘু দলগুলি থেকে।

দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দ সংসদে আলাদা দল হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী গ্রুপটি ১৯৩৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রংপুরের গাইবান্ধায় দলের সাধারণ সভা ডাকেন এবং হক ও তার অনুসারীদের দল থেকে বহিস্কার করেন। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ফজলুল হকও বিদ্রোহীদের বহিস্কার করেন। কংগ্রেসের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে ক্ষমতা ধরে রাখতে, ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। লীগের চাপে হকের মন্ত্রিসভা কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য নওশের আলীকে ১৯৩৮ সালের ২২ জুন পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এদিকে একই সঙ্গে বেঙ্গল মুসলিম লীগ উভয় দলেই তিনি অকার্যকর ব্যক্তিতে পরিণত হন। অথচ তার বেঙ্গল মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল।

১৯৩৭ সালের নভেম্বর থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তৃনমূল পর্যায় থেকে দলকে সংগঠিত শুরু করেন। মুসলিম লীগের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টি সংকুচিত হতে থাকে। লীগের উত্থান এতটাই দ্রুত ও সাবলীল ছিল যে, ১৯৪৩ সালে যখন হক মন্ত্রিসভার পতন হয়, তখন বাস্তবে কৃষক প্রজা পার্টি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। এক্ষয়িষ্ণু দল অবশ্য ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে এবং মাত্র ৪টি আসন লাভ করে। অন্য দিকে ১৯৩৭ সালে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দী মুসলিম লীগ পায় ১১৪টি আসন। দেশ বিভাগের পর এ, কে, ফজলুল হক ঢাকায় চলে আসেন এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি নামে তার দলকে নতুন নামে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কৃষক প্রজা পার্টি নামের দলটি টিকে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৩

কৃষক প্রজা সমিতি থেকে কৃষক প্রজা পার্টি এবং কৃষক প্রজা পার্টি থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তর ও পাকিস্তানের জন্ম ঃ

মহান নেতাদের আর্বিভাব বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি চিরন্তন সত্য। এক একটি জাতির অন্ধকার যুগে এক একজন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। যারা স্ব-জাতিকে অন্ধকার, অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করেন। তাঁরা সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন। আবার তাঁরাই সমাজে পরিবর্তন আনেন, ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বিশ্ব ইতিহাসের এ শাশ্বত ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায়, ভারতের বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার কৃষক সমাজ যখন অশিক্ষা, দারিদ্র ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত জমিদার ও মহাজনদের অব্যাহত শোষণে জর্জরিত, যখন তারা দিশেহারা, ঠিক সে রকম বিপর্যস্ত সময়ে আবুল কাশেম ফজলুর হকের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি বাংলার কৃষক ও শ্রমিক সমাজের জন্য শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং সমাজের সাধারণ মানুষের দুমুঠো অন্নের রাজনীতি করেছেন। তিনি শতাব্দীকাল ধরে বঞ্চিত লাঞ্চিত ভাগ্যহত কৃষকদের জমিদার ও মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, কৃষকদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে চেয়েছেন এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করেছেন।

ফজলুল হক প্রজাদের ওপর জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন চিরতরে বন্ধ ও তাদের ডাল ভাতের সংস্থান করার নীতিকে ভিত্তি করে ১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর এরই পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষক প্রজা সমিতি। পরে রূপান্তরিত হয়ে কৃষক প্রজা পার্টি এবং সর্বশেষে কৃষক শ্রমিক পার্টি।

এই দীর্ঘ সময়ে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দলটি। আবার অনেক সময় সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ১৯৫৪ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। কিন্তু খুব দ্রুতই ১৯৫৮ সালের মধ্যে দলটি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হুমকীর সম্মুখীন হয়।

এই অধ্যায়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে রূপান্তর এবং রাজনীতিতে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে কৃষক প্রজা সমিতি

কৃষক প্রজা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটো প্রথমটি হলো অনগ্রসর বাঙালী জাতিকে শিক্ষিত করে তাদের আত্ম-সচেতন করে তোলা, তাদের অন্তরে স্বাধিকারবোধ জাগ্রত করা। দ্বিতীয়টি, বাঙালীদের অর্থনৈতিক মুক্তি, অর্থ্যাৎ তাদের জন্য মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান করা। কৃষক সমাজ মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা পাবে, শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে- এ ছিল সাধারণ আশাআকাঙ্খা। এদেশের কৃষকরা ঋণী হয়ে জন্মে, ঋণ করে বেঁচে থাকে এবং ঋণগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। জমিদার- মহাজনদের শোষণে কৃষকদের পঙ্গু দসা। ফজলুল হক প্রজাদের ওপর জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন চিরতরে বন্ধ ও তাদের ডাল ভাতের সংস্থান করার নীতিকে ভিত্তি করে ১৯১৪ সালে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর নির্দেশে খান বাহাদুর হাশেম আলী (১৮৮৮- ১৯৬২) কলকাতার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে বরিশালে আইন ব্যবসা ও প্রজা আন্দোলন আরম্ভ করেন। হাশেম আলী খান, পটুয়াখালীর সর্বত্যাগী বাণীকণ্ঠ সেন, গৌরীনদীর দুর্জয় সাহসী মাজেদ কাজী, উকিল মফিজ উদ্দিন, আগৈলঝরার আপনভোলা ভেগাই হালদার, কলসকাঠির হাশেম তালুকদার, উলানিয়ার কংগ্রেস কর্মী ওয়াহেদ রাজা চৌধুরী, কলসকাঠির মুন্সী মুহম্মদ ইয়াসীন হাওলাদার প্রমুখ ফজলুল হকের নেতৃত্বে বরিশালে শক্তিশালী রায়ত প্রজা আন্দোলন গড়ে তুলেন।

আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলার বিভিন্ন জেলার প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর আহবানে গ্রামে গঞ্জে প্রজা সমাবেশ হয়। ১৯১৪ সনে খোশ মুহম্মদ চৌধুরী জামালপুর কুমারচরে এক কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে সভাপত্বিত করেন এ কে ফজলুল হক। তিনি তাঁর অভিভাষণে কৃষক প্রজাদের তাদের দাবীর আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। জামালপুরে চাকুরী জীবনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একদিন প্রজাদের জমিদারের নিপীড়ন ও মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করবেন। তিনি সেই জামালপুর থেকেই প্রজা আন্দোলন এর ডাক দিলেন। তাঁর নির্দেশে ১৯২১ সনে বরিশালের আগৈলঝরায় কৃষকদের এক স্মরণীয় মহাসম্মেল অনুষ্ঠিত হয়। বাণীকণ্ঠ সেন, উকিল ললিত কুমার বল, মাজেদ কাজী, হাশেম তালুকদার, ভেগাই হাওলাদার ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেন। প্রায় পাঁচ হাজার মহিলাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন মাজেদ কাজী। ললিত কুমার বল ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্বেচ্ছাসেবক প্রধান ছিলেন। বরিশালের উকিল হাশেম আলী খান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নমশূদ্রদের জন্য পৃথক প্রজা

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতা মিসেস সরোজজিনী নাইডু, সরলা দেবী, শরৎ গুহ, হিন্দু মহাসভানেতা পদ্মরাজ জৈন বরিশাল থেকে আগৈলঝরা সম্মেলন অভিমুখে রওনা দেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও ভেগাই হাওলাদারের অনুরোধে নেতৃবৃন্দ আগেলঝরার পথ পরিত্যাগ করেন। প্রজা আন্দোলন ছিল অসাম্প্রদায়িক এবং আগৈলঝরা সম্মেলন হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সূচনা করে।[৫৩]

১৯২৪ সনে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রজা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ, কে, ফজলুল হক। ইতিপূর্বে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে প্রজা আন্দোলন চলছিল। তবে তাদের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। ঢাকার সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি যোগ দেন এবং এ সম্মেলনে নিখিল বঙ্গ সমিতি গঠন করা হয়। ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলার জমিদার ও সাহা মহাজনেরা দেনার দায়ে ও চক্রবৃদ্ধি সুদের বিনিময়ে স্থানীয় কৃষকদের খাস জমি প্রায় সবই কেড়ে নিয়েছিল। ফলে কৃষক প্রজা ও জমিদার মহাজনদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়। শুরু হয় তুমুল প্রজা আন্দোলন। ১৯২৬ সনে মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে আয়োজিত হয় বিরাট প্রজা সম্মেলন। পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনের সভাপতি আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করলেন, "জমিদারদের নির্দেশ ছাড়া যাতে আপনারা আপনাদের জমি চাষাবাদ করতে পারেন, যাবতীয় মানবিক অধিকার ভোগ করতে পারেন এবং যাবতীয় অতিরিক্ত আদায় বা অবোয়াব না দিতে হয় আমি সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের আমার একটি কথা শুনতে হবে। আপনাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমার এই ঘোষণা মানতে হবে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে বলছি, জমিদারদের কোন জমি আপনারা চাষাবাদ করবেন না। এবার কর্তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নামুন, ফসল বুনুন। যতদিন আপনাদের জমি উদ্ধার না হয় ততদিন আপনারা জমি চাষ করবেন না।" ফজলুল হকের নির্দেশমতো কৃষক প্রজা, জমিদারদের কোনো জমি চাষ করেনি সে বছর। ফলে বাধ্য হয়ে জমিদার মহাজনেরা কৃষকদের জমি ছেড়ে দেয়। হাজার হাজার কৃষক ঋণ মুক্ত হয়। এ আন্দোলনের সাফেল্যে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বাংলার বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য ১৯২৭ সনে প্রজা সমিতি গঠন করেন। তিনি হন সমিতির সভাপতি। ১৯২৯ সনে কলকাতায় নিখিল বাংলা প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অনেক মুসলমান কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে প্রজা সমিতিতে যোগ দেন।

---

৫৩. বি.ডি. হাবিবুল্লাহ ঃ শেরে বাংলা, ১৯৬২, বরিশাল, ঢাকা PP ৫০-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে স্যার আবদুর রহিম সভাপতি, এ, কে, ফজলুল হক, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন, আবদুল করিম, মুজিবর রহমান সহসভাপতি, মওলানা আকরম খাঁ সম্পদাক, শামসুদ্দিন আহমদ ও তমিজ উদ্দিন খানকে যুগ্ম সম্পাদক করে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করা হয়। ফজলুল হকের নির্দেশে ১৯৩০ সনে বরগুনা জেলার গৌরীচন্নায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বরিশালের প্রজা নেতা হাশেম আলী খান। এই অঞ্চলে ছিল ঢাকার নবাবদের জমিদারি। সম্মেলনে নবাবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার অঙ্গীকার করা হয়।

১৯১৪ সনে প্রজা আন্দোলনের শুরু হয় এবং ১৯৩০ সনের মধ্যেই প্রজা সমিতি একটি শক্তিশালী সামজিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রজা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁরা হলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক, স্যার আব্দুর রহিম, খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন, মৌলভী আব্দুল করিম, মাওলানা আকরাম খাঁ, কবি নজরুল ইসলাম, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হুমায়ুন কবির, সৈয়দ নওশের আলী, শামসুদ্দিন আহমেদ, ডাঃ আর আহমেদ, জে, এল, ব্যানার্জি; ঢাকার আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, রেজায়ে করিম, নঈমুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী, ময়মনসিংহের খান বাহাদুর ইসমাইল, মাওলানা শামসুল হুদা, আবুল মনসুর আহমেদ, বরিশালের খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, বাণীকণ্ঠ সেন, উকিল মফিজউদ্দিন আহমেদ, মাজেদ কাজী, ভেগাই হালদার, হাশেম তালুকদার, ললিত কুমার বল, সৈয়দ কুতুবউদ্দিন, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, সাবেক স্পিকার আব্দুল ওহাব খান, খান সাহেব হাতেম আলী জামাদার, কবি মজাম্মেল হক, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া, বি, ডি, হাবিবুল্লাহ, সদরুদ্দিন উকিল, উকিল মোবারক আলী, ফরিদপুরের পীর বাদশা মিয়া, বিরাটচন্দ্র মন্ডল, খুলনার আহমদ আলী, সৈয়দ মোস্তাগাউসুল হক, আব্দুল হাকিম। পাবনার সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, রংপুরের আবু হোসেন সরকার, দিনাজপুরের আব্দুল্লাহেল বাকী, কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, চট্রগামের মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী চৌধুরী ও বগুড়ার রাজিব উদ্দিন তরফদার প্রমুখ।

১৯৩৪ সনে স্যার আব্দুর রহিম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রজা সমিতির সভাপতি পদে ইস্তফা দেন এবং খান বাহাদুর মোমেনকে সভাপতি মনোনীত করে যান। প্রগতিশীল দল কৃষক প্রজাদের নেতা এ, কে, ফজলুল হককে সভাপতি করতে চায়। এ, কে, ফজলুল হকের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ। ১৯৩৪ সনে ঢাকায় প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বিরোধী দল নির্বাচনের বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সনে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রজা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করা হয় কবি নজরুল ইসলামের রচিত সঙ্গীত এবং আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠের গান দিয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ, কে, ফজলুল হক। ডা. আর. আহমদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, আশরাফ আলী চৌধুরী, শামসুদ্দিন আহমেদ, আবুল মনসুর আহমেদ, সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখের সমর্থনে এ, কে, ফজলুল হক প্রজা সমিতির সভাপতি এবং কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। জনসংখ্যার শতকার ৮০ ভাগ কৃষক প্রজা। তারা ঐক্যবদ্ধ হলে বঙ্গীয় আইন সভার ২৫০টি আসনের অধিকাংশ আসনে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে কৃষক সমাজ বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এ, কে, ফজলুল হক জমিদার ও সরকারী নিপীড়নের হাত থেকে প্রজাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রাজনৈতিক স্লোগান ছিল, " লাঙ্গল যার জমি তার, ঘাম যার দাম তার"। তিনি কৃষক সমাজের ডাল ভাতের রাজনীতি করতেন। বাংলার অকহেলিত শোষিত কৃষক প্রজাকূল ফজলুল হকের ডাল ভাতের রাজনীতিতে বিপুলভাবের সাড়া দেয় এবং শক্তিশালী সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করে। ফজলুল হক ভারতের ইতিহাসে কৃষক সমাজকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে গড়ে তুলতে সমর্থ হন।

ঢাকায় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির চতুর্থ সম্মেলন

১৯৩৫ সনের ৩রা জুরাই, ৮৮/২, ঝাউতলা রোডে কলকাতা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ঢাকায় ১১ ও ১২ জুলাই তারিখে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডা. আর. আহমদ। সিদ্ধান্ত হয়, সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলার জননেতা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক। নির্দিষ্ট দিনে প্রাকৃতিক দূর্যোগ উপেক্ষা করে বিভিন্ন জেলা থেকে চারশ নেতা কর্মী ও হাজার হাজার কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। এ, কে, ফজলুল হক, ডা. আর, আহমদ, আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আহমদ আলী, শামসুদ্দিন আহমদ, শাহ আবদুল হামিদ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, নির্মলচন্দ্র গোষ, বিরাটচন্দ্র মন্ডল, রেজায় করিম, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ নওশের আলী,

Dhaka University Institutional Repository

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ নেতা সম্মেলনে যোগ দেন। প্রজা আন্দোলন ছিল বাংলার চার কোটি ক্ষুধার্ত, ঋণগ্রস্ত ও রোগজীর্ণ কৃষকদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম স্বরুপ।[৫৪] যুগ যুগান্তরের অবহেলিত, প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত জনগণ আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজেকে অধিকার সচেতন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলার কৃষকের আত্মচেতনাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এ সম্মেলনে ফজলুল হকের প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর অভিভাষণে বলেন- "বন্ধুগণ কোন হতভাগ্য দেশে লক্ষ লক্ষ নর নারী, স্ত্রী পুত্র, কন্যাসহ অভূক্ত অবস্থায় রাতে শয্যার নামে মাটিতে শয়ন করে ? এই দেশে। কোন দূর্ভাগা দেশে লক্ষ লক্ষ নর নারী ও নিস্পাপ শিশুরা ঔষধপথ্য ও চিকিৎসার অবহেলায় অকালে মৃত্যুবরণ করে থাকে ? এই দেশে। কোন কপালপোড়া দেশে সহায় ও সম্বলহীন আশ্রয়শূন্য বৃদ্ধেরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে রাজপথে মরে ? এই দেশে। কোন লক্ষ্মী ছাড়া দেশে আশ্রয়হীনা পল্লী নারীরা নিরুপায় অবস্থায় ছোট ছোট পুত্র কন্যাসহ কলকাতা উপস্থিত হয়ে ফুটপাতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ঝড় ঝাঞ্চনা, বৃষ্টি বাদলের মধ্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে উন্মুক্ত ফুটপাতে অবস্থানপূর্বক দেশের দৈন প্রমাণিত করে?[৫৫]

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবলীর মধ্যে ছিল বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা রহিত করা, জমিতে কৃষক প্রজার স্থায়ী মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সেলামী প্রথা উচ্ছেদ ও সর্বপ্রকার আবোয়ার রহিত করা, কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, কৃষির উৎকর্ষের জন্য হাজা মজা নদী নালার সংস্কার করা, কর্মচারীদের বেতন হাজার টাকার বেশী না হওয়া, বাংলা দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা, যে সকল কর্মচারী দল বিশেষের পক্ষে প্রচার চালাবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা, স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেতন অর্ধেক ও পাঠ্যপুস্তকের মূল্য হ্রাস কার, অকৃষকদের কাছে কৃষিজমি হস্তান্তর বন্ধ করা, শোষণমূলক মহাজনি প্রথা রহিত করা, স্বল্প সুদে টাকা দেয়ার নিমিত্তে কৃষি ব্যাংকের প্রবর্তন করা, সরকারী সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বেকার সমস্যার সমাধান করা প্রভৃতি।

---

৫৪ এস.এস. আজিজুল হক ঃ শতাব্দীর কণ্ঠস্বর, ঢাকা, ১১৬৬, P-৩৪

৫৫ বি.ডি হাবিবুল্লাহ ঃ শেরে বাংলা, ১৯৬২, বরিশাল, ঢাকা- P-৫০

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক প্রজা সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

কৃষক শ্রমিক মুক্তির মানসে ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি গঠন করেন। কৃষক প্রজা সমিতির আদর্শ ও কর্মসূচি থেকে জননায়ক ফজলুল হকের বাংলার কৃষক সমাজের প্রতি তাঁর দরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সনে নির্বাচনের প্রাক্কালে কৃষক প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে ইস্তেহার প্রচার করা হয়।

১. মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে ভারতে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে অবিলম্বে বর্তমান প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের এবং পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন;

২. ভারতের মুসলামানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তার উন্নতি সাধন;

৩. ভারতের মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্য স্থাপন;

৪. ভারতের মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে ও সুদৃঢ় করতে হবে এবং

৫. আইনানুগ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী জমিদারী প্রথার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) উচ্ছেদ সাধন।

কর্মসূচি ঃ

১. মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে;

২. সকল প্রকার পীড়নমূলক যথা – বেঙ্গল ক্রিমিনাল এ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ভারত রক্ষা আইন প্রভৃতি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩. যে সব বিধি ব্যবস্থা বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থবিরোধী যা জনসাধারণের মৌলিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে এবং দেশকে অর্থনৈতিক শোষণের অন্তর্ভূক্ত করে তার বিরোধিতা করতে হবে;

৪. প্রাদেশিক শাসনের জন্য যে খরচ হচ্ছে তা কমাতে হবে এবং দেশ গঠনে বিভাগগুলোর জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে;

৫. কুটির শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প গঠনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে (ক) অবিলম্বে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দিতে হবে,

Dhaka University Institutional Repository

(খ) প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্নজাত দ্রব্য গোটা প্রদেশে কেনা বেচার ব্যবস্থা করতে হবে, (গ) সরকারী প্রয়োজনে ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে, (ঘ) বৃহৎ ও ভারী শিল্প গঠনের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

৬. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে মুদ্রা বিনিময় ও মূল্য নির্ধারণ করতে হবে,

৭. গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে হবে।[৫৬]

নির্বাচন ১৯৩৭ ঃ প্রচারণা

১৯৩২ সনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৩৫ সনে ভারতে এ শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে পৃথক নির্বাচন প্রথা, কেন্দ্রে ফেডারেল ও প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। যারা ৬ আনা খাজনা কর প্রদান করে তারাও এই আইন বলে ভোটাধিকার লাভ করে। ফলে বাংলার মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগ কৃষক সম্প্রদায় ভোটার তালিকায় সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়ায় এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে বঙ্গীয় আইনসভার ২৫০টি আসনের জন্য ৬৬,২২,৬৫৪ জন ভোটার ছিল। তার মধ্যে মহিলা ভোটার ছিল ৯,৩৮,৮৫১ জন। ১৯২১ সনে ভোটসংখ্যা ছিল ১৩,৪৪,৩১৬ এবং তার মধ্যে মহিলা ভোটার ছিল ৪১,৯৩১ জন। নির্বাচনের সময়সীমা ছিল ১৯৩৭ সনের জানুয়ারি মাস। সে প্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সনের আগস্ট মাস থেকে নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়।

১৯৩৭ সনের জানুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য কৃষক প্রজা সমিতি এ, কে, ফজলুল হককে সভাপতি এবং শামসুদ্দিন আহম্মদকে সম্পাদক করে কৃষক প্রজা পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করে। বোর্ড ২৫ জন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল খালেদ রশিদ উদ্দিন আহম্মেদ (পীর বাদশা মিয়া), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, মুহম্মদ আব্দুল করিম, অধ্যাপক জি, কি, ব্যানার্জি, হাজী আব্দুর রশীদ খান, ডা. পরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, ডা. আর, আহমেদ, সৈয়দ নওশের আলী, মাওলানা আহমেদ আলী, আবুল মনসুর আহমেদ, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, রেজায়ে করিম, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নজির আহমেদ চৌধুরী, রকীব উদ্দিন তরফদার, আবদুল মজিদ, মির্জা আবদুল কাদের, দেওয়ান নাসির উদ্দিন, বিরাটচন্দ্র মন্ডল, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং শামসুদ্দীন আহমেদ।

---

৫৬. কামরুদ্দীন আহমেদ, "The Social History of East Pakistan (Dhaka, Crescent Book Centre, 1967, P-30.

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচনে প্রার্থীদের ৫ই অক্টোবরের মধ্যে কৃষক প্রজা সমিতি অফিসে আবেদনপত্র পাঠাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যবস্থা পরিষদে ২৫০ টি আসনের মধ্যে ১১৯ টি মুসলমানদের আসন নির্ধারিত। নমশুদ্র ও হিন্দুদের আসনে যারা কৃষক প্রজা সমিতির প্রার্থী হতে চান তাদের মনোনয়ন দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

কৃষক প্রজা সমিতির নেতা ডা. আর. আহমেদ মুসলিগ লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, এ, কে, ফজলুল হক বাংলার যে কোনো জায়গা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করতে পারবেন। সোহরাওয়ার্দী এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এ, কে, ফজলুল হককে খাজা নাযিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে পটুয়াখালী দক্ষিণ নির্বাচনী এলাকা থেকে দাঁড়াবার আহবান জানালেন। এ, কে, ফজলুল হক এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। পটুয়াখালীতে নাযিমউদ্দিনের জমিদারি এবং দুবার তিনি এ অঞ্চল থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সে জায়গায় জমিদরাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবার সুঃসাহস কোনো প্রজার ছিল না। নাজিমউদ্দীনের জয় সুনিশ্চিত জেনে মুসলিম লীগ তাঁকে পটুয়াখালীতে প্রার্থী করে। পটুয়াখালী, মীর্জাগঞ্জ, বাউফল ও গলাচিপা থানা নিয়ে নির্বাচনী এলাকা এবং লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষ। আবুল কাশেম ফজলুল হক নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আজ হতে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হল। ইনশাল্লাহ আমি অল্প সময়ের মধ্যে জমিদারী প্রথা বাতিল করবো। বাংলার ৪ কোটি কৃষক মাথা উচু করে তাদের পায়ের ওপর শক্তভাবে দাঁড়াতে পারবে এবং তাদের সকল দাবি দাওয়া আদায় করবে। খোদা আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের জয় অনিবার্য।" এ, কে, ফজলুল হক তার নির্বাচনী সভা শুরু করলেন বরিশাল শহর থেকে। ১৯৩৬ সালে ২রা সেপ্টেম্বর বরিশাল শহরে অশ্বিনীকুমার টাউন হলে এক জনাকীর্ণ সভায় তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে এমন প্রতিনিধিদের আইনগত ভাবে পাঠানো উচিত যারা ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ লাঘবে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন। এসভায় সভাপতিত্ব করেন বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান শরৎচন্দ্র গুহ।

নাযিমুদ্দিন নির্বাচনী চালাতেন সরকারী লঞ্চে এবং ফজলুল হক নৌকায় ও পায়ে হেঁটে কৃষক প্রজার দ্বারে যেতেন। ফজলুল হকের পক্ষে যাঁরা দিবা রাত্রি প্রচারাভিযান চালিয়েছেন, তাঁরা হলেন– বাণীকণ্ঠ সেন, হাশেম আলী খান, বি ডি হাবিবুল্লাহ, ওবায়দুল হক, উকিল মোবারক আলী, এমদাদ আলী মোক্তার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, মাহছিয়াপোষ, খাদেম আলী মৃধা,

Dhaka University Institutional Repository

ডা. আবুল হাশেম, ওমর আলী, রুস্তম আলী খান, সৈয়দ এহসানুল কবীর প্রমুখ। ফজলুল হক তাঁর কর্মীদের নিয়ে প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে কখনও গরিব কৃষকের বাড়িতে পান্তা ভাত খেয়ে তাঁকে জনসভা করতে হয়েছে। মৃজাগঞ্জর গাজী বাড়ি নবাবের গোঁড়া সমর্থক। তিনি গাজী বাড়ি যেয়ে কবর জেয়ারত করলেন। তা দেখে বাড়ির সবাই তাঁর প্রচারে নেমে আসেন। ফজলুল হক পিরোজপুর মহকুমার উত্তর আসন থেকেও নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লেহাজউদ্দিন। ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রচার বরিশালে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির প্রার্থীর পক্ষে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি নির্যাতিত কৃষক প্রজার উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা যাতে জমিদার ও মহাজনদের হুকুম ছাড়া নিজস্ব ঘর বাড়ি ও দালান করতে পারেন, ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিতে পারেন, যাবতীয় মানবীয় অধিকার ভোগ করতে পারেন, জমি হস্তান্তর করতে পারেন, জমি হস্তান্তর করতে জমিদারকে কোন সেলামী দিতে না হয় ও যাবতীয় অতিরিক্ত আদায় আবোয়াব না দিতে পারেন, ইনশাল্লাহ, আমি সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবোই। আমি সর্বনাশা সুদের ব্যবসা অচল করে দেব। আপনাদের বন্ধকি জমি ঘর বাড়ি ও ভিটা মাটি সবই উদ্ধার করবো। ঋণ সালিশী আমি সংশোধন করে ঋণ সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে কোটি কোটি টাকার ঋণ চিরতরে বন্ধ করে দেবো। জমিদারী জন্মের মত উৎখাত করবো। কৃষক প্রজাকে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিক্ষা দেবো। আমি ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়ে নবযুগের সৃষ্টি করবো।" এর আগে তিনি সমিতির পক্ষ থেকে স্লোগান দেন, লাঙ্গল যার ভূমি তার, ঘাম যার দাম তার।"

নির্বাচনে কৃষক প্রজা সমিতির প্রতীক ছিল লাঙ্গল। কাজী নজরুল ইসলামের লাঙ্গল সম্পর্কে রচিত বিখ্যাত গান " গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, চল বাজান চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে বউ দিয়েছে গলায় দড়ি তারি ব্যথা সইতে, চল বাজান চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে"। নির্বাচনী প্রচারণায় কৃষক প্রজা পার্টি ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। ঐ সকল কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল রাজবন্ধীর মুক্তি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি

১৯৩৬ সনের আগস্ট মাস থেকে ১৯৩৭ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার চলে এবং জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফল ঃ

সব ধরনের প্রলোভন ও ভীতি উপেক্ষা করে বরিশালের কৃষক সমাজ এ, কে, ফজলুল হককে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেন। খাজা নাযিমউদ্দিন স্বীয় জমিদারিতে পরাজয়বরণ করেন। এ নির্বাচনে ফজলুল হক ১৩ হাজার এবং খাজা নাজিমুদ্দিন মাত্র ৫ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। পিরোজপুর কেন্দ্রে ফজলুল হক প্রায় সমস্ত ভোট পেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। পরে পিরোজপুরে তাঁর শূন্য আসনে সৈয়দ মুহম্মদ আফজাল নির্বাচিত হন। জননায়ক ফজলুল হকের জনপ্রিয়তার কাছে বরিশালের ৯টি আসনেই মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হয় এবং তাঁর দলের খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, কবি মোজাম্মেল হক, আব্দুল ওহাব খান, তোফায়েল আহম্মেদ চৌধুরী, সদর উদ্দিন উকিল, খান সাহেব হাতেম আলী জমাদার এবং আব্দুল কাদের নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রধানত ৩টি দল, কংগ্রেস, মুসলীমলীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশ গ্রহণ করে। উক্ত নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।[৫৭]

ছক - ১

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
কংগ্রেস	৬০
মুসলীম লীগ	৪০
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৫
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪১
স্বতন্ত্র হিন্দু	১৪
স্বতন্ত্র তফশিলী সম্প্রদায়	২৩
ইউরোপীয়	২৫
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
মোট =	২৪২

উৎস ঃ Indian Annual Register, Vol. ১, ১৯৩৭, ৫৯-৬০.

---

৫৭. In a memorandum on 12 March, 1937 on the elections the secretary of state wrote. "In Bengal the different Muslims politics are prepared to unite to form a Government and can thus command a larger following than the congress. Mr. Fazlul Huq, the leader of Proja or Tenant Party, has undertaken to form a Government on the basis of a coalition of his party and the Muslim League. See P.N. Chopra, ed, (Towards Freedom, 1937 (New Delhi : Indian council of Historical Research , 1985), P- 222

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র মুসলমান সদস্যের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম লীগে ও কয়েকজন কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। ফলে মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯ এবং কৃষক প্রজা পার্টির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫। উচ্চ পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৩টি। এর মধ্যে মুসলিম লীগ ১১, নির্দলীয় মুসলিম ১৩, কংগ্রেস ২০ নির্দলীয় হিন্দু ১২, ইউরোপীয় ৬ এবং বিশেষ শ্রেণী ২১ জন। মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টির পৃথক প্রার্থী ছিল না। উচ্চ পরিষদের সদস্যরা নিম্ন পরিষদ বা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এ,কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় কৃষক প্রজা পার্টি। সুতরাং ১৯৩৭ সন থেকে কৃষক প্রজা পার্টি যা পূর্বে ছিল কৃষক প্রজা সমিতি বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, রাজনীতিতে অনেক সময় দল থেকে দলের নেতা এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছেন আবার দলীয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় থেকেছেন।

সুতরাং কৃষক পার্টি ১৯৫৩ সনের ২৭শে জুলাই পুণরায় কৃষক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তর হওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে যে ভূমিকা রেখেছে আমরা আলোচনায় মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো।

এ, কে, ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৭ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করে কলকাতা এলে মুসলমান ছাত্র ও অন্যান্য মুসলিম সংগঠন তাঁকে মৌলভী আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে বিরাট সংবর্ধনা জানায়। অভিনন্দনের উত্তরে ফজলুল হক বলেন " এ দেশের দরিদ্র কৃষক- তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক বা খৃষ্টানই হোক না কেন, আমাদের প্রজা পার্টি তাদের সকল দুঃখ- দুর্দশার প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করবে। আমরা কেবল নির্বাচনে জয়ের জন্যই, একথা বলছি না। আমি বিশ্বাস করি, কৃষক প্রজার উন্নতি না হলে এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গ্রামের অধিবাসী শতকরা ৭৫ জন লোকই প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র পায় না। আমরা দেখব যে, প্রত্যেক গ্রামে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; প্রত্যেক গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যে সেলামী এবং অন্যান্য যে সকল অন্যায় বিধান আছে তা রহিত করতে হবে। আমরা প্রাণপণে এসব অভাব অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করবো।[৫৮]

---

৫৮. সিরাজ উদ্দিন হোসেন ইতিহাস কথা কও- ঢাকা, ১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ-গ্রুপের মধ্যে বণ্টনকৃত বঙ্গীয় আইনসভার আসনে 'পৃথক নির্বাচন' পদ্ধতিতে (Separate Electorate) অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম না হওয়ায় একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২৫০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গীয় আইনসভায় এককভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সর্বাধিক আসন (১২১টি) সংরক্ষিত থাকায় এ সরকারের নেতৃত্ব যে তাদের হাতে আসবে তাও সুনিশ্চিত ছিল। এদিকে মুসলিম আসনে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি, জিন্নাহর মুসলিম লীগ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক আসন লাভ করলেও, পটুয়াখালী নির্বাচনী এলাকা থেকে (অপর একটি আসন বাদে) সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজলুল হক মুসলিম লীগ নেতা ও ঢাকা নবাব পরিবারের অন্যতম সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে নির্বাচিত হলে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজা আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনায় এটাও মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফজলুল হককেই সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলমান সদস্যরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে, সেজন্য মুসলমান জনমতের প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তা সফল হতে পারে নি।

'প্রজা-লীগ' ঐকমত্য সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি সহজ কাজ ছিল না। আইনসভার নির্বাচনের পরপর কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি (যাঁদের অধিকাংশই জমিদার শ্রেণীভূক্ত) আঞ্চলিকতা বা অন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কথা তুলে নিজেদের পক্ষে অন্যান্য সদস্যের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। মন্ত্রিসভায় আসন লাভ করা ছিল এঁদের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে মাসুদ আলী পন্নী (টাঙ্গাইল), নবাব কে,জি,এম ফারুকী (কুমিল্লা) এবং নবাব মোশাররফ হোসেন (জলপাইগুড়ি) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তিন জনের মধ্যে নবাব মোশাররফ হোসেন আরো এক ধাপ এ দিয়ে 'প্রশাসনের উত্তর বাংলার জনের মধ্যে নবাব মোশাররফ উদ্দেশ্যে ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে 'এ্যাসেমব্লি নর্থ বেঙ্গল গ্রুপ' গঠন করে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। একটি আধা-সামন্তবাদী সমাজে অনুন্নত দলীয় ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির উপর কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ, কে, ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে মিলিত হয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাদের মধ্যে ৩ জন মুসলিম লীগ, ৩ জন কৃষক শ্রমিক সমিতি, ৩ জন বর্ণহিন্দু, ২ জন তফসিলি। ঐক্যের খাতিরে তিনি কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভায় নিতে পারেন নি। মুসলিম লীগ ও গভর্নর এন্ডারসনের বিরোধিতার জন্য তিনি শামসুদ্দিনকে বাদ দিয়ে নবাব কাজী মোশারফ হোসেন কে মন্ত্রী করেন। এভাবে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে ফজলুল হককে তাঁর অনেক ভক্ত ও নিবেদিত কর্মীকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

মন্ত্রীদের নাম	দপ্তর
এ, কে, ফজলুল হক, কৃষক প্রজা সমিতি	প্রধান মন্ত্রী, শিক্ষা
খাজা নাযিম উদ্দিন, মুসলিম লীগ	স্বরাষ্ট্র
হোসেন সোহরাওয়ার্দী, মুসলিম লীগ	বাণিজ্য
নবার হাবিবুল্লাহ, মুসলিম লীগ	কৃষি, শিল্প
সৈয়দ নওশের আলী, কৃষক প্রজা সমিতি	স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
নবাব কাজী মোশারফ হোসেন, কৃষক প্রজা সমিতি	বিচার ও আইন
নলিনীরঞ্জন সরকার, বর্ণহিন্দু	অর্থ
বি পি সিংহ রায়, বর্ণহিন্দু	রাজস্ব
মহারাজা শিরীষ চন্দ্র নন্দী	পূর্ত
মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, তফসিলি	সমবায়, কৃষি ঋণ
প্রসন্নদেব রায়, তফসিলি	বন ও আবগারি।

১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল এ, কে, ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রি সভা গভর্নর এন্ডারসনের কাছে শপথ গ্রহণ করেন। আইন সভায় স্পিকার হলেন স্যার আজিজুল হক এবং ডেপুটি স্পিকার হলেন জালাল উদ্দিন হাশমী। ফজলুল হক ঐ একই দিন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃস্থানীয় সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ফজলুল হক এখন কোটি বাঙালির ভাগ্যবিধাতা। ১৯৫৭ সনে পলাশী প্রান্তরে বাঙালীরা ষড়যন্ত্রের ফলে দেশ শাসনের ক্ষমতা ইংরেজদের কাছে হারিয়েছিল। সুদীর্ঘ ১৮০ বছর পর জননায়ক এ,কে,ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দেশ শাসনের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পায়।

Dhaka University Institutional Repository

১১ সদস্য বিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভায় ৬জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫জন ছিলেন হিন্দু (৩ জন বর্ণহিন্দু ও ২ জন তফসিলী হিন্দু)। কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় হিন্দু সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষ করে ব্যাপক হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। অন্যদিকে ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন জমিদার, ১ জন পুঁজিপতি এবং ৪ জন আইনজীবী-রাজনীতিবিদ ছিলেন।[৫৯]

---

৫৯. করটিয়ার প্রখ্যাত জমিদার, যিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তিনি ময়মনসিংহ জেলার সদস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করেন। Star of India, 2 March 1937, 5.

নবাব ফারুকী (১৮৯১-১৯৭১) কুমিল্লার একজন প্রভাবশালী জমিদার, যিনি ১৯২১ সাল থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৯-১৯৩৬ সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম দল' নামে তিনি আইনসভার মধ্যে একটি ভিন্ন গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেন। *আজাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, ৭।

নবাব মোশাররফ হোসেন (১৮৭১-১৯৬৬) জলপাইগুড়ি জেলার একজন জমিদার ও চা-বাগানের মালিক ছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৯২৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ নওশের আলী ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক।

স্যার বি,পি, সিংহ রায় ও শ্রীশ চন্দ্র নন্দী যথাক্রমে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি হলেন নলিনীরঞ্জন সরকার, যিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ছিলেন।

Star of Ida, 27 February 1937, 9; *The Amrita Bazar Patrika,* 27 February 1937,5.

নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব মোশাররফ হোসেন, স্যার বি,পি,সিংহ রায়, শীরিষ চন্দ্র নন্দী ও প্রসন্ন দেব রাইকত।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী এলাকা বিচারে ও জন বিশেষ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ২ জন জমিদার এ্যাসোসিয়েশন এবং ১ জন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বাকি ৮ জনের মধ্যে ৪ জন শহর এলাকা থেকে নির্বাচিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে মন্ত্রিসভায় পল্লী অঞ্চলের জনগণের, বিশেষ করে কৃষক প্রজার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই অপ্রতুল। তৎকালীন অবস্থায় মুসলিম লীগ ও অকংগ্রেসী হিন্দু সদস্যদের নিয়ে গঠিত কোয়ালিশনে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদার-সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই অবস্থায় যদি কোন মন্ত্রিসভাই গঠন করতে হতো, তাহলে ফজলুল হকের পক্ষে ঠিক এমন একটি মন্ত্রিসভা গঠনই সম্ভব ছিল।[৬০]

মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে প্রথমে অসন্তোষ এবং কিছুদিন পর প্রকাশ্য বিভক্তি দেখা দেয়। মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগ যেখানে ৩টি আসন লাভ করে (সোহরাওয়ার্দী এবং ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা হাবিবুল্লাহ ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন), সেখানে কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মাত্র ২ জন সদস্য (ফজলুল হক ও নওশের আলী) অন্তর্ভূক্ত হন। মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বক্ষণে চূড়ান্ত তালিকা থেকে ফজলুল হক তাঁর পার্টির সেক্রেটারি শামসুদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে তদস্থলে নবাব মোশাররফ হোসেনকে অন্তর্ভূক্ত করে শপথ নিলে পার্টির অপেক্ষাকৃত তরুণ, সংগ্রামী অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।[৬১] শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীনে কৃষক প্রজা পার্টির এক অংশ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেসের সহযোগীর ভূমিকা নেয় এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে হকের সমালোচনা করে।[৬২] ফজলুল হক এর ফলে ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখার ১৭ জন 'অননুগত সদস্যের' মধ্যে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কার সংঘটিত হয়, যা কৃষক প্রজা পার্টির এ্যাসেমব্লি শাখা ও মূল সংগঠন দুটোকেই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধা বিভক্তি করে।

---

৬০. Harun-or-Rahsid. The Foreshadwong of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947, (Dhaka 1987), 90.

৬১. P. Chatergeey "Bengal Politics and the Muslim Masses. 1920-1947".

৬২. ZH. Zahid (ed.) Jinnah Ispahani Correspondence, 1936-1948. (Karachi 1976), 26.

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা মনে রাখা ঠিক নয় যে, শুধু মন্ত্রিত্বের প্রশ্নে কৃষক প্রজা পার্টি বিভক্ত হয়। উভয় অংশের মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্যও ছিল। শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশ যেখানে পার্টির মূল আদর্শ ও কর্মসূচী উর্দ্ধে তুলে ধরার পক্ষপাতী, সেখানে ফজলুল হকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নমনীয় ও আপোষমুখী। যাহোক, কংগ্রেসের কঠোর বিরোধীতা এবং নিজ দলের বিভক্তি হকের জন্য এক বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি করলে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি সরাসরি মুসলিম লীগে যোগদান করেন।[৬৩]

কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রিসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮), কৃষিখাতক আইন (১৯৩৮), মহাজনী আইন (১৯৪০) এবং বঙ্গীয় চাকুরী নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায়িক ভিত্তিক বণ্টন বিধি (১৯৩৯) অন্যতম। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৩৭ সালের ৯ আগষ্ট যুক্তফ্রন্ট সরকার বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির মুক্তির প্রস্তাবক উত্থাপন করে। ১৯৩৭ সালের শেষ নাগাদ অধিকাংশ রাজবন্দি মুক্তি পায়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে মূখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক জমিদারি প্রথার উচ্ছেদকল্পে ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Bengal Tenency Act- Bill উত্থাপন করেন। বিলটি বিপুল ভোটে পাশ হয়।[৬৪] কিন্তু গর্ভনর জমিদারদের মানসিকতা লক্ষ্য করে বিলটি স্বাক্ষর করতে কিছুটা সময় নেন। ফলে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু ১৩০-১১১ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়। ১৯৩৮ সালেই গর্ভনর উক্ত বিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন।[৬৫] প্রজাস্বস্ত আইন পাশ করে জমিদারদের দেয় জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমিদারদের জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (Pre-emption), সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ আদায় বা 'আবওয়াব' প্রভৃতি বাতিল করা হয়। কুড়ি বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে মাত্র চার বছরের খাজনা পরিশোধ করে চাষীরা সেই জমি পুনরুদ্ধারের সুযোগ লাভ করে। বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% স্থির করা হয়। এই আইনে জমিদারদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের স্বত্বাধিকারীদের উপর খাজনা বৃদ্ধি দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

---

৬৩. *Star of India,* 1 September 1937, 1,8.

৬৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১৪২-১৪৭; Humayan Kabir, "Among The Bengal Peasants", *The Hindustan Times (*Magazine Section), 20 May, 1945, 4.

৬৫. Anderson to Linlithgow, 7 April 1937, *Bengal Governors Reports to Viceroy,* R/3/2/2, 3 in IOR.

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ করে সরকার সকল মহাজনের জন্য ট্রেড লাইসেন্স থাকা আবশ্যকীয় করে। এছাড়া, সুদের হারও স্থির করে দেয়া হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসব আইন কৃষকদের এক বৃহৎ অংশকে "ভয়াবহ ঋণের বোঝা এবং মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মহাজনদের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ আদায়" থেকে রেহাই দেয়। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার সরকারি চাকুরি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া দখলে। হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক চাকুরীতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে প্রণীত সম্প্রদায় ভিত্তিক বণ্টনবিধির অধীনে ৫০% পদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং এ নিয়োগনীতির যথার্থ প্রয়োগ তদারকির জন্য একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়।[৬৬]

নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে লীগে যোগদান করার পর ফজলুল হক এই মর্মে একটি তথ্য দেন যে, বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে হবে, কৃষক প্রজা পার্টিকেও সমর্থন করতে হবে।[৬৭] উল্লেখ্য, তিনি একই সাথে কৃষক প্রজা পার্টির নিজ অংশ এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষমতাসীন থেকে তিনি নিজ সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো কোন প্রয়াস গ্রহণ করেন নি। সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিস্তৃতির স্বার্থে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামগ্রিক পরিস্থিতির সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করেন। ফলে মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের হক সমর্থক কৃষক প্রজা পার্টির নেতা-কর্মীরা ক্রমান্বয়ে লীগে যোগদান করতে থাকে।[৬৮] শামসুদ্দিন ও আবদুল্লাহেল বাকীর নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির অপর অংশ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও কার্যত কংগ্রেসঘেঁষা একটি গ্রুপ হিসেবে আইনসভায় এর কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আইনসভার ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের তীব্র বিরোধীতার মোকাবেলা করতে গিয়ে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করেন।[৬৯]

---

৬৬. Shila Sen, *Muslim Politics In Bengal, 1937-1947,* (New Delhi 1976), 101-115;

৬৭. Muhammad Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal,* 1757-1947, (Dhaka 1978), 253-257.

৬৮. Shila Sen, *Muslim Politics,* 103.

৬৯. বঙ্গীয় সংসদে ফজলুল হকের বক্তৃতা, *Star of India,* 21 February 1939, 5.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭-১৯৪০ সময়কালে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন এবং লীগের জনসভা-কনফারেন্সে জোরালো বক্তব্য রাখেন। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ফজলুল হকের কখনো সুসম্পর্ক ছিল না। সচরাচর প্রশ্নে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও এক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্নতর। ফজলুল হক সর্বভারতীয় পর্যায়ে নেতা হতে চান নি বা তিনি এমন কোন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। তাঁর রাজনীতি মূলত ছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে।[৭০]

অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্কের স্থায়িত্বের ব্যাপারে তিনি সব সময় সন্দিহান ছিলেন। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পরবর্তীকালে তাঁর নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে বঙ্গীয় মুসলিম লগিের সহযোগীতা প্রদান ও জিন্নাহর সম্মতি এবং কিছুদিন পরে হকের লীগে যোগদান উভয়ই ছিল পারস্পরিক সুবিধা লাভে। বাংলায় মুসলিম লীগের বিস্তৃতি এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে এর মর্যাদা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় জিন্নাহর জন্য যেমন ফজলুল হকের সহযোগীতা প্রয়োজন ছিল, তেমনি কংগ্রেসের বিরোধীতা মোকাবেলা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হকেরও প্রয়োজন ছিল জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগীতার। তাই বলে লীগে যোগদানের পর হক তাঁর কৃষক প্রজা পার্টিকে বিলুপ্ত করেন নাই। সুদীর্ঘ ১৮০ বছর পর জননায়ক এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি দেশ শাসনের ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পেল।

মন্ত্রিসভার কর্মসুচি ঃ

এ, কে, ফজলুল হক ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করার পর জমিদার মহাজনদের নিপীড়ন থেকে কৃষক শ্রমিকের মুক্তি ও বাংলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিম্নের ১৫ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেন ঃ

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ, (২) জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকরণের লক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত আইন সংশোধন, (৩) সার্টিফিকেট আইনের নিষ্ঠুরতা হ্রাসকরণের জন্য জনদাবি আদায় আইন সংশোধন, (৪০ নিষ্ঠুর ঋণের ভার থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন, (৫) জনগণের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন সংশোধন, (৬) দরিদ্র জনগণের ওপর করারোপ না করে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, (৭) প্রশাসনের ব্যয় ভার হ্রাস, (৮) উৎপাদন সীমিত ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পাটের ন্যায্য মূর্ল প্রদান, (৯) স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে মজা নদী ও খাল পুনর্খনন,

---

৭০. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হকের উদ্বোধনী ভাষণ, ঐ, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯, ৭।
উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে একটি করে মোট দশটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে সারা প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) জনস্বাস্থ্য ও পল্লী পয়ঃপ্রণালীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, (১১) দমনমূলক আইন সংশোধন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দান, (১২) তামাক ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর থেকে কর হ্রাস করা (১৩) বেকার সমস্যার সমাধান, (১৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন ও বাংলায় একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকরণ, (১৫) কলকাতা পৌরসভা আইন সংশোধন।

প্রধানমন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রত্যেক বছর জাতীয় উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করেন। ১৯৩৮- ৩৯ সনে ৩,৫০ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ সনে ৪.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল সর্বোচ্চ। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৪৪% ভাগ বরাদ্দ করা হয় শিক্ষা খাতে। শিক্ষার পরেই কৃষি উন্নয়নে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় কলকাতা জুটমিল সমূহে শ্রমিক ধর্মঘট চলছিল। ১৯৩৭ সনের ৮ই এপ্রিল আইনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেন, "ধর্মঘটিদের উপর সরকারের আচরণের সমালোচনা বা তার সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমি দাঁড়াইনি। আমি দাঁড়িয়েছি শান্তির বৃষ্টি হাতে নিয়ে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনুরূপ ইচ্ছা নিয়ে আমার বিরোধীদলের বন্ধুরাও এগিয়ে আসুক এ কামনাই করি। আমি বলি, চলুন বন্ধুগণ, আমরা একটি ছোট্ট বৈঠকে মিলিত হয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলোচনা করি। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে চিরস্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছব তার কার্যকরণই হবে সরকারের মূলনীতি।" তিনি শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, "মেহনতী মজুর এবং মালিক, স্বার্থপর শোষক ও শোষিতের লড়াই স্মরণাতীতকাল থেকেই চলে আসছে। সুতরাং চলুন আমরা ভাবালুতার আশ্রয় না নিয়ে নিরপেক্ষ তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে আলোচনা এবং অহেতুক বাক বিতন্ডা বাদ দিয়ে দিয়ে এর মূল সমাধানের চেষ্টা করি"। বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ১লা এপ্রিল প্রবর্তিত হওয়ায় অনেকে এ দিনটিকে 'বোকাদিবস' বলে উপহাস করায়, তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলে, "আমরা শাসনকার্যের ব্যাপারে পরিষদের মতানুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করব। তা ছাড়াও আমরা যারা মহান জাতির প্রতিনিধিত্ব করছি সে মহান জাতির মতানুসারে চলার জন্য পবিত্র অঙ্গীকার করছি।" আইন পরিষদের প্রথম দিনের বক্তৃতায়ই ফজলুল হক গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও গণতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন।

শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করে কলকাতা এলবার্ট হলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু হক মন্ত্রিসভার সমালোচনা করেন। ফজলুল হক জওহরলাল নেহেরুর হুমকির জবাবে বলেন, "পন্ডিত নেহেরু

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়ই উঁচু ঘোড়ায় আরোহী হয়েছেন এবং আমি তাঁকে এটাই মাত্র বলতে পারি যে, যদি তিনি আমার এবং আমার সহকর্মীদের নিন্দা করতে থাকেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা ভ্রমণের সময় যেরূপ ঘটনার বিবৃতি করেছেন সেরূপ করতে থাকেন তাহলে তাঁর অশ্ব থেকে পতনই হবে অনিবার্য। তাঁর জানা উচিত যে আমি কারও ভয়ে মাথা নত বা কারও নিন্দায় বিচলিত হবার লোক নই।"[৭১]

১৯৩৭ সনের ৭ই মে হক মন্ত্রী সভার সমর্থনে কলকাতা এলবার্ট হলে কবি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি রাজনীতি ও সাহিত্য জগৎ থেকে নির্বাসন দন্ড গ্রহণ করে সঙ্গীতের দয়পান্তরে বাস করছি, কাজেই সভা সমিতিতে যোগ দেয়া আমার পক্ষে প্রায়ই আর সম্ভব হয় না। বিশেষ করে আজ আমার বাইরের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আমার পক্ষে প্রায়ই আর সম্ভব হয় না। বিশেষ করে আজ আমার বাইরের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কথা ছিল না, কারণ আজকের দিনেই আমি আমার প্রিয়তম পুত্রকে হারাই, তথাপি আজি এ সভায় আমি এসেছি, সে কেবল হক সাহেবের নামের টানে। হক হাসেব বহু পূর্বে দেউলিয়া হয়েছেন, তাঁর দেশ ও সমাজকে সর্বস্ব দিয়েই তো তিনি কাঙ্গাল সেজেছেন। তিনি দেউলিয়া বলেই তাঁর প্রতি আমাদের এ শ্রদ্ধা নিবেদন।" সভায় এক মন্ত্রিসভার বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের যতটুকু সুবিধা আদায় করা যায় তা করার দাবি জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে এ, কে, ফজলুল হক সারা বাংলা সফর করেন। ১৯৩৭ সনের ২৬শে জুন তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে নিজ বরিশালে আগমণ করেন। তাঁকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ১১ খানা মানপত্র প্রদান করা হয়। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দেশের রাজবন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি সর্বপ্রথম বাঙালী, তারপর আমার অন্য পরিচয়। বাঙ্গালী হিসেবে আমি বুঝি যে, এসব অন্তরীণ ও রাজনৈতিক বন্দী জাতীয় জীবনে একমাত্র ভরসাস্থল।" তিনি আশ্বাস দেন উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের পূর্বে গভর্নর সম্পর্কে তাঁর সরকারি নীতি ঘোষণা করেন।

ঐদিন বিকেলে ফজলুল হক টাউন হলে জেলা কৃষক প্রজা সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন অর্থ মন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার। ২৭শে জুন অশ্বিনীকুমার টাউন হলে কৃষক প্রজা সমিতির জেলা শাখার পক্ষে মানপত্রের জবাবে তিনি কৃষক প্রজার দাবি পূরণ করার আশ্বাস দেন।

---

৭১. Processdings of the Bengal Legislative council, May 1939.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সনের ১২ই জুলাই ঢাকাস্থ নর্থব্রুক হলে ঢাকা জেলা কৃষক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হক মন্ত্রীসভার একমাত্র প্রথম রায় ব্যতিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে এ,কে, ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। তিনি ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়িত না হয়ে পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকার উপদেশ দেন। ১৮ই জুলাই তিনি ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ পরিদর্শন করেন। ছাত্রদের মানপত্রের জবাবে তিনি বলেন, "আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে কোন পার্থক্য করি না। জীবনে সকল কাজে আমি এ আদর্শে পরিচালিত হয়েছি যে, সর্বাগ্র আমি বাঙালী, তারপর আমি মুসলমান।" তিনি ছাত্রদের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে অনুরোধ করেন। কারণ "সাম্প্রদায়িকতাই বর্তমান ভারতীয় সমাজের গোলযোগ সৃষ্টি করেছে।[৭২]

১৯৩৭ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে এ,কে, ফজলুল হক সভাপতি এবং আবুল কাশেম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ সনের ১৫ই জানুয়ারি তাঁর মন্ত্রিসবার সদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ ঝটিকা সফরে তিনি খুলনা আগমন করেন এবং সমবেত কৃষক জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "আইনের দ্বারাই আমরা প্রজার অবস্থার পরিবর্তন করবো। আইন ভঙ্গ করে নয়"। ঐ দিনই খুলনার মোল্লারহাটে ঘোষণা করেন, "প্রজা আন্দোলনের প্রধান কথা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান কৃষক প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ।" ১৬ই জানুয়ারি গোপালগঞ্জে তাঁকে ১৫ খানা মানপত্র দেয়া হয়। অভিনন্দনের জবাবে তিনি বলেন, "আমরা দেশের জন্য স্বাধীনতা চাই।

এ স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের স্বাধীনতা নয়, এ স্বাধীনতা দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশুর স্বাধীনতা।" উল্লেখ্য, ১৯৩৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ফজলুল হক ও হোসেন সোহরাওয়ার্দীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

কৃষক প্রজা পার্টির রাজনৈতিক স্লোগান ছিল, "বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, লাঙ্গর যার জমি তার।" ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগের সাথে কৃষক প্রজা সমিতির যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর তখন দু'বছর চলছে অথচ কৃষক প্রজাদের মুক্তির জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তখন কৃষক প্রজা সমিতির ৫৮ জন এম,এল, এ-র মধ্যে ২৮ জন ভিন্ন পার্লামেন্টারী দল গঠন করেন এবং ১৯৩৮ সনের এপ্রিল মাসে হক মন্ত্রি সভার বিরুদ্ধে আইন পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। কংগ্রেসও তা সমর্থন করেন। এসময় আবুল মনসুর আহমেদ, স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বাসায় যান। তাঁকে দেখে পি,সি রায় বললেন, "শোন মনসুর, রাজনীতি বুঝি না।

---

৭২. এস,এম, আজিজুল হক,শতাব্দীর কণ্ঠস্বর, ঢাকা ১৩৮৭ বাংলা সাল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ব্যাপারে নাকও গলাই না। কিন্তু আমার অনুরোধে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তোমরা যে অনাস্থা দিয়েছ, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার কর"। আবুল মনসুর আহমদ হক মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার কথা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তাঁর কথা শেষ হলে আচার্য প্রফুল্ল রায় তাঁর শীর্ণ হাত উঁচু করে বললেন, "তুমি যা বললে সবই রাজনীতির কথা। আমি রাজনীতির কথা বলছি না। আমি বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যতের কথা। সমস্ত রাজনৈতিক সত্যের উপর আর একটা বড় সত্য আছে। সেটা বাঙালী জাতির অস্তিত্ব। বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর। ফজলুল হক এই ঐক্যের প্রতীক। আমি কংগ্রেসীদের ভারতীয় জাতীয়তা বুঝি না। আমি বুঝি বাঙ্গালীর জাতীয়তা। এ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে একমাত্র ফজলুল হক। ফজলুল হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালী। সেই সঙ্গে ফজলুর হক মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙ্গালীত্বের সাথে খাঁটি মুসলমানের এমন অপূর্ব সমন্বয় আমি আর দেখি নাই। ফজলুল হক আমার ছাত্র বলে একথা বলছি না।[৭৩]

আবুল মনসুর আহমদ মন্তব্য করেছেন যে, স্যার পি, সি রায়ের কথাগুলো যেন কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে বের হচ্ছিল না। কথাগুলি যেন ভবিষ্যত বানীর মত বের হয়ে আসছিল কোন গায়েবী স্বর্গীয় মুখ থেকে।

মুসলিম লীগ যখন দেখলো তাঁদের পতন আসন্ন তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে কৃষি খাতক আইন সংশোধন, মহাজনি আইন ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে সম্মত হয়। তখন কৃষক প্রজা বিরোধী দল ও কংগ্রেস অনাস্থা প্রত্যাহার করে। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছে এ সংবাদ শুনে হাজার হাজার মানুষ আইন পরিষদ ঘিরে ফেলে। জনতা চায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রত্যাহার। হোসেন সোহরাওয়ার্দী এ, কে, ফজলুল হককে আইন পরিষদের বারান্দায় নিয়ে এসে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহারের সংবাদ দিলে জনতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 'শেরে বাংলা জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে থাকে।

১৯৩৯ সনের ২৬শে ডিসেম্বর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস রেঙ্গুনের পথে কলকাতা ত্যাগ করেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে গান্ধী, নেহেরু, মাওলানা আজাদ, জিন্নাহ ও ফজলুল হকের সাথে আলাপ করেন। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কলকাতার ঝাউতলার বাসভবনে পৌঁছে এবং ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন। ফজলুল হক ও ক্রিপসের মধ্যে এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং অদূর ভবিষ্যতে তার সমাধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা হয়।

---

৭৩. আবুল মনসুর আহমদ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ সনে ১৯শে ডিসেম্বর এ, কে ফজলুল হক সংবাদপত্রে এক বিবৃতির মাধ্যমে হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আদমশুমারিতে হিন্দু জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়ার সমালোচনা করেন। আগামী নির্বাচনে হিন্দু ভোটারদের সংখ্যা বেশী করে দেখাবার প্রবণতা মুখে তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুরা যাতে তাদের অবস্থা ফাঁপিয়ে তুলতে না পারে, সে জন্য সতর্ক হওয়ার আবেদন জানান।

১৯৩৯ সনের ২৯ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের ৫২তম অধিবেশন কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে নবাব ইয়ার কামাল জঙ্গের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন সোহরাওয়ার্দী, স্যার মোহাম্মদ সুলতান, ড. কে.খুদা, নবাব সর্দার ইয়ার জঙ্গ, ড. শহীদুল্লাহ, আলতাফ আলী প্রফেসর সেরওয়ানী, ড. পুরী, কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এ, কে ফজলুল হক ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শতকরা ৫০জন মুসলমান এবং শতকরা ৩০ জন তফসিলি হিন্দুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে হাত নেই। কোনে নমশূদ্র ছাত্র হোস্টেলে ভর্তি হতে পারে না। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ সমর্থন করেন।

১৯৩৭ সন থেকে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর এক শ্রেণীর হিন্দু জুলুম করতে শুরু করলেও কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়। এ সময় বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে তিনি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাস্থ লোকজনকে এব্যাপারে দায়ী করে বক্তৃতা ও পত্রিকায় বিবৃতি দেন। দেশের এই ধরনের পরিস্থিতির মুখে তাঁর মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ১৯৩৮ সনে ১৭ই এপ্রিল কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলীম লীগের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে যে ভাষণ দেন, তা সমালোচিত হয়। ভাষণে ফজলুল হক বলেন, "পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজ শাসন মুসলমানদের ওপর নানা অবিচার করেছে। এখনও সেই অবিচার চলছে। এমনকি কমুউনাল এওয়ার্ডে মুসলমানদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা পর্যুদস্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অবস্থায় যদি পানি পথের ও থানেশ্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে মুসলমানেরা নিশ্চয়ই তপাদের পুরুষদের মত গৌরবজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।"

একই ভাষণে তিনি কংগ্রেস ও বাংলার মন্ত্রিসভার তুলনা করে বলেন, বাংলার মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখতে পেরেছে। আর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের মুসলমানেরা অত্যাচারিত হচ্ছে। বাংলার কৃষক প্রজার দূরবস্থা দূরীকরণে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হলেও বিহারের কৃষকদের দুর্দশা দূর করার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি।

১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সহায়তায় মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলেও তিনি উদ্বিগ্ন হন। তিনি কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

বসু ও কিরণ শঙ্কর রায় ও হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামা প্রাসাদ মুখার্জির সাথে মিলে বাঙালী জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের চাপে বাংলার কংগ্রেস এ ব্যাপারে সাড়া দিতে পারেনি।

ফজলুল হক জওহরলাল নেহেরুকে নিয়ে কয়েকটি উপদ্রুত এলাকা প্রদর্শনের প্রস্তাব দেন। ফজলুল হক ১৯৩৯ সালের ৩০শে অক্টোবর নেহেরুকে যে চিঠি লেখেন, তাতে যেসব প্রস্তাব পাঠান, নেহেরু সেসব ব্যাপারে তদন্ত করতে সম্মত হন। বৃটিশ সরকার দাঙ্গার ঘটনাগুলো তদন্তের জন্য রয়াল কমিশন নিয়োগ করায় জিন্নাহর পরামর্শে এ, কে ফজলুল হক দাঙ্গার অভিযোগসমূহ রয়াল কমিশনে প্রেরণ করেন। ফলে হক নেহেরু প্রস্তাবিত তদন্ত কার্যত স্থগিত হয়ে পড়ে।

১৯৩৭ সনে ফজলুল হক যখন মন্ত্রী হন, তখন জেলে পচে মরছেন ২৭০০ রাজবন্দী। আন্দামানের বন্দীরা দেশে ফিরে আসার জন্য অনশন করেন। অনশনরত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবিতে কলকাতা টাউন হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভায় উপস্থিত মহাত্মা গান্ধীও ছুটে এলেন কলকাতায় এবং প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাযিম উদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ফজলুল হক সংসদে ঘোষণা করলেন, বন্দীরা তাঁর আপনজন এবং তাঁদের শীঘ্রই মুক্তি দেয়া হবে। এই ঘোষণার পর প্রায় সকল রাজবন্দী মুক্তি পেলেন।[৭৪]

কৃষক প্রজা পার্টির কার্যাবলী ঃ

শিক্ষা সংস্কার ঃ এ, কে ফজলুল হকের রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনগ্রসর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও কৃষক প্রজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি শিক্ষাকে সর্বাগ্র স্থান দিতেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি শিক্ষা দপ্তরের ভার নিজ হাতে রাখেন। ১৯৩০ সনে প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ হয়েছিল; কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি জরিপ চালান। তাতে দেখা যায়, ৭৫ হাজার বর্গমাইল বিশিষ্ট অবিভক্ত পল্লী অঞ্চলে ৫ কোটি লোকের বসবাস। ৫ হাজার ইউনিয়নে ১ লক্ষ ১০ হজার গ্রাম। ৭২ হাজার গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ৫০ লক্ষ স্কুলগামী ছেলে-মেয়ের জন্য গ্রাম বাংলায় ৪৯০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এক মাইলের মধ্যে অথবা ২০০০ অধিবাসীর জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি একটি প্রকল্প চালু করেন। দরিদ্র কৃষকদের ওপর কর ধার্য্য না করে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক জেলায় স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ড. জেকিন্সকে সভাপতি করে তিনি প্রাথমিক বয়স্ক শিক্ষা কমিশন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার জন্য 'মওলা বকস' কমিটি গঠন করেন।

---

৭৪. Processdings of the Bengal Legislative Council March, 1937.

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সুপারিশে জুনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলার সার্জন জেনারেলকে সভাপতি করে তিনি কমিটি গঠন করেন।

১৯২০ সনে স্যাডলার কমিশন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ১৯২৪ সনে শিক্ষা মন্ত্রী থাকাকালে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তৈরীর চেষ্টা তিনি করেছিলেন; কিন্তু সময়ের জন্য তা কাউন্সিলে পেশ করতে পারেননি। দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও এ ব্যাপারে অগ্রগতি না হলে ১৯৩৭ সনে মন্ত্রী হয়ে আইন পরিষদে পেশ করার জন্য তিনি পূণরায় খসড়া বিল তৈরী করেন এবং কলকাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আসাম সরকারের পরামর্শ চেয়ে পাঠান। ১৯৩৭ সনের ২৬ শে নভেম্বর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা এ ব্যাপারে মন্তব্য করে যে, এর ফলে একদিন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি হবে। আনন্দ বাজার বলে, এ বিল একশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধবংশ করবে। বলা হয়, বোর্ডের মোট ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন থাকবে মুসলমান। এ জাতীয় প্রশ্ন তুলে হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য গভর্নরকে অনুরোধ জানানো হতে থাকে। ফজলুল হক পত্রিকায় প্রকাশিত এসব সমালোচনার জবাবে ১৯৩৭ সনের ৩০শে নভেম্বর এক বিবৃতি দেন। তিনি তাতে বলেন, ১৮ বছর পূর্বে স্যার আশুতোষ মুখার্জির মতো, সদস্য বিশিষ্ট স্যাডলার কমিশন বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, বিশেষ করে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়ার জন্য স্কুল সমূহকে পরীক্ষার্থী পাঠাবার মঞ্জুরী দেবার কাজে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার জোরালো সুপারিশ করেছিল। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফজলুল হক বর্ণ হিন্দু, যারা মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ, যারা শূদ্রদের হোস্টেলে আসন দেয় না, তারাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করচে এবং তিনি তাদের সাম্প্রদায়িক বলে সমালোচনা করেন। বাংলার শিক্ষানীতির ওপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃত্ব করছে বর্ণ হিন্দুরা। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫২ জন মুসলমানও ৩০ জন তফসিলির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে কোন হাত নেই। কলবাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করার ও একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা উচিত। কংগ্রেস ও মুসলিম লগের বিরোধীতার জন্য ফজলুল হক মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করতে পারেনি। ১৯৭৪৭ সনের পর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ, কে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে শত শত উচ্চ ইংরেজী (বর্তমান মাধ্যমি) ও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষক্ষেত্রে নারী সমাজ সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। তিনি বেসরকারী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান ও সুযোগ বৃদ্ধি করেন। মহিলাদের, বিশেষ করে মুসলমান মহিলাদের জন্য পৃথক কলেজ না থাকায় উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হতো। তখন সামাজিকভাবে মুসলমান সহশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। তাই ফজলুল হক ১৯৩৯ সনে 'লেডি ব্রাবোর্ন' কলেজ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা কনের। লেডি ব্রাবোর্ন ছিলেন বাংলার গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্নের স্ত্রী। তিনি শামসুন নাহার মাহমুদকে কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন। বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত রোকেয়া শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হলে ফজলুল হক স্কুলটি সরকারিকরণ করেন। ফজলুল হক ঢাকা ইডেন স্কুলের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করেন। তখন ইডেন স্কুল সচিবালয়ে অবস্থিত ছিল, এজন্য সচিবালয়কে এখনো ইডেন বিল্ডিং বলা হয়। বরিশালে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মেয়েদের কোনো হোস্টেল ছিল না। তিনি তাঁর বরিশালের বাসভবনে তাঁর মাতার নামে সাইদুন্নেসা গার্লস হোম স্কুল ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি সকল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আর্থিক বরাদ্দ করেন এবং মেয়েদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করেন। টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ার পন্নী পরিবারের উদ্যোগে ও প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর প্রচেষ্টায় করটিয়া সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা বিহার আসামের মধ্যে মুসলমানদের জন্য এটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত কলেজ। ফজলুল হক কলেজ উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯৩৯ সনের ১৫ই এপ্রিল ফজলুল হক করদিয়া সাদত কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাযিম উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন খান, খাজা শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। কৃষক প্রজা সমিতির নেতা মাওলানা ইদ্রিস আহমেদ তাঁর গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ফজলুল হক বরিশালের হাশেম আলী খান এম, এল, এ-কে পরিদর্শনের জন্য আদিনা গ্রামে প্রেরণ করেন। তাঁর সুপারিশে ফজলুল হক ১৯৪০ সনে কলেজের অনুমোদন দেন। তাঁর নামে কলেজের নামকরণ করা হয় 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ'। ১৯৪০ সনে উপ নির্বাচনে ঢাকা এলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য এ,কে, ফজলুল হক মুসলিম হোস্টেল নির্মাণ করেন।

466250

তাঁর সময় কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তিনি বরিশাল বি এম কলেজ ছাত্রদের থাকার জন্য মুসলিম ও হিন্দু হোস্টেল নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি বিদেশ গমনের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় প্রথম মুসলিম মহিলা ফজিলাতুননেসা বৃত্তি লাভ করে বিলেতে গমন করেন। তিনি তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্যও বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ গাঙ্গলী তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গলী ও মাতা গঙ্গাদেবীর নামে কলেজের নামকরণ করেন হরগঙ্গা এসময় ফজলুল হকের জামাতা এ এইচ ওয়াজিব আলী মুন্সিগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৪০ সনের ১লা জুলাই পৈতৃক গ্রাম চাখারে ফজলুল হক কলেজে ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর নামে কলেজের নাম হয় 'চাখার ফজলুল হক কলেজ'। কলেজ ভবন নির্মাণে ফজলুল হকের অর্জিত প্রায় দু'লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বরিশাল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হাশেম আলী খান কলেজ তহবিলে জেলা বোর্ড থেকে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। কলেজ ভবন নির্মাণ করেন ফজলুল হকের আবাল্য বন্ধু আফছার উদ্দিন তালুকদার। কলেজের প্রথম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পার্শ্ববর্তী খলিসাকোটা গ্রামের শ্রী উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯৪০ সনের ২৭ নভেম্বর বাংলার গভর্নর জন হার্বার্ট কলেজ উদ্বোধনের জন্য চাকার গ্রামে আগমন করেন। চাকার গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে মসজিদ ও মাদ্রাসা, বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। চাকার গ্রামটিকে তিনি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলেন। এখানে হাসপাতাল, সমবায় ব্যাংক, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুল হক ১৯৪১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতায় সরকারি আর্ট কলেজ উদ্বোধন করেন। তাঁর সময় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা বিভাগের সম্প্রসারণ করা হয়। তিনি অনেক স্কুল পরিদর্শক ও সহ পরিদর্শক নিয়োগ করেন। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তার লাভ করায় শিক্ষা বিভাগে অনেক কর্মচারী চাকরিও লাভ করেন।

কৃষি শিক্ষা

এ কে ফজলুল হকের কৃষক মুক্তি কর্মসূচী জমিদারী ও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কৃষি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শক্তিশালী করার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশে কৃষি ইনষ্টিটিউট বর্তমান তেজগাঁও কৃষি কলেজ ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সনের ১৬ ডিসেম্বর তেজগাঁও কৃষি ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকালে তিনি যে ভাষণ দেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,

ঢাকা কৃষি ইনষ্টিটিউট এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে এসে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা ইতোমধ্যে শুনেছেন যে মিন্টো মর্লো সংস্কারের অধীনে আইন সভায় সদস্য হিসেবে এরূপ একটি ইনিষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমার চিন্তায় ছিল। প্রায় ২০ বছর পূর্বে সরকারের নিকট ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ অতিসত্ত্বর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে আমি আইন সভায় প্রস্তাব পেশ করি। উক্ত কলেজ পরিশেষে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। আজকের বিকেলে যে অপূর্ব অনুষ্ঠানের সাথে আমরা জড়িত তা অনেক বছর পূর্বের ঘটনাবলী আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের আমি যা কিছু দেখছি, যা কিছু শুনছি তা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনকে পরিপূর্ণ করেছে। তিনি আমাকে আজ একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন। বিশ বছর পূর্বে আমি তাত্ত্বিক চিন্তা করেছিলাম। আজ সর্বশক্তিমানের করুণায় আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অনেক বিষয় স্মরণীয়। ইনিষ্টিটিউট স্থাপনের অগ্রগতি অতি মন্থর ছিল। আমি আনন্দের সাথে বলছি যে এতদিন পরিকল্পনাটি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির বাইরে ছিল না।

আমার প্রস্তাবের আলোকে ১৯১৯-২০ সনে ভারত সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৭৫ হাজার টাকার মূল্যের ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯২০ সনে ভারত সরকার এ প্রকল্পের জন্য ১০,০২,৫০০/= টাকা বরাদ্দ করে, কিন্তু বাংলা সরকার বিশেষ কারণ টাকা ব্যয় করতে না পারায় তা প্রাদেশিক রাজস্ব খাতে

Dhaka University Institutional Repository

চলে যায়। ১৯২৫ সনে কৃষি অধিদপ্তর ইনিষ্টিটিউটের জন্য পূর্ণ প্রকল্প ভবনের প্রাক্কলিত ব্যয, পাঠ্যসূচি বিধির খসড়া পেশ করেন। মেট্রিক অথবা আইএসসি পাশ ছাত্রদের ভর্তি করা হবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ফলে প্রকল্পে বিলম্বিত হয়। ১৯২৭ সনে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু কৃষি বিষয়ক রয়াল কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত ভর্তির মান উন্মুক্ত থাকবে। রয়াল কমিশন ভর্তির জন্য সুপারিশ করে এবং তা নীতিগতভাবে ১৯৩০ সনে গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য প্রকল্পটির অগ্রগতি হয়নি।

বাংলায় উচ্চ কৃষি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সবসময় অনুভব করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষি উন্নয়নের প্রশ্নটি ভীষণভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষভাবে কার্যাবলী পরিচালনা যোগ্য লোকের অভাবের ফলে তারা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বস্তুত ঢাকায় একটি কৃষি ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজ নিয়ে এগিয়ে যায়। তারা ঢাকায় একটি ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। গত বছর কৃষি অধিদপ্তর ৫,৬৬,৪০০/= টাকার সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করে। তার মধ্যে ভবন নির্মাণের জন্য ৪,৮৬,০০০/= টাকা, যন্ত্রপাতির জন্য ৮,০৪,০০০/= টাকা এবং চলতি ব্যয়ের খাতের বছরে ৮২,১০০/= টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটি প্রদেশের কৃষি চাকুরীর পদে নিয়োগের মান গুণগত অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ইনিষ্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের সাথে অর্ন্তভূক্ত হওয়ার বিতর্কিত প্রশ্নটি এখনও নিষ্পন্ন হয়নি। প্রশ্নটি আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভার প্রস্তাব করা হয়েছে। যাহোক প্রথমেই পরিস্কার করে বলা প্রয়োজন যে, উচ্চ কৃষি শিক্ষার সুযোগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধিভূক্ত তার ব্যবস্থা না করে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত জনশক্তি সরবরাহ করা ইনিষ্টিটিউটের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক ভাবে ইনিষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য হবে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন।

সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষির বিভিন্ন দিকে সঠিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাবেক কৃষিমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর চতুর্থ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংশ হল ঢাকায় কৃষি ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা হল আজ যে ভবনের ভিত্তি স্থাপন করছি তা আগামী আর্থিক বছরে সমাপ্ত করতে হবে যাতে সে বছরের শেষ দিকে ক্লাশ শুরু করা যায়। প্রকল্পের অন্যান্য দিকগুলো হলো গবেষণা পরীক্ষার জন্য উন্নত সুযোগ, প্রদর্শনী ও প্রচারের জন্য অনুদান ও কর্মচারী বৃদ্ধি যার লক্ষ্য হবে অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ও পরীক্ষার ফলাফল কৃষকদের গৃহে পৌঁছে দেয়া, গবেষণাও পরীক্ষার ফলে যে নতুন পদ্ধতি বেড়িয়ে আসবে তা গ্রহণ করা, গবাদি পশুর উন্নতকরণ এবং কৃষি উৎপাদনের বিপণনের জন্য উন্নত সুযোগ সৃষ্টি করা। কৃষি অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কিছু অতিরিক্ত গবেষণা কর্মচারী অনুমোদন করেছে। আজ যে গবাদি পশু ইনিষ্টিটিউট উদ্বোধন করতে যাচ্ছি তা গবেষণার সুযোগ উন্নয়নে একটি

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রদর্শনী কর্মচারীর জন্য অনুদান উভয় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে। সম্প্রতি বহু সংখ্যক ইউনিয়ন বোর্ড খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকন্তু সরকার কয়েকটি সুদূর প্রসারী প্রকল্পের বিবেচনা করেছে। এগুলো হলো, গবাদিপশু রোগ নিরোধ কর্মচারী, পশু পালন কর্মচারী যারা বর্তমানে ভারত সরকারের অনুদানে অধীনে নিয়োজিত তাদের প্রাদেশিক ও বৃদ্ধিকরণ পাটের বাজার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, একারণে কৃষি উৎপাদন বাজার বিল এবং অন্যান্য পদক্ষেপ সমূহ।

প্রকল্প সমাপ্তির সকল স্তরে মন্ত্রণালয় মহামান্য লর্ড ব্রাবোর্নের নিকট থেকে যে অনেক সাহায্য ও উৎসাহ এবং আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি যে অব্যর্থ সহানুভূতি লাভ করেছি তা জনসম্মুখে স্বীকার না করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারছি না। প্রদেশের গভর্নর এবং কৃষকদের বন্ধু ও হিতৈষী হিসেবে তিনি কৃষক সমাজের মঙ্গলের জন্য অনেক প্রমাণ রেখেছেন। এ মহান প্রদেশের উন্নতি নির্ভর করছে কৃষকদের সমৃদ্ধির ওপর। ঢাকার নওয়াব বাহাদুরের প্রকল্পের প্রত্যেক স্তরে কঠোর পরিশ্রম করে কাজ সমাপ্ত করার জন্য দেশ তার নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। প্রদেশের সম্পদ উন্নয়নের ইতিহাসের নবযুগের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি মনে করছি যে বহু বছরের যাত্রাপথ ধরে বাংলার জনগণের জন্য অঙ্গীকার ও আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকতে পারি। আমাদের জনগণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু করা এবং চারদিকে যে সহানুভূতি সহযোগীতা দেখেছি তাতে আমার সামান্যতম অবিশ্বাস নেই যে আজ আমরা যে সূচনা করেছি অদূর ভবিষ্যৎ একমাত্র বাংলা নয় ভারতও এর কীর্তির জন্য গর্ব করবে। ভারতের এ অংশে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী কৃষক গড়ার প্রচেষ্টায় বাংলার প্রশাসন যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার অধিকাংশের সমাধান আমরা এই প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে সমাধান করবো।[৭৫]

ভূমি সংস্কার

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো কৃষক-প্রজার ভাগ্যোন্নয়ন। গরীব কৃষক প্রজাবর্গের ওপর জমিদারের যুগ যুগ ধরে পরিচালিত নিপীড়নমূলক ক্ষমতা বাতিলের জন্য আইনসভার উভয় পরিষদে ১৯৩৮ সনের ১৮ই আগস্ট বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন পাস হয়। ১৯৩৭ সনের ২৭শে আগস্ট থেকে খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কিত উক্ত আইনের সকল ধারা ১০ বছরের জন্য স্থগিত করা হয়। নদী ভাঙ্গনের পর ২০ বছরের মধ্যে চর সৃষ্টি হলে মালিকরা তাদের জমি ফেরত পাবেন এবং তাদের ৪ বছরের খাজনা প্রদান করতে হবে। জমিদারদের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা বাতিল করা হয়। বন্ধকি জমির মেয়াদ ১৫ বছরের বেশি হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় বন্ধক বাতিল বলে গণ্য হবে। সুদের হার সাড়ে বারো থেকে সোয়া ছয় করা হয়। কোনো জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে আবোয়াব করলে আইনত দন্ডনীয় হবে। সংশোধনের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী অন্যান্য বিধি বাতিল করা হয় এবং তাদের মুক্তির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

---

৭৫. মেমোরেবল স্পীসেস অফ শেরে বাংলা, এ,কে জয়নাল আবেদীন, ১৯৮২, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সনে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে শেরে বাংলা জমিদারদের কৃষক প্রজা পীড়নের লাগামহীন ক্ষমতা বন্ধ করে দেন। ১৯৪১ সনে মর্টগেজ ও বাকি খাজনা আদায় সম্বন্ধে প্রজাদের সুবিধা দেয়া হয়।

বঙ্গ চাষী খাতক আইন প্রথম ১৯৩৫ সনে পাস হয় এবং ১৯৩৬ সনে বাংলার গভর্নর এন্ডারসহন তা অনুমোদন করেন। চাষী খাতক আইনের মেয়াদ ছিল ৫ বছর এবং ১৯৪১ সনের ৮ই এপ্রিল এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ১৯৩৫ সনে চাষী খাতক আইনে অনেক ত্রুটি থাকায় কৃষক সমাজ এ আইন দ্বারা উপকৃত হয়নি। সারা বাংলায় মাত্র কয়েকশ ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয় এবং সেখানে কৃষকদের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৩৯ সনে ফজলুল হকের চেষ্টায় চাষী খাতক আইনের প্রথম সংশোধনী বোর্ড এনে ঋণ সালিশি বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয়। ১১ হাজার ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণ মুক্ত করা হয়।

ফ্লাউড কমিশন

কৃষক প্রজা সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বিনা ক্ষতি পূরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। এ,কে, ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের প্রথম বছরে মুসলিম লীগের অসহযোগিতার জন্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারা যায়নি। বাধ্য হয়ে কৃষক প্রজা সমিতির ৫৮ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন বিরোধী পার্লামেন্টারী দল গঠন করে এবং তাঁরা কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার চেষ্টা করে।

এই সংকটময় মুহূর্তে ড. স্যার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর প্রিয় ছাত্র ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যাতে অনাস্থা পেশ করা না হয়, তার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি কংগ্রেস দলকে অনাস্থা প্রস্তাব আনার উদ্যোগ থেকে বিরত করেন। ওদিকে মুসলিম লীগ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরোধিতা না করার অঙ্গীকার করে চিরস্থায়ী প্রথা উচ্ছেদের জন্য এ,কে,ফজলুল হকের সরকার ১৯৩৮ সনের ২রা এপ্রিল বাংলার বর্তমান ভূতি তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৮ সনের ৫ই নভেম্বর ভূমি রাজস্ব বিভাগের ২২৭১৫ নম্বর স্মারকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হয়।

১. স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড, চেয়ারম্যান
২. স্যার বিজয় চাঁদ মহতাব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
৩. খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, এম, এল, এ
৪. খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, এম, এল, এ
৫. এস, এস, মসিব, বার অ্যাট ল
৬. খান বাহাদুর এম, এ মোমেন
৭. স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি

Dhaka University Institutional Repository

৮. ড. রাধাকুমুদ মুখার্জি, এম, এল, এ

৯. রাজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

১০. স্যার, এফ, এ সচসে।

এস,এস, মসি কমিশনে যোগ দেননি এবং মন্মথনাথ মুখার্জি পদত্যাগ করেন। তাঁদের স্থলে আবুল কাসেম নূরুউদ্দিন আহমেদ ও অনুকূলচন্দ্র দাস এম,এল, এ কে কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এম, ও কার্টারকে কমিশনের সেক্রেটারি এবং হেচবার্নওয়েলকে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হয়। ফ্লাউড কমিশনের তদন্তের প্রধান বিষয় ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোকে বাংলার বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করা। রাজস্ব মন্ত্রী বি,পি, সিংহের সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৯৩টি প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ, মধ্যস্বত্ব বিলোপ ও জমিদারি দখল, কৃষি জমির ৮০ ভাগ আয় জমিদাররা আত্মসাৎ করে কি না, কৃষি ঋণ, মহাজনি আইন, চাষী খাতক আইন প্রভৃতি প্রশ্নমালার অর্ন্তভূক্ত ছিল। প্রশ্নপত্রগুলি মতামতের জন্য জমিদার সংঘ, বার সমিতি, কৃষক প্রজা সমিতি, কৃষাণ সভা, রাজস্ব কর্মচারী, জমিদার ও কৃষক প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কমিশন বাংলার কয়েকটি জেলা, বাংলার বাইরে মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশ পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার ভূমি ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করেন। কমিশন কৃষক নেতা, জমিদারদের প্রতিনিধি ও রাজস্ব কর্মচারী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। কয়েক দফা বৈঠকের পর কমিশন ১৯৪০ সনের ২১শে মার্চ ষষ্ঠ খন্ডে তাঁদের ঐতিহাসিক 'ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট' বাংলার সরকারের কাছে দাখিল করেন। জমিদারদের প্রতিনিধি বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মহতাব, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. রাধা কুমুদ মুখার্জি ও স্যার এফ, এ, সচসে কমিশনের রিপোর্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ফ্লাউড ও অধিকাংশ সদস্য ফজলুল হকের প্রভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবসানের সুপারিশ করেন। রিপোর্টের প্রথম খন্ডে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, জমিদারী উচ্ছেদ ও দখল, খাতক আইন, মহাজনি আনি ও বাংলার অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত ও চতুর্থ খন্ডে জমিদারদের ৬ম খন্ডে সরকারী কর্মচারী এবং ষষ্ঠ খন্ডে বিভিন্ন সংগঠনের প্রশ্নোত্তর ও মৌখিক স্বাক্ষী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ফ্লাউড কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বাংলার কৃষকদের শোচনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেছে। চিরস্থায়ী চিত্র তুলে ধরেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের অত্যাচার আর শোষণের ফলে তারা গরীব হতে বাধ্য হয়েছে। পূর্বে তারা অনেক ভালো ছিল। জমিদার শ্রেণী উচ্চহারে রাজস্ব ও আবোয়াব আদায় করে। কৃষির উন্নতির জন্য তাদের কোনো অবদান নেই। আলোচ্য সময়ে বাংলার একটি ৬ সদস্যের মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের বাৎসরিক গড় আয় ছির ৪৫০

Dhaka University Institutional Repository

টাকা এবং গড়ে ব্যয় হতো ৫০০ টাকার উর্দ্ধে। বাৎসরিক ব্যয় বহন করে তাকে মহাজনদের কাছ থেকে ধার করতে হতো। ১৯৩৯-৪০ সনে গ্রামের ধনী কৃষক পরিবারের গড় বার্ষিক আয় ছিল ৪৫০ টাকা এবং তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১০ জন। অধিকাংশ কৃষকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ছিল এবং তাদের মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হতো। চক্রবৃদ্ধি হারে তাদের ঋণ করতে হতো এবং ঋণের দায়ে তাদের কৃষি জমি ও ভিটা-বাড়ি বিক্রি হয়ে যেত।

ফ্লাউড কমিশন বাংলার কৃষকদের অর্থনীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে, বাংলার কৃষক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, ঋণ করে বেঁচে থাকে এবং মৃত্যুর সময় ছেলে-মেয়েদের জন্য রেখে যায় ঋণের বোঝা। কমিশনের মতে, কৃষকদের এ দূর্দশার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। তাই কমিশন সুপারিশ করেছিল, "ভূমি রাজস্ব কমিটি তদন্ত করে সিদ্ধান্ত করলো যে, ১৭৯৩ সনে যে সকল কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে আজ এত ত্রুটি দেখা দিয়েছে যে, এ প্রথা টিকে থাকতে পারে না। কোন আধাআধি পদক্ষেপ দ্বারা এ ত্রুটিগুলো দূর করা যাবে না। মধ্যস্বত্ব ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার সরকারকে দখল করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং কৃষকদের সরকারের অধীনে সরাসরি ভূমির মালিক করতে হবে। কমিশনের মতে, এ প্রস্তাব বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবে এবং প্রদেশের সামাজিক কাঠামো দারুণভাবে আঘাত করবে। কয়েক বছর ধরে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় সম্পদ নিয়ে সর্বাত্মকভাবে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে। কমিশন উর্ধ্বহারে ১০ গুণ এবং নিম্নহারে ৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী দখল করার সুপারিশ করে।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সারা ভারতে জমিদারি প্রথার মূলে কঠোর আঘাত করে। এই অবস্থার মুখে ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলার জমিদার সম্প্রদায় ফজলুল হককে পদচ্যুত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলেছিল। জমিদার শ্রেণী তাঁকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত হলে জলপাইগুড়ির জমিদার নবাব মোশাররফ হোসেন পরিষদ কক্ষে চিৎকার করে বলেছিলেন, "প্রয়োজন হলে আমার সর্বস্ব বিক্রয় করেও ফজলুল হককে গদিচ্যুত করব"। মুসলিম লীগ, জমিদার শ্রেণী, সর্বোপরি, বৃটিশ সরকারের বিরোধিতার জন্য ফ্লাউড কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে ফজলুল হক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারেননি। তখন প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা সীমিত ছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমি দখল করতে হলে গর্ভনর ও গর্ভর জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। এ সকল কারণে দেশ বিভাগের পূর্বে জমিদার উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫০ সনে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস করে। ১৯৫৪ সনে এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জমিদারি উচ্ছেদ শুরু করলেন এবং আওয়ামী লীগের সময় (১৯৫৬-৫৮) জমিদারি দখলে কাজ সমাপ্ত হয়।[৭৬]

---

৭৬. রিপোর্ট অফ দি ল্যান্ড রেভিনিউ অফ বেঙ্গল - স্যার ফ্র্যান্সিস ফ্লাউড, খন্ড ১-৬, কলকাতা, ১৯৪০।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের কৃষক সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্যে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিমূল ছিল জমিদারি প্রথা এবং এই প্রথার সাথে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা ছিল। তাই দেখা যায় বেশির ভাগ উকিল, কর্মচারী, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন জমিদারি প্রথা বিলুপ্তর বিরুদ্ধে। এ, কে, ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজা পার্টি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার অবসান ও কৃষকদের মুক্তি চেয়েছিলেন। ফ্লাউড কমিশন একমাত্র জমিদারি প্রথা নিয়ে আলোচনা করেননি মহাজনি প্রথা, সুদ, ঋণ সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করেছে। এ রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ফজলুল হক মহাজনি আইন, চাষী খাতক আইন সংশোধন ও কৃষকদের মধ্যে সহজে সহজে ঋণ বিতরণের জন্য সবমায় সমিতিকে সুসংগঠিত করেন। ফ্লাউড কমিশনের প্রতিবেদন বাংলার নিপীড়িত কৃষক প্রজার হাজার বছরের শোষণ বঞ্চনার মহাকাব্য।

মহাজনি আইন

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এ, কে, ফজলুল হক বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারকে ঋণ মুক্ত করার জন্য ১৯৪০ সনে মহাজনি আইন পাস করান। এই আইনে সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। চক্রবৃদ্ধি সুদ বন্ধ করা হয়। সাধারণ সুদের হার বন্ধক রেখে ঋণ করলে সুদের হার শতকরা ৮ টাকা এবং বিনা বন্ধকে ঋণ করলে সুদের হারের ১০ টাকার বেশি হতে পারবে না।

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায়। তারাই সংখ্যাগুরু। কৃষকদের জমির খাজনা হ্রাস ও মহাজনদের নিপীড়ন বন্ধ করলেই মুক্তি আসবে না। এ জন্য প্রয়োজন কৃষিজ্ঞানের বিস্তার সাধন ও সমস্যা সমাধানের জন্য আদর্শ কর্মসূচি। এ, কে ফজলুল হক কৃষিক্ষেত্রে নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটান। তিনি কৃষি শিক্ষা, প্রদর্শনী খামার, প্রচার, বাজার, ঋণ প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থান প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আধুনিক কৃষি বিস্তারের লক্ষ্যে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনার দৌতলপুরে কৃষি ইনিষ্টিটিউট ও ঢাকায় ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী এ, কে ফজলুল হক তেজগাঁও কৃষি ইনিষ্টিটিউট এর (কৃষি কলেজ) ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯১৮ সনে ফজলুল হক আইনসভায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বছরের তাঁর সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি প্রধান মন্ত্রী হয়ে ঢাকার নবাবদের প্রদত্ত ভূমিতে ডেয়ারি ফার্ম ও কৃষি ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।

এ, কে, ফজলুল হক মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের ঋণ মুক্ত করে সরকারি ঋণের ব্যবস্থা করেন। তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা না করলে পূণরায় মহাজনদের স্মরণাপন্ন হতে হবে তাদেরকে; তাই তিনি ঋণ, ত্রাণ ও টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৮-৩৯ সনে ৫৬,৪৮,৬১৯/= টাকা কৃষি ঋণ বণ্টন করা হয়। তিনি কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ সরবরাহ করে শস্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সনে পাট অধ্যাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জারি করা হয়। পশু সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গবাদি পশু আমদানি, পশু পালন বিদ্যালয় ও কলেজের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। কৃষকদের চাসের প্রধান উৎস গরু-মহিষ। তাই গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন। গবাদি পশু চিকিৎসার জন্য পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ভরাট নদী ও খাল পূর্ণ খনন এবং পুকুর সংরক্ষণ করে সেচ ব্যবস্থা উন্নত করেন। কৃষি ও জনগণের স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু ছিল কচুরিপানা। তিনি তাঁর মন্ত্রিসবার সদস্যদের নিয়ে ১৯৩৮ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কচুরিপানা নির্মুল সপ্তাহ পালন করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক ইউনিয়নে আদর্শ কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিও তিনি গ্রহণ করেন। কৃষকদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রচারের জন্য জেলা ও মহকুমা কৃষি প্রপাগান্ডা অফিসার নিয়োগ, ভ্রাম্যমান টকি সিনেমা প্রদর্শন এবং পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সমবায় আইন

এ, কে ফজলুল হক উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯০৮ সনে এসডিওর মোহ ত্যাগ করে তিনি সমবায় বিভাগের সহকারী নিবন্ধকের চাকরি গ্রহণ করেন এবং এ পদে ১৯১১ সন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমবায় আন্দোলন বাংলার অবহেলিত কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে পারে। সমবায় শক্তিশালী হলে কৃষক সমাজ মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। একমাত্র আইন করে মহাজনদের শোষণ বন্ধ করা যাবে না। তাদের সহজলভ্য ঋণের সুবিধা দিতে হবে। ১৯২৯ সন থেকে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলতে থাকে তার ফলে কৃষক সমাজ বেশি ঋণী হয়ে পড়ে এবং মহাজনদের দৌরাত্মা বৃদ্ধি পায়। তিনি জানতেন ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে কৃষকদের আপাততঃ ঋণ মুক্ত করলেও যদি তারা প্রয়োজনের সময় ঋণ না পায়, তাহরে তাহা পূণরায় মহাজনদের স্মরণাপন্ন হবে। তাই তিনি বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৪০ সনে সমবায় আইন পাস করান। এ আইনের অধীনে ১৯৪২ সনে সমবায় বিধি প্রণয়ন করা হয়। তাঁর সময় যে সমবায় আইন ও বিধি প্রণীত হয়, আজও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। তিনি গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় গঠন, কর্মচারী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ঋণ বরাদ্দ করে কৃষক, জেলে, তাঁতী ও সমবায়ীদের এক সূবর্ণ সুযোগ করে দেন। তাঁর সময় হাজার হাজার সমবায় সমিতি গঠিত হয় এবং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নারী ও শিশু অধিকার

এ, কে ফজলুল হক নারী ও শিশুর মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেন। নারী কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণে ১৯৩৯ সালে ম্যাটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট বা মাতৃমঙ্গল আইন প্রণীত হয়। নারী চাকরিজীবীরা সন্তান প্রসবের পূর্বে একমাস ও পরে একমাস বেতন ভাতাদিসহ ছুটিভোগের অধিকার লাভ করে। শিশু শ্রমিকদের কল্যাণে ও শিশু শ্রম বন্ধের জন্য ১৯৩৮ সালে শিশু নিয়োগ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইন ১২ বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের শ্রমিক হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ বন্ধ করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৩ সালে ভবঘুরে আইন প্রণয়ন করে আশ্রয়হীন নারী ও শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। শেরে বাংলার উদ্যোগে বাংলাদেশে অনেক এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য সংস্কার

এ, কে, ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে জেলেরা জলমহলে মাছ ধরার অধিকার লাভ করেন। উপজাতীয় উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। যুবকদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় শরীর চর্চা সংগঠক নিয়োগ করা হয়।

তাঁর সময় শ্রমিকরা তাদের কল্যাণে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, দাবি আদায়ের জন্য কর্ম বিরতির অধিকার লাভ করে। তিনি শিল্প কারখানায় আইন করে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। ১৯৪০ সনে দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়ন করে তিনি দোকান শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন বন্ধ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেন।

পল্লী উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামে গ্রামে পল্লী মঙ্গল সমিতি, খাদ্য ভান্ডার, কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি জনগণের সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা কুইনাইন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নত করা হয়। অফিস আদালতে টাউট দমনের জন্য ১৯৩৭ সনে টাউট আইন প্রণয়ন করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ১৯৩৮ সনে দুর্ভিক্ষ বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়।

এ, কে, ফজলুল হক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর শাসন আমলে তিনি কয়েক হাজার রাজবন্দী, আন্দামানে নির্বাসিত বন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তি দেন। তাঁর সহযোগীতায় সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হন। তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের দাবী' গ্রন্থের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেন এবং 'পথের দাবী' নাটকটি করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি সিরাজদৌল্লা নাটক করারও অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সনে কংগ্রেস সদস্যদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ফজলুল হকের উদ্যোগে কলকাতা পৌরসভা সংশোধনী আইন পাস হয়। ফলে কলকাতা করপোরেশনে মুসলমান ও তফসিলিদের আসন ও চাকরি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ, কে ফজলুল হক প্রাদেশিক ব্যয়ভার হ্রাস করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রীদের বেতন ভাতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৩৭ সনের বঙ্গীয় মন্ত্রীদের বেতন আইন প্রণয়ন করেন। তিনি আইন করলেন যে, কোনো ব্যক্তি সরকারের লাভজনক পদে থেকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। এ, কে ফজলুল হক চাকরি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মুসলমানদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্যে শতকরা ১৫ ভাগ চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করে বিধি জারি করেন। অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যানুপাতে চাকরিবিধি জারি করলে বর্ণহিন্দু নেতা ও

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পত্রিকাগুলো ফজলুল হককে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে এবং অভিযোগ করে যে, যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অনুপযুক্ত মুসলমানদের নিয়োগ করা হচ্ছে। ফজলুল হক সংবাদপত্রে ও আইনসভায় যোগ্যতার সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, তিনি উপযুক্ত প্রার্থীদের চাকরি দিচ্ছেন এবং ইংরজি ভাষায় পান্ডিত্য যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। এমনিভাবে আইন প্রণয়ন, বিধি জারি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত কৃষক শ্রমিকের জন্য মুক্তির দ্বারোদঘাটন করেন ফজলুল হক, তাঁর যুগান্তকারী সংস্কার কর্মসূচি ও সরকারের কার্যাবলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সাপ্তাহিক বাংলা কথা ও ইংরেজী ভাষায় বাংলা উইকলি প্রকাশ করেন।

১৯৩৯ সালে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দেয়। যুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকার সকল প্রদেশের মন্ত্রিসভা ও আইনসভার সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী না হলেও ১৯৩৯ সালে War Resolution প্রস্তাব বঙ্গীয় আইনসভায় ১৪২-৮২ ভোটে পাশ হয়ে যায়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গীয় সরকার ভারতীয় সরকারকে যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ণ সহযোগীতা দেবে। যুদ্ধের অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়, কারণ ভারতে তখন জাতীয়াবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছে।[৭৭]

লাহোর প্রস্তাব ঃ

১৯৪০ সনে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর শহরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকান্দর হায়াত খান ও তাঁর সরকার পাঞ্জাবের শহীদগঞ্জের মসজিদ শিখদের ছেড়ে দেয়। শিখেরা এ মসজিদকে 'গুরুদ্বার' বলে দাবি করে এবং তাদের পক্ষে হাই কোর্ট ও প্রভি কাউন্সিল রায় দেয়। আল্লামা মাশরেকীর খাকছার দল ১৯৪০ সনের ২১শে মার্চ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মসজিদ দখল করতে যায়। সৈন্যবাহিনী গুলি করে অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। পাঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় স্যার সেকান্দার হায়াত সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ রকম বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে মুসলিমলীগের সম্মেলন হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফজলুল হক লাহোর পৌঁছে খাকছারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। খাকছার দল তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে মিয়া আবদুল আজিজ এম, এল, এ-র বাড়ী পৌঁছে দেয়। ভারতের নেতারা যখন একমত হয়ে প্রস্তাব তৈরী করতে ব্যর্থ হন তখন ফজলুল হকই প্রস্তাব তৈরী করেন। ফজলুল হক উত্থাপিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' টি ছিল-

---

৭৭. Processdings of the Bengal Legislative Council December 18, 1939.

Dhaka University Institutional Repository

cultural, economic, political, administrative and other rghts and interests in consultation with them and in other parts of India where the Muslims are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, adminstrative and other rights and interests in consultation with them.

This seassion further authorizes the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumptio finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communications, customs and such other matters as may be ncessary.[৭৮]

এই অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন যুক্ত প্রদেশের চৌধুরী খালেকুজ্জামান। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত হয়।

লাহোর অধিবেশনে আরো দাবি করা হয় যে, ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইনে ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা গ্রহণ যোগ্য নয় এবং ভারত শাসন আইন পুনর্বিবেচিত না হলে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মতি ছাড়া প্রণীত অপর কোনো পরিকল্পনা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পূবাঞ্চল অর্থ্যাৎ বাংলা আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ গঠনের পরিকল্পনা ছিল। ১৯৪৬ সনের ৮ই এপ্রিল পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চল রাষ্ট্রসমুহের পরিবর্তে দুই ইউনিট নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হক জিন্নাহর মতান্তর ঃ

১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি এ, কে, ফজলুল হকের নীতিগত বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে তিনি কৃষক প্রজা পার্টি নিয়ে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন। নির্বাচনের পর তিনি প্রজা লীগ যুক্ত মন্ত্রি সভা গঠন করেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দেন।

৭৮.
১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক ইংরেজি ভাষায় লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য এবং বঙ্গীয় লীগের সভাপতি হন। ফজলুল হকের লীগে যোগদানের ফলে এ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাঁর মন্ত্রীসভার শিক্ষা, উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, ঋণ সালিশি বোর্ড ও মহাজনি আইনের সুফলের দাবিদার হলেন খাজা নাযিম উদ্দিন ও মুসলিম লীগ। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে খাজা নাযিম উদ্দিন ও হোসেন সোহরাওয়ার্দী গ্রাম বাংলায় পরিচিতি লাভ করেন।

হক জিন্নাহ বিরোধের মূল কারণ ছিল দুই নেতার রাজনৈতিক জীবনের নীতিগত বৈষম্য। ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করাই জিন্নাহর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি প্রাদেশিক মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ, সুবিধা অসুবিধা ও আশা আকাঙ্খার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। অন্য দিকে ফজলুল হক ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়েও তিনি বাঙালী জাতীয়তায় বিশ্বাস করতেন এবং বাংলার মুসলমানদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। মুসলিম জাতীয়তার আদর্শের সাথে বাঙালী জাতীয়তা, কৃষক প্রজার মুক্তির জন্য জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য ছিল। এমতাবস্থায় লীগ সভাপতি জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের বিরোধ অনিবার্য ছিল। তা ছাড়া লীগে অভিজাত জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁর মন্ত্রীসভায় লীগ সদস্যদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের পর তিনি জমিদারি প্রথা রহিত করার উদ্দেশ্যে এক বিল প্রণয়ন করেন। তাঁর লীগ মন্ত্রী ও সভ্যরা এর বিরোধিতা করেন। এর ফলে অভিজাত শ্রেণীর লীগ নেতাদের সাথে ফজলুল হকের বিরোধ দেখা দেয়।[৭৯]

ভাইসরয় কাউন্সিল বা জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নিয়োগের বিষয় নিয়ে জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের বিরোধ চরমে পৌঁছে। ১৯৪০ সনের ২৭শে মে জিন্নাহ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, যেসব প্রদেশে মুসলিম প্রাধান্য আছে সেগুলি ইচ্ছা করলে সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করতে পারে। ১৯৪১ সনের ২০শে জুলাই বোম্বাইয়ের গর্ভনর স্যার রোজার লামলি জিন্নাহকে জানান যে, বড়লাট তাঁর জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদে প্রদেশে মুসলমান মূখ্য মন্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতের ভাইসরয় যুদ্ধকালীন প্রশাসন চালাবার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে 'ওয়ার কাউন্সিল' বা ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করেন।

৭৯.
যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় - কালীপদ বিশ্বাস- ১৯৬৬ কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে জিন্নাহ পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকান্দর হায়াত, আসামের প্রধান মন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ ও বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন এবং ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। সেকান্দর হায়াত খান ও স্যার সাদুল্লাহ সে হুকুম মেনে নেন। কিন্তু ফজলুল হক জিন্নাহর হুকুম মেনে নিতে পারেননি। ফজলুল হক ও বেগম শাহনেওয়াজ পদত্যাগ না করলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লীগ সভাপতি জিন্নাহকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৯৪১ সনের ১৬ই আগস্ট সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ফজলুল হক বলেন যে, "এ ব্যাপারে আমি পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে, মি. জিন্নাহ কতৃক আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পুর্ণ অনিয়মতান্ত্রিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক"।

প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন ঃ

ফজলুল হক ১৯৪১ সনের ২৭শে নভেম্বর কংগ্রেস নেতা জে,সি, গুপ্তের বাড়িতে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য এক বৈঠকে বসেন। তাতে শরৎচন্দ্র বসু, ফজলুল হক, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শামসুদ্দিন আহমেদ, খান বাহাদুর হাশেম আলী খান সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করার বিষয়ে শরৎচন্দ্র বসু একটি দলিল তৈরী করেন। এই দলিলকে ভিত্তি করেই নতুন প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করা হয় এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ফজলুল হককে এ পার্টির নেতৃত্বপদে আসীন হতে অনুরোধ জানানো হয়। ঐ দিন তিনি দলিলে স্বাক্ষর দেন নি এবং নেতৃত্বও গ্রহণ করেননি। কারণ তখনও তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার নেতা ছিলেন। ২৮শে নভেম্বর এ মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক বসে, তাতে তিনি উপস্থিত থেকে লীগ সদস্যেদের প্রকৃত মনোভাব বুঝতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার জন্য চেষ্টা চলছে। ফজলুল হকের আইন পরিষদে সমর্থন থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা যাচ্ছিল না। তখন লীগের সামনে একটি পথই খোলা ছিল এবং তা হলো, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করিয়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই পথই বেছে নিলেন।

১৯৪১ সনের ২৯শে নভেম্বর হক মন্ত্রিসভার মুসলিম লীগ সদস্যরা খুব দ্রুততার সাথে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আহবান করেন। অথচ বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল হকের সাথে তাঁরা এ ব্যাপারে কোনো আলোচনাই করেনি। ৪ঠা ডিসেম্বর মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দল গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহকে মুসলিম লীগ দলের নেতা নিযুক্ত করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

নেতা না করে খাজা নাযিম উদ্দিনকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্তের ফলে ফজলুল হক প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ গঠন করেন। প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ, শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশে, সভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মহাসভা একত্রিত হয়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল গঠন করে। ১লা ডিসেম্বর জিন্নাহর নির্দেশে মুসলিম লীগের খাজা নাযিম উদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব হাবিবুল্লাহ ও তাজিম উদ্দিন খান হক মন্ত্রিসভা থেকে পদ ত্যাগ করেন। ৩রা ডিসেম্বর ফজলুল হক লীগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ শরৎচন্দ্র বসু ও হিন্দু মহাসভার সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা করতে অস্বীকার করে। ১৯৪১ সনের ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লি থেকে জিন্নাহ স্যার নাযিম উদ্দিনের নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইন পরিষদে মুসলিম লীগ পার্টি গঠনকে স্বাগত জানান এবং সকল মুসলিম সদস্যকে তাতে যোগদানের আবেদন জানান। তিনি ফজলুল হকের উদেএশ্য বলেন, "তিনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করে আসছেন। এখন তিনি খোলাখুলিভাবে সরে যাচ্ছেন।

মুসলিম লীগের স্যার খাজা নাযিম উদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, নবাব হাবিবুল্লাহ এবং তমিজ উদ্দিন খান এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, এ, কে, ফজলুল হক এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে জন্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা রাখছেন না। ১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর তাঁদের সমালোচনার উত্তরে এ, কে, ফজলুল হক বলেন, মুসলিম লীগ দলের স্বাক্ষরকারী ৪ জন মন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য পরিষদের মধ্যে উপ দল সৃষ্টি করেন। মুসলিম লীগ পটুয়াখালী পরাজয়কে ভূলতে পারে নি। তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে কৃষক প্রজা পার্টির শামসুদ্দিন আহমদকে বাদ দিতে বাধ্য করে এবং ফজলুল হককে হেয় করার জন্য তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। ফলে কোয়ালিশন পার্টির মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

নয়া দিল্লী থেকে ১৯৪১ সনের ৬ই ডিসেম্বর জিন্নাহ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, মুসলিম লীগের বিধি বহির্ভূত কাজ করায় তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হবে না, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তার কৈফিয়ত পাঠাবার জন্য তাঁকে বলা হয়। ফজলুল হক উত্তরে জানালেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য ছাড়া কৈফিয়ত দেয়া সম্ভব নয়। ১০ই ডিসেম্বর জিন্নাহ নির্দেশ জারি করলেন যে, ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। মুসলিম লীগের সিমলা ও মাদ্রাজ অধিবেশনে ষড়যন্ত্র করে ফজলুল হকের নাম মুসলিম লীগ থেকে বাদ দেয়া হয়। তাঁর স্থলে অবাঙ্গালী এম, এ, ইস্পাহানিকে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। ফজলুল হক বিবৃতিতে বলেন যে, জিন্নাহ অন্যায়ভাবে তাঁকে লীগ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বহিস্কার করেছেন। প্রগতিশীল যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হলে ফজলুল হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতির পদ থেকেও পতদ্যাগ করতে বাধ্য হন। ফজলুল হক কে মুসলিম লীগ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং এ সকল কারণেই তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

কৃষক প্রজা পার্টি ও দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

এ, কে, ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র বসু ও হিন্দু মহাসভার সহ সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে মিলে প্রগতিশীল যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন। সিদ্ধান্ত হয় হক- শরৎ মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। শরৎচন্দ্র বসু দলের উপনেতা হবেন। ইংরেজ সরকার ফজলুল হকের পুনঃমন্ত্রিসভা গঠন প্রচেষ্টা ধ্বংশ করার জন্য শরৎচন্দ্র বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের আগের রাতেই গ্রেফতার করে। কারণ তাঁর অনুজ সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা। দলের নেতা নির্বাচিত হলেন এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪১ সনের ১২ই ডিসেম্বর ফজলুল হক দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করনে এবং ১৭ই ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা গভর্নর হার্বার্টের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ

এ, কে, ফজলুল হক	স্বরাষ্ট্র ও প্রচার
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি	অর্থ
নবাব হাবিবুল্লাহ	কৃষি, শিল্প
শামসুদ্দিন আহমেদ	যাতায়াত ও পূর্ত
আবদুল করিম	শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম
খান বাহাদুর হাশেম আলী খান	কৃষি খাতক ও পল্লী উন্নয়ন
সন্তোষকুমার বসু	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
প্রথমনাথ ব্যানার্জি	রাজস্ব, বিচার ও সংসদ
উপন্দ্রেনাথ বর্মণ	বন ও আবগারি।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্য ৪ জন কৃষক প্রজা পার্টির। নবাব হাবিবুল্লাহ মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আসেন। হিন্দু মহাসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে সন্তোষকুমার বসু ও প্রমথনাথ ব্যানার্জি; তফসিলি থেকে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ সদস্য ছিলেন। স্পিকার স্যার আজিজুল হক ভাইসরয় কাউন্সিরের সদস্য হলে তার জায়গায় কৃষক প্রজা পার্টির সৈয়দ নওশের আলী স্পিকার নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় হক মন্ত্রিসভাকে মুসলিম লীগ 'শ্যামা হক মন্ত্রিসভা নামে আখ্যায়িত করে। অথচ হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

মহাসভা থেকে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রী হলেন। এ মন্ত্রিসভা হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রতীক হিসেবে সর্বত্র প্রশংসিত হয়। কংগ্রেস অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রি সভা থেকে পদত্যাগ করে এবং ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন দিয়ে যায়। ফজলুল হকের সরকারও ইংরেজদের যুদ্ধে সমর্থন এবং যুদ্ধকালে অর্থ সংগ্রহ করে দেন। ১৯৪২ সনের ২৮শে জানুয়ারি জাপান রেঙ্গুনের ওপর বোমা বর্ষণ করে। ওদিকে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হীন্দ ফৌজ সরকার গঠন করে। তিনি ভারতকে স্বাধীন করার জন্য আজাদ হীন্দ ফৌজ নিয়ে রেঙ্গুনে পৌছেন। ফজলুল হক আন্তরিকভাবে সুভায় বসুকে সমর্থন করতেন। কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর সমর্থনে তিনি মন্ত্রি সভা গঠন করতে পেরেছিলেন।

১৯৪১ সনের ২৫ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ত্যাগ করেন। তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টির প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সরকার দেশরক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করে। হক মন্ত্রিসভা শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিদানের জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানালে মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাযিম উদ্দিন ১৯৪২ সনের ২০শে মার্চ হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন। খাজা নাযিম উদ্দিনকে ইংরেজ সরকার পরবর্তী সময়ে এ, কে, ফজলুল হকের স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

১৯৪২ সনের মার্চ মাসে হক মন্ত্রিসভা আইনসভায় বাজেট উত্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী বঙ্গীয় সরকারের ১৯৪২-৪৩ অর্থ বছরের বাজেট এবং মন্ত্রিরা তাঁদের স্ব স্ব বিভাগের বাজেট পেশ করেন। বিরোধীদলের হোসেন সোহরাওর্য়াদী, কংগ্রেসের ড. নলিনাক্ষ স্যানাল, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জি. মরগ্যান, পি বানার্জি প্রমুখ সদস্য বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্বেও ফজলুল হক আইন সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটে ১৯৪২-৪৩ সনের বাজেট পাশ করিয়ে নেন।

১৯৪২ সনের ২৭শে মার্চ হক মন্তিসভার প্রভাবশালী সদস্য খান বাহাদুর হাশেম আলী খান বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল আইনসভায় পেশ করেন। চাষী খাতক আইনের অধীনে গঠিত ঋণ সালিশি বোর্ডের মামলাগুলো নিয়ম ও উপ বিধির কারণে নিষ্পত্তি হতো না। ফলে ঋণগ্রস্ত চাষীরা ঋণ সালিশি বোর্ডের দ্বারা আশানুরূপ উপকৃত হয়নি। চাষী খাতক আইনের মেয়াদ দু'বছরের জন্য আইনসভায় বৃদ্ধি করা হয়। মুসলিম লীগের বিরোধিতার মুখে ফজলুল হকের চাষী খাতক আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল গৃহীত হয়।[৮০]

---

৮০. বঙ্গীয় আইনসভায় চল্লিশের দশকে শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক প্রদত্ত ভাষণ সমূহ সম্পাদনা করে আতোয়ার রহমান ১৯৫৪ সালে (Bengal Today) নামে প্রকাশ করেন। ভাষণগুলো উপ মহাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সনে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলাপ করার সুপারিশ করে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়, আড়াই বছর পরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করতে সরকার কিছু সময় প্রার্থনা করেন। ফজলুল হক তাই ১৯৪৩ সনের ৭ই জানুয়ারি জনগণের বিবেচনার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ সম্পর্কে বিকল্প পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। তাঁর পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরুপ– কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিলোপ সাধান; (২) সমস্ত জমি, জল, বন, খনি ইত্যাদি সরকারের অধিকারে চলে আসবে। এ জন্য বিশেষ আইনের দরকার হবে (৩) চাষযোগ্য জমির ব্যাপারে প্রকৃত চাষী তার উৎপাদিত সমস্ত শস্যের মূল্যের ছয় এর একাংশ সরকারকে দেবে। সমস্ত ট্যাক্স, শিক্ষা কর, পয়ঃকর প্রভৃতি রহিত করতে হবে, (৪) প্রকৃত চাষী ৫০ বিঘার উর্ধ্বে জমি রাখতে পারবে না। এর ফলে উদ্ধৃত্ত জমি ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, (৫) বাংলার আদায়কৃত শুল্ক রাজস্ব এই প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হবে; (৬) পাটের রপ্তানি শুল্ক বাংলা সরকারের প্রাপ্য হবে।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ

এ, কে, ফজলুল হক ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং সে কারণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্ম ছিলেন। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার পর ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে সরে যেতে থাকেন। তাঁর দাবি ছিল বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করুক। ভারতের বড় লাট লিনলিথগো ভারত সচিব এমেরির কাছে লেখা একটি পত্রে জানান যে, ফজলুল হক বাদে ভারতের প্রত্যেক মুসলিম নেতা পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। ১৯৪২ সনের ১৫ই জানুয়ারি জিন্নাহ বোম্বের গভর্নর লুমলির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রভাবে ফজলুল হক নিজের বিশ্বাস ও বিবেচনার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছেন। অবিলম্বে স্বাধীনতা ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করা হোক।

১৯৪২ সনের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন শুরু করে। বৃটিশ সরকার ৯ই আগস্ট গান্ধীসহ অন্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেস সংগঠন বেআইন ঘোষণা করা হয়।

মওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত 'আযাদ' পত্রিকা চিরদিন ফজলুল হকের তীব্র সমালোচনা করেছে। ১৯৪২ সনে ফজলুল হক বাধ্য হয়ে আযাদ পত্রিকা বন্ধ করে দেন। খাজা নাযিম উদ্দিন 'আযাদ' পত্রিকা বন্ধের জন্য শেরে বাংলার সমালোচনা করেন। ১৯৪২ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ফজলুল

Dhaka University Institutional Repository

হক খাজা নাযিম উদ্দিনকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, তিনি কোনো ভীতির কাছে মাথা নত করবেন না। কিছুদিন পরই ফজলুল হক 'আযাদ' পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ফজলুল হক রাজনীতিতে এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৪২ সনের ৮ই জানুয়ারি সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, "কেশচন্দ্রের সেনের জীবন থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে একতা ও ভালবাসার দ্বারাই দেশ ও সম্প্রদায়ের সেবা করা সম্ভব।" তিনি ধর্ম সম্পর্কে বলেন, "প্রকপক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকল ধর্মের মূল কথা এক। ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বিরোধের মধ্য দিয়ে নয়, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এবং যারা সমন্বয় এবং ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তারাই দেশের শ্রেষ্ঠ উপকারী।" দেশের সংকটময় মুহূর্তে ফজলুল হক কেশচন্দ্রের অবদান স্মরণ করেন।

দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠনের পর অনেক বাধার মধ্য দিয়ে এ,কে, ফজলুল হকের এগুতে হয়েছে। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তাঁর মন্ত্রিসভাকে শ্যামা হক মন্ত্রিসভা আখ্যা দেয় এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। দীর্ঘ ৭ মাস পরে মুসলিম লীগ নেতারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচশ সমাবেশ করেন। এই সব কাজে লীগ আবেগপ্রবণ ছাত্রদের ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য হলো, সরল বিশ্বাসী মুসলমানদের কাছে ফজলুল হককে অপ্রিয় করে তোলা। এ অবস্থায় জিন্নাহ ফজলুল হকের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেননি।

ফজলুল হক বাংলাদেশে মুসলিম লীগের প্রভাব হ্রাস করতে পূর্ণ উদ্দমে কাজ শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন, জিন্নাহ পরিচালিত মুসলিম লীগের কোনো নৈতিক অধিকার নেই রাজনৈতিক দল স্বীকৃতি দাবি করার এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবার। তিনি অভিযোগ করেন, মুসলিম লীগ স্বৈরতান্ত্রিক দল, সমস্ত ক্ষমতা জিন্নাহর করায়ত্ব, মুসলমানদের কয়েকটি দলকে মুসলিম লীগে স্থান দেওয়া হয়নি। ফজলুল হক ইসলামের মূলনীতি ভ্রাতৃত্বভাবকে ভিত্তি করে 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। বাংলাদেশে এ দলের সভাপতি ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ এবং সম্পাদক নিযুক্ত হন সৈয়দ বদরুদ্দোজা। তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি সর্বভারতীয় দল গঠন করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য মুসলিম দল গঠন করলেও তিনি অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারও এই দল রক্ষা করবে বলে ঘোষণা দেন। কারণ, মুসলমান ও অমুসলমানদের একতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। তিনি ঘোষণা করেন, বাংলার মুসলমানদের ভেতরে এমন মুসলিম লীগ থাকতে পারে না, যেখানে তার কোনো ভূমিকা নেই। এভাবে 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ' গঠন করে তার নেতৃত্ব দেবার জন্য ফজলুল হক প্রস্তুত হন।

অন্যায়ভাবে তাঁকে লীগ থেকে বাহিষ্কার করায় ফজলুল হক জিন্নাহর বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে এক মামলা দায়ের করেন। তাতে অভিযোগ করা হয়, তাঁর যুক্ত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে। জিন্নাহ তাঁকে বহিষ্কার করেছেন। সুতরাং এই আদেশ বাতিল করা হোক। ফজলুল হক মনে করেন, জিন্নাহকে বাধা দেয়ার একমাত্র উপয় হলো হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব সম্প্রসারিত করা, দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একই ভারতীয় জাতীয়বোধ বিকশিত করা। তাঁর উদ্যোগে ১৯৪২ সনের ২০মে জুন শনিবার কলকাতা টাউন হলে হিন্দু মুসলিম মৈত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। হক মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টি, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ মৈত্রী সম্মেলনের সাথে যুক্ত ছিল। ফজলুল হক এই সম্মেলনে উদ্বোধন করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব হাবিবুল্লাহ, মন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমেদ, মন্ত্রী খাঁন বাহাদুর, হাশেম আলী খাঁন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনাক্ষ স্যানাল, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হুমায়ুন কবির, কিরণশংকর রায়, সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখ সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের ওপর বক্তৃতা দেন। সভায় সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে 'কাউন্সিল অফ হিন্দু মুসলিম ইউনিট এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের কল্পনা ফজলুল হকের ছিল, সেখানে কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধিতা

ফজলুল হক দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তি পাকিস্তান দাবির বিরোধী ছিল। ১৯৪২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়া দিল্লিতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ফজলুল হকের আচরণ সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্টেটসম্যান কাগজে শায়েদ নামক একজন লেখক প্রতি সপ্তাহে 'দারুল ইসলাম' নামক প্রবন্ধে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় ফজলুল হকের সমালোচনা করতেন। ১৯৪৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখেও একটি প্রবন্ধে ফজলুল হকের সমালোচনা করা হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় ফজলুল হক এই অভিযোগের উত্তর দেন। এ ঐতিহাসিক পত্রে তিনি খুব সতর্কতার সাথে পাকিস্তান প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করেন বলেন, ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকেই আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি। আমি তখন থেকেই উপলব্ধি করেছিলাম যে, তাত্ত্বিকেরা পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন সময় এমন সব উদ্ভট চিন্তাধারা প্রচার করেছেন যার ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি অনুভব করছি পাকিস্তান সম্পর্কে অসত্য ধারণা সৃষ্টি করে বাংলার মুসলমানদের প্রতারিত করা হয়েছে। আমি স্বেচ্ছায় মৌনব্রতী হয়েছি। কারণ আমার মন্তব্য হয়ত ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। আমি এমন কিছু বলিনি যাতে পাকিস্তান মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ বলে অভিহিত করা যায়। তবু সাম্প্রতিক কালে এ পরিকল্পনা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সে বিষয়ে আমি একটি মন্তব্য করতে চাই। আমার মনে রাখতে হবে, ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলার সংলগ্ন তিনটি প্রদেশে আছে, যথাঃ আসাম বিহার ও উড়িষ্যা। যথাক্রমে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হল ৩৫%, ১০% ৪%। সুতরাং এটা পরিস্কার যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থানকে মেনে নিয়ে ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন প্রদেশগুলিসহ স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা সম্ভব নয়। যদি বাংলাদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে হয় তবে তার ফল হবে এই যে, পূর্বাঞ্চল প্রধানতঃ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হবে, তাকে এমন চারটি প্রদেশ ঘিরে রাখবে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অতএব, বাংলার মুসলমানদের এই বলে ধোঁকা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না যে, এ ফরমূলা পাঞ্জাব ও বাংলা উভয় অঞ্চলের পক্ষে শুভ হবে। বাংলার মুসলমানেরা উপলব্ধি করেছেন যে, তাদের স্বার্থ সমগ্র ভারতে সঙ্গে যুক্ত। আমরা এই ভেবে কায়দে আযমের ওপর নির্ভর করেছিলাম যে, তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব এমনভাবে পরিবর্তন করবেন যাতে বাংলার মুসলমানেরা অন্যান্য প্রদেশের মত মুসলমানের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার অর্জন করতে পারে। ফজলুল হক তাঁর সর্বপ্রথম পাকিস্তান প্রস্তাবের ত্রুটি উল্লেখ করেন এবং বাঙালি মুসলমানদের দৃষ্টি এদিকে আর্কষণ করে।

১৯৪২ সালের এপ্রিলে যুদ্ধ ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধবোমা বিস্ফোরিত হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় আইনসভায় সকল রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি দাবি করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করলো না। এদিকে ১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এই দুর্ভিক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। কোন রকম সাহায্য সামগ্রী পাঠানো হলো না। মূখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, যেসব স্থানে পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছে সেসব স্থানে তদন্ত হওয়া উচিত। গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ফজলুল হকের বক্তৃতায় খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে গভর্নর হাউজে ডেকে পাঠালেন। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গভর্নর ফজলুল হককে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ফলে স্পীকার সৈয়দ নওশের আলী আইনসভার সভা স্থগিত ঘোষণা করেন।[৮১]

---

৮১. বঙ্গীয় আইনসভায় কার্যবিবরণী- ১৯১৩-১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার পতন

১৯৪২ সনের ৫ ও ৬ই এপ্রিল এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হককে লীগ থেকে বিতাড়িত করার জন্য জিন্নাহর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। আইনসভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নানা কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফজলুল হক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারেননি। সারা বাংলায় দূর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায়। তিনি প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগকেও সংগঠিত করতে পারেননি। এ অবস্থায় ফজলুল হক ভাবলেন যে তিনি যদি মুসলিম লীগে প্রবেশ করেন তাহলে হয়তো জিন্নাহ বাংলার ক্ষতি সাধন করবেন না। তাই ১৯৪২ সনের ১৩ই নভেম্বর জিন্নাহর কাছে একটি চিঠিতে ফজলুল হক তাঁর সমর্থকদের নিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করবার বাসনা প্রকাশ করেন। মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য ফজলুল হক জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৪৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে ফজলুল হক জিন্নাহকে জানান যে, বাংলার বৃহত্তর স্বার্থে তিনি পদত্যাগ করতে রাজি আছেন; যদি তাঁকে লীগে গ্রহণ করা হয়।

জিন্নাহ ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারী ফজলুল হককে জানালেন যে, তিনি যা করেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত এবং প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির বিলোপ সাধন করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। শর্তাবলী মেনে নিলে মুসলিম লীগে পুনঃপ্রবেশ করার পথ সুগম হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক জিন্নাহর কাছে লিখিত পত্রে নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, জিন্নাহ তাঁদের পত্রাবলি প্রকাশ করে ভবিষ্যতে আলাপ আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফজলুল হক প্রথম শর্ত সম্পর্কে বলেন, গত পনের মাসের দুঃখজনক ঘটনার জন্য তিনি মোটেই দায়ী নন। বরঞ্চ তাঁর ওপর অনেক অবিচার করা হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত মেনে নিতে রাজি আছেন; যদি পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এবং সমর্থকদের ওপর লীগে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

ফজলুল হক যে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁর সাথে পত্রালাপ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি কৃষক প্রজা পার্টিকে কিছু জানাননি। ফলে এসব চিঠি কাগজে প্রকাশ পেলে তা তাঁকে এবং তাঁর দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। ফজলুল হক একজন বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অব্যবস্থিত চিত্রের লোক ছিলেন। এজন্য তিনি নিজের অনেক ক্ষতি করেন এবং দলও বিপন্ন হয়েছে। ফজলুল হক এক সঙ্গে নিজেকে খাঁটি বাঙালি ও খাঁটি মুসলমান মনে করতেন। কিন্তু এক জটিল

Dhaka University Institutional Repository

সামপ্রদায়িক রাজনীতিগত পরিবেশে তাঁর পক্ষে এই উদ্দেশ্য সফল করা কষ্টকর ছিল। তাই তাকে আত্মিক দ্বন্দ্বে ভূগতে হয়েছে। মানবিক অস্থিরতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সময় নেতৃত্ব দিতেও তিনি ব্যর্থ হন। নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ধর্মের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ধর্মের মৌলিক আদর্শ গ্রহণ করে তিনি নিজেকে বাঙালি হিসেবেই আবিস্কার করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই আইনসভার ভেতরে ও বাইরে মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো এবং লীগের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা। লীগ কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় ফজলুল হকের সভা পন্ড করতে চেষ্টা করে, তাঁকে তাঁকে অপমানিত করে এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা কর্মীদের আক্রমণ করে, আইন সভায় লীগ সদস্যরা তীব্র ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটনা করে।

এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে হক মন্ত্রীসভাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। গর্ভনর হার্বার্ট ও আমলারা বিভিন্ন বিষয়ে হক মন্ত্রিসভার সাথে অসহযোগিতা করতে শুরু করে। মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারের অনুগত দল। বৃটিশ সরকার মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে চায়। তাই হার্বার্ট এক মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় ১৯৪৩ সনের মার্চ মাসে আইনসভার ৬টি আসনের উপ নির্বাচনে হকপন্থীরা পরাজিত হন। মুসলিম লীগ সকল আসন দখল করে। মুসলিম লীগও ইউরোপীয় সদস্যরা এক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করে। অবশেষে ১৯৪৩ সনর ২৭শে মার্চ ফজলুল হক এক দীর্ঘ ভাষণে প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এটাই ছিল তাঁর শেষ ভাষণ।[৮২] তিনি বলেন, তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীর পদ আঁকড়ে থাকতে চান না। তা ছাড়া তিনি মনে করেন, বাংলাদেশকে সঙ্কট মুক্ত করতে হলে আইনসভার সমস্ত দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা দরকার। গত কয়েক মাস ধরেই অবস্থার গভীরতা উপলব্ধি করে ফজলুল হক গর্ভনর হার্বার্টকে জাতীয় সরকার গঠন করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সনের ২৭শে মার্চ তিনি গভর্নরকে বলেন, মুহূর্তে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাঁর মতে, কেবল নির্দলীয় মন্ত্রীসভাই বাংলার দুরব্যবস্থা লাঘব করতে সক্ষম। এই পরিবেশে ১৯৪৩ সনের ২৭শে মার্চ হার্বার্টের প্ররোচনায় ইউরোপীয় সদস্য হ্যামিল্টন বাজেটের ওপর ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তপাদের পক্ষে ৯৯ এবঙ ফজলুল হকের পক্ষে ১০৯ ভোট পড়ে। হার্বার্ট যখন ভোটের মাধ্যমে ফজলুল হককে সরাতে পারলেন না, তখন তিনি ফজলুল হককে ডেকে পাঠান।

---

৮২. Proceedings of the Bengal Legislative Council, March 27, 1843.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সনের ২৮শে মার্চ রাত ৭.৩০ মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত ফজলুল হক হার্বার্টের সাথে জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। গভর্নর কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। গভর্নর তাঁকে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে বলেন। ফজলুল হক বলেন, তাঁর সহকর্মী ও দলের সাথে আলোচনা না করে পদত্যাগ করা সম্ভব নয়। গর্ভনর একটি টাইপ করা পদত্যাগপত্র ফজলুল হককে স্বাক্ষর দেবার জন্য দেন। আর একথা বলেন, তিনি যদি এই কাগজে স্বাক্ষর না দেন, তবে তাঁকে পদচ্যুত করবেন। ফজলুল হক অভিযোগ করেন যে, এক গভীর ষড়যন্ত্র করে গর্ভনর তাঁকে পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন। ঐ পদত্যাগপত্র গ্রহণের খবর রাত দশটায় ফজলুল হকের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৯৪৩ সনের ২৯শে মার্চ শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কি অবস্থায় এবং কেন তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা বর্ণনা করে ১৯৪৩ সনের ৫ জুলাই বঙ্গীয় আইন সভায় 'আমি কেন পদত্যাগ করেছি'- এই শিরোনামে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এই ভাষণ বাংলার ইতিহসাবে এক স্মরণীয় দলিল স্বরূপ।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়েছিল সে সম্পর্কে আইন সভায় প্রদত্ত ভাষণে তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, " এ বিশ্বাস ঘাতকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েক খন্ড লেখা সম্ভব। কিন্তু এর রকম বক্তৃতার জন্য আইনসভার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে করতে হয়েছে। আমার বক্তৃতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, সে সম্পর্কে আমি আমার দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই"।

প্রথমতঃ আমার সকর বিবরণ নিখুঁত দলিল দ্বারা সত্য বলে সমর্থিত। আমি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় অধিকাংশ দলিল, লিখেছি এবং এগুলো তৎকালীন গর্ভনরকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছিল এমন এক সময়, যখন আমার পদত্যাগপত্র তখনও গৃহীত হয়নি এবং পদত্যাগের সেই পূর্ব মুহূর্তে সাধিত অতুলনীয় অগ্রগতি সম্পর্কে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমার গভর্নরের কাছে এসব লেখা কোনদিনও দিনের আলো দেখবে এ দূরদৃষ্টি বা ধারণা নিয়ে আদৌ লেখা হয়নি। আমি আশা করি, আমি সঠিকভাবে দাবি করতে পারি গভর্নর এবং আমার মধ্যে বিদ্যমান প্রয়োজনীয় সরলতা ও বিবেকের প্রতি আমার আনুগত্যকে বিসর্জন দেইনি।

দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতা আইন সভায় বাংলার বাজেটের ওপর এমন সময় প্রদান করেছিলাম যে, তখন আমি অসুস্থ। আমি এক মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম। এ রোগ থেকে সৃষ্টিকর্তা আমাকে আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত করেছিলেন। আমি এ বক্তৃতার জন্য সাহিত্যের পম কৃতিত্ব দাবি

Dhaka University Institutional Repository

করিনা; কিন্তু নিশ্চয় আমি দাবি করবো যে, দুটো বক্তৃতাই প্রকৃত ঘটনার সহজ ও অকৃত্রিম বিবরণ এবং এগুলো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত যা আজ পর্যন্ত বিতর্কিত হয়নি বা কেউ প্রতিবাদ করেনি।

আমি এখন এসব বক্তৃতা আমার দেশের জনগণের বিচারের জন্য ছেড়ে দিলাম। দূভার্গবশত তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের মিথ্যা নাটকের পশ্চাদপটে যা কিছু ঘটে সে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

"আমি কেন পদত্যাগ করলাম"

ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আজ আমরা এ আইনসভায় মিলিত হয়েছি। ১৯৪৩ সনের ২৯শে মার্চ আমরা শেষবার মিলিত হয়েছিলাম এবং সে নিয়তি নির্দিষ্ট সকালে এক নাটকীয় অবস্থায়। আমাদের বিদায় নিতে হয়েছিল। এ তিন মাস এক সপ্তাহের বিরতিকালে যে ঘটনা ঘটেছে তা শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তিতে আঘাত করেছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মিথ্যা অভিযোগের মুখোশ খুলে দিয়েছে। আইন সভার স্মরণে আছে যে, বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে আমরা যে মুহূর্তে মিলিত হয়েছিলাম সে সময়ই শ্রী কিরণ শঙ্কর রায় এবং অন্যরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি পদত্যাগ করেছি কিনা এবং যদি করে থাকি তবে আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা? আমি উভয় প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর অবশ্য উথাপিত নির্দিষ্ট প্রশ্নের তথ্য প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে অবস্থার প্রেক্ষিতে সুকৌশলে আমাকে পদচ্যুত করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেইনি। পরিষদ মূলতবী হয়ে যায় এবং বিরতিকালে বিভিন্ন সময় কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্ব থেকে লিখিত এবং মুদ্রিত পত্রে, যা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার পদত্যাগপত্র বলে গণ্য করা হয়, তাতে আমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করান হয়েছিল তা বর্ণনা করেছি।

আমি মনে করেছিলাম যে, এসকল বিবৃতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার সময়কাল কি নাটকীয়ভাবে শেষ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছে এবং আমার এ পরিষদে আর কোনো বিবৃতি দেয়ার প্রয়োজন নাই। আমি দেখে আশ্চর্য যে, ভারত সচিব পার্লামেন্টে আমার পদত্যাগ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে যে প্রকৃত ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা না করে অসত্য তথ্যে পূর্ণ এবং দোষ-গুণের পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা আমি বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দিতে পারি না। পার্লামেন্টে বক্তৃতাকালে ভারত সচিব মন্তব্য করেছেন যে, আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি এবং আমার পদত্যাগ এবং পরবর্তী ঘটনা 'প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের' অধীনে পদ্ধতিগত কারণে ঘটেছে। সচিব যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা অর্থহীন না হলেও

Dhaka University Institutional Repository

রহস্যপূর্ণ ছিল। আমি সচিবকে তারবার্তা প্রেরণ করে ঘটনা সম্পর্কে তার অসত্য বিবৃতির প্রতিবাদ করি এবং যা ঘটেছে সে সম্পর্কে জনগণের নিকট কোন বিবৃতি প্রদানের পূর্বে সত্য উদঘাটন করার অনুরোধ জানিয়েছি। ভারত সচিবকে ঘটনা বেতারের মাধ্যমে প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে আমি মহামান্য ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করেছি। এ সম্পর্কে উত্তর পেয়েছি যে, গভর্নর ভারত সচিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ও গভর্নরের মধ্যে বিবৃতির যে অসঙ্গতি রয়েছে সে সম্পর্কে ভারত সচিব মনে করেন যে, গভর্নরের বিবৃতি সত্য।

আমি স্বীকার করি যে, আমার প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। এ ছিল ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ সমন্বিত। নিম্নস্থ কর্মকর্তাগণ যে কাজ করবেন তাঁর প্রতি উভয় চোখ বন্ধ রাখার নীতি চলছে। এ নীতি কর্মকর্তাদের সমর্থন প্রদানের নীতি হিসেবে পরিচিত। এ নীতি ভারতে কর্মকর্তাদের যা ইচ্ছা তা করার জন্য উৎসাহিত করে। তারা বিশ্বাস করে যে, কোন অবস্থায় তাদের অপরাধের পরিমাণ যাই হোক, তারা সর্বদা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন। জন হার্বার্ট একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতির মধ্যে কাজ করেন। কিন্তু এ নীতি তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলি বর্ষণের বিয়োগান্ত ঘটনা এবং মেদিনীপুরে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রক্ত জমাট বাঁধানো অভিযোগের তদন্ত অস্বীকার করতে শক্তিশালী করেছে। এ নীতি গভর্নরকে তার মন্ত্রীদের অবজ্ঞা করতে প্রেরণা জোগায় এবং যখন মাটির সন্তানেরা খাদ্যাভাব ওপবাস করছে তখন এ নীতি সচিবকে উৎসাহিত করে তার পছন্দমত এজেন্টদের প্রচুর লাভ অর্জনের লক্ষ্যে তাদের পকেটে জনগনের অনেক বে-আইনী টাকা দিয়ে তাগেদর ইচ্ছামত চাল বিক্রয়, ক্রয় এবং গুদামজাত করার জন্য ভাগ্যীন মফস্বলে প্রেরণ করতে। এ নীতি গভর্নরকে ক্ষমতাশীল করেছে মন্ত্রীদের সাথে পূর্বে কোন পরামর্শ না করে বড় বড় দপ্তরে এমনকি প্রশাসনের মাঠ পর্যায় নিয়োগ করতে। এ নীতির বলে শক্তিশালী হয়ে ভাগ্যবান মন্ত্রিগণ গ্রামাঞ্চলে যা ইতোমধ্যে উদ্ধৃত্ত খাদ্য শূণ্য হয়ে পড়েছে তা জেনেও মজুতকৃত খাদ্য উদ্ধারের নামে গরীবদের কুটিরে সংঘবদ্ধভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে। এ নীতিই একটি প্রক্রিয়াশীল সরকারকে প্রেসের স্বাধীনতা হরণ, সংবাদ প্রকাশে বাধা এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সমালোচনা স্তব্ধ করার জন্য শক্তি জোগায়। মন্ত্রিগণ যখন জনমত পোষণ উপেক্ষা করে সরকারি এবং ব্যক্তিগত লোভ লালসার উদ্দেশ্যে স্বপ্নাতীত সম্পদ অর্জন করার জন্য তাদের রাজনৈতিক সাথী এবং অন্যদের একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ প্রদান করে, তখন এ নীতি তাদের রক্ষা করে। সুতরাং আমার দিক থেকে আমার দায়িত্ব পরিষ্কার।[৮৩]

৮৩.

২৫ নভেম্বর, ১৯৪৪, কলকাতা এ, কে ফজলুল হক।

১৯৪৩ সনের ৫ই জুলাই বঙ্গীয় আইনসভায়, এ,কে, ফজলুল হকের প্রদত্ত ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

নাজিম উদ্দীনের মন্ত্রীসভা গঠন

১৯৪৩ সালের ৫ই মার্চ মূখ্যমন্ত্রী, ফজলুল হক আইনসভায় প্রকাশ করেন যে, অবাধ ক্ষমতার আবরণে গভর্নর বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিসভা প্রদত্ত পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছেন এবং তিনি সে সবের তালিকাও পেশ করেন। গভর্নর এসব অভিযোগ সহজভাবে গ্রহণ করেননি এবং প্রদানত তাঁর উদ্যোগেই ২৪ ও ২৭ মার্চ আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। দু'বারই সামান্য ব্যবধানে হলেও প্রস্তাবগুলি নাকচ হয়ে যায়। তৎার আদেশ কার্যকর করতে ২৮ মার্চ গভর্নর ফজলুল হককে একটি তৈরী পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরের নির্দেশ দেন এবং শাসনতন্ত্রের ৯৩ ধারা বলে তিনি নিজেই প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে এবং এর একমাস পরে খাজা নাজিমউদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন, এ খবর প্রকাশিত হবার পরই ১৯৪৩ সনের ২১শে এপ্রিল প্রগ্রেসিভ পার্টির নেতা এ, কে, ফজলুল হক এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা শামসুদ্দিন আহমেদ ভাইসরয়ের কাছে একটি তারবার্তায় বলেন যে, রাজনৈতিক মতামতের জন্য যদি কয়েকটি দলকে শাস্তি দেয়া হয় এবং তাঁদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তবে বাংলাদেশে অভাবনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। সমস্ত দল নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত ৯৩ ধারা রহিত করা উচিত না। একই মর্মে বাংলার গভর্নরকেও তাঁরা পত্র দেন। তবে বড়লাট ও গভর্নর তাঁদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। ২৪শে এপ্রিল লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর স্যার আবদুল হালিম গজনভীর সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফজলুল হক তাঁর পদত্যাগের ঘটনা ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি এক গভীর ষড়যন্ত্রের বলি হন এবং তিনি ন্যায় বিচার দাবি করেন। এসভায় সন্তোষকুমার বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রমুখ সরকাররের অগনতান্ত্রিক আচরণের নিন্দা করেন। এ সভায় দলত্যাগ করে যারা মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন, তাদের নিন্দা করা হয়। তবে ফজলুল হক আইন সভার ভেতরে ও বাইরে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দীরূপে অবতীর্ণ হন। গভর্নর হার্বার্ট ফজলুল হককে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, জাতীয় সরকার গঠন করা হবে; কিন্তু দেখা গেল তিনি জাতীয় সরকার গঠনে কোনো উদ্যোগ নেননি বরং মুসলিম লীগ সরকার গঠন করার জন্য ইউরোপীয় সদস্যদের নিয়ে লীগকে উৎসাহিত করেন। মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাযিম উদ্দিন ১৯৪৩ সনের ২৪শে এপ্রিল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় সদস্য ছিলেন মাত্র ৯ জন এবং একজন ছিলেন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। ফজলুল হক হার্বার্টকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য বৃদ্ধি করা

Dhaka University Institutional Repository

হয় নি। অথচ স্যার নাযিম উদ্দিন মন্ত্রিসভায় ১৩ জন মন্ত্রী, ১৩ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি ও ৪ জন হুইপ ছিলেন।

খাজা নাযিম উদ্দিন	প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	খাদ্য
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী	অর্থ
তমিজ উদ্দিন খান	শিক্ষা
বরদাপ্রসন্ন পাইন	যাতায়াত, পূর্ত
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
তারাকান্ত মূখার্জি	রাজস্ব, ত্রাণ
নবাব মোশারফ হোসেন	বিচার
খাজা শাজাবুদ্দিন	বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প
প্রেমহরি বর্মা	বন ও আবগারি
খান বাহাদুর জালার উদ্দিন আহমেদ	জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার
পুলিনবিহারী মল্লিক	প্রচার
যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল	সমবায় ও ঋণ সালিসি বোর্ড।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ

নাযিমউদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়। ইংরেজ সরকারের নৌকা, চাল অপসারণ ও লীগের মন্ত্রীদের ব্যর্থতার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরেজ সরকারের পোড়ামাটি নীতি, চাল অপসারণ, চাল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, অবাঙালি ব্যবসায়ী ও কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি উদাসীনতার কারণে ১৯৪৩ সনে বাংলা ১৩৫০ সনে বাংলাদেশে সর্বত্র চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মুসলিম লীগ সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান বার্মা দখল করলে বার্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। অন্য প্রদেশ থেকে চাল আসাও নিষিদ্ধ। একশ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি হতে থাকে। বিহার থেকে চাল ক্রয়ের একমাত্র এজেন্ট মুসলিম লীগের ইস্পাহানি। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রি শ্রী বাস্তবের সাথে মুসলিম লীগের সুসম্পর্ক ছিল না। পঞ্চাশ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসে দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করেন। এ দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায়। সৎকারবিহীন মানুষের লাশ হয় শেয়াল, কুকুরের খাদ্য, কলকাতার রাস্তায় শত শত লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের রক্ষার জন্য ফজলুল হক এই সময় একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৪৩ সনের ৭ই আগস্ট ফজলুল হক বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দুর্ভিক্ষের জন্য মুসলিম লীগকে দায়ী করে

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদে বক্তৃতা করেন এবং বৃটিশ জাতির কাছে অবিলম্বে রয়্যাল কমিশন নিয়োগের জন্য আবেদন জানান। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ কাজ তদারক করেন। তিনি ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে, দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে একটি খোলাখুলি তদন্ত হওয়া উচিত।

নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল নিজে ২০ ডিসেম্বর ঢাকায় আসেন এবং স্বচক্ষে বাংলার দুর্ভিক্ষ দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে তারবার্তা পাঠালেন। এর এক মাস আগেই তিনি ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট এমেরীর কাছে এক তারবার্তায় বাংলায় গভর্নরের শাসন জারির সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার রাজনীতি খুব তিক্ত মনে হচ্ছে। সম্ভবত ক্যাসিকে ৯৩ ধারা জারি করতে হবে।" সত্যি সত্যিই বাংলা গর্ভনর ক্যাসি ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ ৯৩ ধারা অনুযায়ী বঙ্গীয় আইনসভা বাতিল ঘোষণা করেন এবং সারা বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করেন।

নাযিমউদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন

১৯৪৩ সনের দূর্ভিক্ষের পরই ১৯৪৪ সনের বাংলা বস্ত্রের অভাব দেখা দেয়। মুসলিম লীগ বস্ত্রাভাব দূর করার জন্য ২০ জন অবাঙালি কাপড় ব্যবসায়ী নিয়োগ করেন এবং তাদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিল। ১৯৪৪ সনের জানুয়ারি মাসে গভর্নর জন হার্বার্ট মারা যান এবং তাঁর স্থলে স্যার ফ্রেডারিক ব্যারোজ গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সনের ৮ই মার্চ বাজেট অধিবেশনে কৃষি খাতে টাকা মঞ্জুরি বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। অন্তর্দ্বন্দের ফলে নবাব হাবিবুল্লাহ ১০ জন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি তখন বিরোধী দল। স্পিকার সৈয়দ নওশের আলী ভোট গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের পক্ষে ৯৭ এবং বিরোধীদলের পক্ষে ১০৬ ভোট পড়ে। খাজা নাযিম উদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন হলো। গভর্নর ব্যারোজ ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রের ৯২ ধারায় বাংলার শাসনভার নিজের হাতে নেন। এ, কে, ফজলুল হক বিরোধীদেলর নেতা হিসেবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আইনসভায় শক্তিশালী দল গঠন করেন। তাঁর বিরোধিতার ফলেই খাজা নাযিম উদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন হলো। ফজলুল হক পুনরায় তাঁর রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেন।

১৯৪৬ সনের নির্বাচন ও পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভল ঘোষণা করলেন যে, ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন হবে।

১৯৪২ সনের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য নির্বাচন হতে পারে নি। ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠি হবে। ফজলুল হকের একক

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তা থাকলেও প্রজা পার্টির জনপ্রিয়তা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। মুসলিম সমাজ পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ। মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলার ছাত্র যুবক ও জনতা ঐকবদ্ধ হলেন। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ও কর্মীরা দলে দলে মুসলিম লীগে যোগ দেন। এ, কে, ফজলুল হক তাঁর দলের নিবেদিত কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। তিনি বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ ও বাগেরহাট আসন থেকে প্রার্থী হন। মুসলিম লীগ ফজলুল হককে তাঁর নির্বাচনী কাজে বরিশালে গন্ডিবদ্ধ করে রাখতে চায়। কারণ তাঁদের ভয় ছিল, ফজলুল হক যদি বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার চালান, তাহলে অনেক মুসলিম লীগ নেতা ধরাশায়ী হবেন। মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাত্র ও লীগ কর্মী নিয়ে বরিশালে আগমন করেন এবং এক মাস ধরে প্রচার কাজ চালান। বরিশালে মুসলিম লীগের নবাবজাদা ফজলে রাব্বী, আজিজ উদ্দিন আহমেদ, খান বাহাদুর আকরম সফরউদ্দিন উকিল, মওলানা নুরুজ্জামান, মুসলিম ওয়াকার্স ক্যাম্পের আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ এ, কে, ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এবং মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচন প্রচার চালান। ছাত্র লীগের সভাপতি কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদ, সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে বি, এম, কলেজের ২২৫ জন মুসলিম ছাত্রের মধ্যে ২২০ জন ও স্কুলের শত শত ছাত্র মুসলিম লীগের পক্ষে কর্মী ছিলেন। বি, এম, কলেজের ৫ জন মুসলিম ছাত্র এবং ছাত্র ফেডারেশন ফজলুল হককে সমর্থন দেন। বাংলা তথা বরিশালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁর অবদানের কথা ভুলে গিয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বরিশালে অসংখ্য জনসভা করেন। ফজলুল হকের নির্বাচনী এলাকা ছিল বাকেরগঞ্জ, রাজাপুর, নলছিটি ও ঝালকাঠি থানা। তাঁর প্রতিদ্বন্দী মুসলিম লীগের বরিশাল বারের উকিল নলছিটি নিবাসী সদরউদ্দিন। কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন ভোলা থেকে খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, পিরোজপুর উত্তর থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, পিরোজপুর দক্ষিণ থেকে খান সাহেব হাতেম আলী জমাদ্দার। পিরোজপুর উত্তর এলাকা থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন আবদুস ছোবহান মিয়া। ফজলুল হক তাঁর সহকর্মীদের এলাকাতেও জনসভা করেন। বিশেষ করে পিরোজপুর উত্তর কেন্দ্রে মুসলিম লীগের বিজয় আসন্ন দেখে তিনি প্রচার জোরদার করেন। ১৯৪৬ সনে নির্বাচনের সময় শেরে বাংলা শক্তিশালী কৃষক পার্টিও ছিল না এবং অর্থও ছিল না। তিনি নির্বাচনের জন্য কলকাতায় অবস্থিত তাঁর বাড়ি সাতাশ হাজার টাকায় খান বাহাদুর মুহাম্মদ জান – এর কাছে বন্ধক দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হকের এ ঘোর দুর্দিনে বরিশালে যারা তাঁর নির্বাচনী সাথী ছিলেন, তাঁরা হলেন খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, আবদুল ওহাব খান, বি ডি হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আবদুল মজিদ ও কাশেম হাওলাদার। ফজলুল হক ঝালকাঠি, নলছিটি, বাখেরগঞ্জ, রাজাপুর– এই চার থানায় জনসভা করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে খাকসার দলের কর্মীরা ফজলুল হকের সমর্থনে বরিশালে চলে আসেন। ১৯৪৬ সনের ২৬ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৮৪]

১৯৪৫ সালের একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, অন্যদিকে ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন কনজার্ভেটিভ দলের পতন ঘটে। ইংল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে লেবার ক্ষমতায় আসে। নতুন সরকার ভারতের সঙ্কট নিরসনে একটি মন্ত্রিমিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও সি,পি,আই (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে, কংগ্রেস ৮৬টি আসন লাভ করে।

১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

ছক- ২

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৩
স্বতন্ত্র তফসিলী	২
স্বতন্ত্র মুসলিম	৩
স্বতন্ত্র হিন্দু	৪
ভারতীয় খৃস্টান	২
ইউরোপীয়	২৩
সি.পি.আই.	৩
মোট	২৪০

Source: The Statesman (Calcutta), April 2, 1946.

১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিমিশন ভারতে উপস্থিত হয়েছিল। ঐ বছর ১৬মে মন্ত্রিমিশন ভারতকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

৮৪. জ, গোস্বামী, *বাঙালি হাদীঘাট তমলুক*, (মেদিনীপুর ১৯৭৩)

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক–শ্রমিক ও মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ইংরেজ সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করে।

কলকাতার দাঙ্গা

ইংরেজ সরকার পাকিস্তানের দাবি স্বীকার না করায় মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে এবং ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা প্রত্যক্ষ দিবস পালন করে। অবাঙালিদের প্ররোচনায় কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয় এবং ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গা চলে। এ দাঙ্গায় ৬ হাজার নারী পুরুষ শিশু নিহত এবং ২০ হাজার লোক আহত হয়। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতার পর বিহার ও নোয়াখালীতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাংলার গভর্নর ব্যারোজ এবং প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দাঙ্গা প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফজলুল হক মুর্শিদাবাদের নবাবকে সভাপতি করে 'দাঙ্গা' প্রতিরোধ ও ত্রান কমিটি' গঠন করেন। তিনি আইন সভায় দাঁড়িয়ে দাঙ্গার জন্য সরকারের ও পুলিশের সমালোচনা করেন।

স্বাধীন সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভারতের গর্ভনর জেনারেল ওয়াভেল ঘোষণা করেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে শাসন ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে অর্জন করা হবে। ১৯৪৭ সালের ২১শে মার্চ গভর্নর জেনারেল ওয়াভেলের জায়গায় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সাথে আলাপ করে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব মেনে নেন। ইংরেজ সরকার পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের কথা ঘোষণা করে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সাথে বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৭ সনের ৮ই এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দাবি ব্যর্থ হয়ে যায়।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ

এ, কে, ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিলেও তিনি কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টি হিন্দু ও মুসলমানের জন্য ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিল। ১৯৪৭ সনের ২৮শে মে কৃষক প্রজা পার্টির ১০০ নেতা ও কর্মী একটি আবেদনপত্রে প্রত্যেক ভারতবাসীকে

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানান। তাঁরা বলেন, প্রতিটি ভারতীয়দের প্রধান কর্তব্য হলো বৃটিশকে ভারত পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা। কেউ কেউ বৃটিশের এদেশ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই ভারত বিভাগের দাবি করেন। আবার অনেকে ভারত বিভাগ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবি করেন। কিন্তু কৃষক–প্রজা এই উভয় দাবিরই বিরোধিতা করে। কারণ এই বিভাগ মঙ্গলজনক হবে না। 'মুসলিম লীগ যদি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহলে তারা এক বিকলাঙ্গ পাকিস্তান পাবে। এ বিকলাঙ্গ পাকিস্তান পেয়ে মুসলমানদের দুঃসময়ের কথা ভেবে আমরা ভয়ে কম্পিত হই"। কৃষক–প্রজা সরকারের অভিমত হলো, ভারতের দুরূহ ও জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় হলো ১৫ মে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা সমস্ত দল কর্তৃক গ্রহণ করা। কংগ্রেস এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষক–প্রজা কংগ্রেসের হাই কমান্ডের কাছে আবেদন করে বলে, তারা যেন বৃটিশ সরকারকে এই পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করতে চাপ দেয়। প্রথমে মুসলিম লীগ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পরে তাঁরা এ প্ল্যান গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কৃষক–প্রজা মুসলিম লীগকে এ প্লান গ্রহণ করতে অনুরোধ করে।

কৃষক–প্রজার মতে, ন্যায় নীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে পারে– এ ধরনের রাষ্ট্রে ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে। কৃষক–প্রজা পার্টি বঙ্গ বিভাগের বিরোধী ছিল। তারা কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা–আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার দাবি করে।

ইংরেজ সরকার হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে ১৯৪৭ সনের ৩রা জুন বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সনের ১৫ ও ১৬ই জুলাই ভারতের স্বাধীনতা বিল বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় এবং ১৮ তারিখে রাজকীয় সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হবার সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়।

১৯৪৭ সনের ২০শে জুন আইনসভায় বাংলার যে অংশে হিন্দু বেশি তাদের মধ্যে ৪৮ জন এম,এল, এ বাংলা বিভাগের পক্ষে, ২০ জন বিপক্ষে, পূর্ব বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার ১০৬ জন এম,এল,এ বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে এবং ৩৫ জন পক্ষে ভোট দেন। মুসলিম লীগ স্যার নাযিমউদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাকে বিভক্ত করে তার পূর্বাংশ নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সমর্থন দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও এ, কে, ফজলুল হককে বাদ দিয়ে মুসলিম লীগ যুক্ত প্রদেশের ওয়াসিম ও

Dhaka University Institutional Repository

হামিদুল হক চৌধুরীকে বাউন্ডারি কমিশনের উকিল নিযুক্ত করে। স্যার র‍্যাডক্লিফ বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান। এ, কে, ফজলুল হক দেখলেন যখন বঙ্গ বিভাগ রহিত করা সম্ভব নয়, তখন তিনি পূর্ব বাংলার সীমানা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার উদ্যোগ নেন। সীমান্ত মামলায় কলকাতা বেলভেডিয়ার হাউজের আদালত কক্ষে তিনি পূর্ববাংলার পক্ষে সওয়াল করেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস খুলনা, যশোর, বরিশাল ও খুলনা ভারতের অন্তর্ভূক্ত করতে চায়। শেষে দেখা গেল খুলনা পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ফজলুল হক খুলনার পক্ষে বেলভেডিয়ার ভবনে যান। চারজন বিচারক। ফজলুল হকের উপস্থিতিতে আদালতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং হকের জোরালো বক্তৃতা শুনে বাঁটোয়ারা কমিটি খুলনাকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভূক্ত করে রায় দেয়। আসামের সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং সিলেটবাসী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন বৃহত্তর বাংলা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তখন মুসলিম লীগ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৪৭ সনের ৫ আগস্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বাদ দিয়ে খাজা নাযিমউদ্দিনকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং খাজা নাজিমউদ্দিন মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সনের ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস এ, কে, ফজলুল হক হিন্দু ও মুসলমানের শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি ভারতের জনগণকে সৌজন্যের সাথে তাদের বিজয় উপভোগ করা ও সংখ্যালঘুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। পাকিস্তানের রাজধানী হলো করাচি এবং পূর্ববাংলার রাজধানী হলো ঢাকা।

৩.২ পাকিস্তানের রাজনীতিতে কৃষক প্রজা পার্টি

স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৮০ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হলেন তমিজউদ্দিন খান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ববাংলা থেকে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ও ফজলুর রহমান সদস্য ছিলেন। অথচ পূর্ববাংলার লোকসংখ্যা ছিল পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ। ১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর মুহম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হলে মুখ্যমন্ত্রি খাজা নাযিমউদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

নিযুক্ত হন এবং তাঁর স্থলে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল আমিন। পূর্ববাংলা থেকে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন এবং তাঁর মধ্যে ৬ জন ছিল অবাঙালি। পূর্ববাংলার নেতৃত্ব ছিল খুবই দূর্বল। তাই প্রথম থেকে পূর্ববাংলা বঞ্চিত হতে থাকে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান প্রমুখ নেতার দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সীমিত এবং প্রশাসনগত অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁরা আমলা-নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। পূর্ববাংলার সকল সচিব ও জেলা প্রশাসক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। গণপরিষদের সদস্যরা মন্ত্রিত্ব, চাকরি ও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নতুন দেশ গঠনে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন, তা তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ফলে মুসলিম লীগ দ্রুত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই জনগণ বিকল্প রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরই বাংলা ও অবাঙালিদের ওপর নেমে আসে মুসলিম লীগ সরকার ও অবাঙালিদের শোষণ ও নীপিড়ন। ফজলুল হক পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা ঘুরে ১৯৪৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে খাজা নাযিমউদ্দিন সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগের সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে আরো বলেন , হিন্দু-মুসলমান অফিসাররা যদি এক সঙ্গে কাজ করে তাহলে অবিশ্বাস দূর হবে। তিনি নাযিমউদ্দিনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি দায়িত্বশীল পদে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয় তবে তিনি পাকিস্তানের পতন ঘটাবেন। এভাবে ফজলুল হকই সর্বপ্রথম নাযিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর দু'রাষ্টের হিন্দু ও মুসলিম কর্মচারীরা নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় চলে যাবার আবেদন করেন। এসময় হিন্দুরা ভারতে এবং মুসলমানেরা পাকিস্তানে বদলি হয়। ফজলুল হক মনে করেন এ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হবে না। তাঁর নির্দেশমতো তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কলকাতায় থেকে যান। ফজলুল হক নিজেও কলকাতা-ঢাকা যাতায়াত করে উভয় বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তিনি ঢাকা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা করতেন। তারপর ফজলুল হক পারিবারিক ও রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৮ সনের প্রথমদিকে স্থায়ীভাবে ঢাকাতে বসবাস শুরু করেন।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ প্রদেশের হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক আইন ব্যবসা উপলক্ষে ঢাকা আসেন। মুসলিম লীগ ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে তাঁকে কালো পতাকা দেখায় এবং 'ফজলুল হক ফিরে যাও' স্লোগান দেয়। ফজলুল হক অনন্যোপায় হয়ে নাজ সিনেমা হলের মালিক মির্যা আব্দুল কাদের সর্দারের বাড়িতে উঠেন এবং সে বাড়িতে প্রায় ৬ মাস

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। ঢাকায় বাড়ি পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চারমাস চেষ্টা করেও বাড়ি পান নি। সরকারি অফিস ও র্কমচারীদের জন্য তখন বাড়ি দখল করা হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সকল অ্যাডভোকেট ও বিচারপতি আসছিলেন তাঁরাও বাসা পাচ্ছিলেন না। এ সংকটকালে ১৯৪৭ সনের ২রা ডিসেম্বর তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, সমস্ত বাড়িঘর দখল না করে সরকারের উচিত অ্যাডভোকেটদের জন্য বাড়ি বরাদ্দ করা। "অন্যথায় আমরা জানি কিভাবে আমাদের দাবি সরকারকে মানাতে হবে"।[৮৬] ১৯৪৮ সনের প্রথম দিকে ফজলুল হক কে.এম. দাস লেনের বাড়িখানা পান এবং সেখানে সপরিবারে কলকাতা থেকে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি কলকাতার পার্ক সার্কাস ও ঝাউতলায় দীর্ঘ ৩৬ বছর বাস করেছেন। এক বাড়িতে তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং দ্বিতীয় বাড়িতে তিনি প্রথমে দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় স্ত্রীকে পুত্র নিয়ে থাকতেন।

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় মুসলিম লীগ বিরোধী দল গঠনের চেষ্টা চলে। এদল গঠনে যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন, তাঁরা হলেন কামরুদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক প্রমুখ। ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ১৯৪৭ সনে বি. এ. পাস করেন। ১৯৪৭ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এ, কে, ফজলুল হক এই সময় ঢাকার নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিরোধী দল গঠনের চেষ্টা করেন। তিনি ১৯৪৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকার সিরাজউদ্দৌলা পার্কে জনসভা আহবান করেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনের সমর্থকরা সভাস্থল আক্রমন করে এবং সভা মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিন একখানা চেয়ারও আগুন থেকে রক্ষা পায়নি। ফজলুল হক কোনো রকমে অক্ষত অবস্থায় এক হাজার গজ দুরে কাদের সর্দারের বাড়িতে পৌঁছে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন।

তখন ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রচন্ড দাপট। সরকার কোনো বিরোধী শক্তিকে সহ্য করতে নারাজ। ফজলুল হক ১৯৪৬ সনে মুসলিম লীগে যোগ দিলেও নীরব ছিলেন। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে তিনি ঢাকা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা করতেন। তিনি ঢাকা হাই কোর্ট বারের প্রথম সভাপতি।

উদীয়মান মধ্যবিত্ত মুসলমানের ভেবেছিলেন পাকিস্তান হলে তাঁরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্য–সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের অবাধ সুযোগ পাবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল শুরু থেকেই পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে।

---

৮৬. হাসেম আলী খাঁন, সিরাজ উদ্দীনব আহমেদ- ১৯৮৫ বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে পরিকল্পিতভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। পুর্ববাংলার দুর্বল নেতৃত্ব সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ও আমলারা এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ শুরু করে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার সম্পদের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ হতে থাকে। মুসলমান যুবকদের চরম হতাশার সময় কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে এবং তাদের গণভিত্তি দৃঢ় হতে থাকে। তাই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তারাই ছিল প্রগতিশীল সংগঠন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সনের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৭]

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার সাহিত্য–সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করতে পারলে বাঙালীরা তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে ফেলবে। তাই উর্দুকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৭১ সনে পাক–বাহিনীর হাতে নিহত) উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। মুসলিম লীগ সরকার এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। সেদিন পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম সদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের সমর্থন করেছিলেন। বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁরা কথা বলেন নি। ছাত্র লীগ মুসলিম লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসে। ১৯৪৮ সনের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে, অনেক ছাত্র আহত ও বন্দি হয়। এদিকে পুরাতন হাই কোর্ট থেকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং তাঁদের সাথে ফজলুল হকও ছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জি.ও.সি জেনারেল আইয়ুব খান তার 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার' গন্থে এক বিবরণ দেন। তাতে আইয়ুব খান লেখেন, তিনি হাই কোর্টের কাছে এসে দেখেন ফজলুল হক ছাত্রদের আদালতের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে বলছেন। হাই কোর্টের কাছ থেকে চলে এসে ফজলুল হক সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রদের সাথে মিলিত হন। হঠাৎ একদল ছাত্রকে পুলিশ ধাওয়া করে। ছাত্ররা দৌড়ে এসে জড়ো হন। তখন পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে।

৮৭.
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মজাহারুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী- ১৯৭৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক ছাত্র আহত হলো। পুলিশের লাঠির আঘাত ফজলুল হকের হাঁটুর ওপর পড়ে। তাঁকে ধরাধরি করে হাই কোর্টে নেয়া হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর সেই ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়। প্রথমে এই ক্ষত গুরুতর মনে না হলেও পরে এই পায়ের ব্যথায় আজীবন তাঁকে কষ্ট পেতে হয়। ভাষা আন্দোলন তাঁর ওপর এতটা প্রভাব ফেলে যে, আইনসভায় নিয়ম ভঙ্গ করে ফজলুল হক ও আরও কয়েক জন কয়েকদিন বাংলায় বক্তৃতা করেন। আইনসভায় ইংরেজি অথবা উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেয়ার নিয়ম ছিল। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেয়া হতো না।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সনের ১৯ মার্চ ঢাকা আগমন করেন। তাই খাজা নাযিমউদ্দিন রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতাদের সাথে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে একটি চুক্তি করেন এবং বন্দিদের মুক্তি দেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে ও কার্জন হলের সভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। ঢাকার ছাত্রসমাজ জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ করে।

১৯৪৮ সনের ৯ই জুন মুসলিম লীগ সরকার জননিরাপত্তা আইন বা কালা কানুন পাস করে। তারপর শুরু হয় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও বিনাবিচারে জেলখানায় আটক রাখার। ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুসহ কয়েকজন ছাত্রকে বহিস্কার ও জরিমানা করেন। মুচলেকা দিয়ে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় আদেশের কাছে নতি স্বীকার করেননি।

বিরোধী দল গঠন

পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনীতি গড়ে উঠার পিছনে শেরে বাংলা ফজলুল হক ছিলেন বিরাট শক্তি। তাঁকে সামনে রেখে ছাত্রসমাজ ১৯৪৯ সনে ঢাকার আর্মানিটোলা ময়দানে লীগ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি ছাত্র র‍্যালির আহবান করে। সভার সভাপতি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রি এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসাম জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সনে ঢাকায় এলে লীগ সরকার তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দি করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম ছাত্র লীগ ও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল দল একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্যোগ নেয়। ঢাকার মোগলটুলীর মুসলিম লীগের কর্মীশিবির অফিসের যুব কর্মীরা নতুন দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সনের ২৩-২৪শে জুন প্রায় ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

নেতা ও কর্মী ঢাকার হুমায়ুন মিয়ার বাড়িতে মিলিত হন। এ সভায় ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে জুন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, মুসলিম লীগ শাসনে জনসাধারণের চরম দুর্ভোগ হচ্ছে এবং ব্যাক্তি স্বাধীনতা পদদলিত করা হচ্ছে। দলীয় প্রভাবের চাপে সদস্যরা বিভিন্ন গণদাবি আইনসভায় পেশ করতে পারেন না। অবিলম্বে যুবসমাজ ও লীগ কর্মীদের সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। পরিশেষে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে সংগ্রামের জন্য তিনি নিজেও প্রস্তুত আছেন। সভায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' দল গঠন করা হয়। পরে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গে প্রথম গঠিত বিরোধী দল।

১৯৪৯ সনের মে মাসে নুরুল আমিন সরকার দমন মূলক বিশেষ ক্ষমতা আইনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পত্রিকা দৈনিক ইত্তেহাদ ও আরও কয়েকটি ভারতীয় পত্রিকা পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ ও সিলেটের নওবেলাল বন্ধ করে দেয়। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালি ১৯৪৯ সনের ১২ই আগস্ট শুক্রবার বেলা ৪-৩০ মিনিটে ভিক্টোরিয়া পার্কে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) বিরাট প্রতিবাদ সভা আহবান করে। প্রতিবাদ সভার সভাপতি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রি এ, কে, ফজলুল হক। প্রচারপত্রের আবেদন হলো,"সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ মানে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। পূর্ববঙ্গ সরকার ইত্তেহাদ এবং অপরাপর পত্রিকার পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। পূর্ববঙ্গে সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে আপনারা এই বিরাট প্রতিবাদ সভায় দল দলে যোগদান করুন। নিবেদক পাকিস্তান ছাত্র র‍্যালী।" ফজলুল হক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা গঠনের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং সরকারের প্রতি অবিলম্বে উক্ত আদেশ প্রত্যাহরের দাবি জানান। ১৯৫০ সনের ৪ঠা নভেম্বর তিনি বরিশালের বি.ডি. হাবিবুল্লাহকে এক পত্রে লেখেন,"দেশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। করাচির দেবতারা মনে করেছেন পূর্ববাংলার লোকগুলো সবই ছাগ, মেষ এবং তাদের যদৃচ্ছা জবাই করে খাওয়া যায়। তারা আরও মনে করেন যে, পূর্ববাংলা শুধু দুগ্ধবতী গাভীর দেশ এবং বাংলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আর বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিন সুদুর নয় যখন শার্দুল আবার গর্জন করে মেদিনী কাঁপিয়ে তুলবে।"[৮৮] এ পত্রে পশ্চিম পাকিস্তান শোষক চক্রের বিরুদ্ধে শেরে বাংলার চাপা আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে।

---

৮৮. শতাব্দীর কণ্ঠস্বর এম.এম. আজিজুল হক, ঢাকা- ১৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ফজলুল হক বাইরে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করলেও এসময় তিনি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র পরিষদে নীরব ভুমিকা পালন করেছেন। কারণ সেখানে তাঁর কোনো সমর্থক ছিল না।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আইন পরিষদে তিনি কোনো প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন নি। এসময় আইন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ঢাকা হাই কোর্ট ছাড়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি মামলা পরিচালনা করতে যেতেন এবং পুরানো কর্মীদের সাথে সংযোগ রক্ষা করেচলতেন। ১৯৪৮ সনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় ঢাকা হাই কোর্ট বার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬ সন পর্যন্ত প্রতি বছর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫১ সনে পূর্ববাংলার সরকারের এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হন এবং এ পদে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

১৯৪৭ সন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের অঙ্গ কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। উত্তরবঙ্গেতে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৮ সন থেকে লীগ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নির্যাতন চালায় এবং শত শত কর্মী গ্রেফতার করে। ১৯৪৮ সনের ১৩ জুলাই ঢাকায় পুলিশ বিদ্রোহ হয় এবং তৎকালীন জি,ও,সি মেজর জেনারেল আইয়ুব খান অষ্টম রেজিমেন্টের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন।

১৯৪৯ সনের ১১ই মার্চ ঢাকা জেলে বন্দিরা অনশন পালন করেন। ৯ ডিসেম্বর জেলে অত্যাচারের ফলে কমিউনিস্ট কর্মী শিবেন রায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫০ সনে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোলে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইলা মিত্রের ওপর পুলিশ পাশবিক অত্যাচার করে। তিনি দীর্ঘদিন রাজশাহী জেলে অসুস্থ অবস্থায় কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৫৪ সনে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হলে ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় প্রেরণ করেন এবং তারপর পাকিস্তান আমলে ইলা মিত্র আর বাংলায় ফিরে আসেন নি।

১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি নাথুরাম গডসে গুলি করে গান্ধীকে দিল্লিতে হত্যা করে। ফলে হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা ও বরিশালে দাঙ্গা হয় এবং শত শত হিন্দু নিহত হয়। বরিশালে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজকর্মী আগরপুরের আলতাফউদ্দিন আহমেদ দাঙ্গাকারীদের হাতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি শহীদ হন। আলতাফউদ্দিনের হত্যাকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ববঙ্গে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে ধর্ম নিরপেক্ষ সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আলতাফউদ্দিন আহমেদ প্রথম প্রাণ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সনে ছাত্র লীগ ও ১৯৪৯ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে। তাদের সাথে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন ও কংগ্রেস। বিরোধী রাজনীতি অঙ্গনে মুসলিম ছাত্রলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ থেকে ৫২ সন পর্যন্ত মুসলিম লীগ ছাত্রদের একমাত্র সংগঠন ছিল। ১৯৫৩ সনে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে একে অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত করা হয়। ছাত্রলীগের প্রথম আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদ। ১৯৪৯ সনে ছাত্র লীগের পূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ছিলেন তিনি আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সনে ছাত্র লীগের সভাপতি ছিলেন দবিরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন খালেক নেওয়াজ। ১৯৫০-৫৩ সনে ছাত্র লীগের সভাপতি হন খালেক নেওয়াজ এবং সম্পাদক হন কামরুজ্জামান। ১৯৫০ সনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসে টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে শামসুল হক মুসলিম লীগের প্রার্থী কে, কে, পন্নীকে পরাজিত করে আইন সভায় নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে আটক করে এবং জেলখানায় বসে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর স্থলে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কমিউন্সিট পার্টির প্রভাবে ১৯৫১ সনের ২৭শে মার্চ যুবলীগ গঠিত হয়। যুবলীগের প্রথম সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সম্পাদক অলি আহাদ। পরে ইমাদুল্লাহ যুবলীগের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৫১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রথম সেনাপতি জেনারেল গ্রেসি অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলে লে. জেনারেল আইয়ুব খান সেনাপতি নিযুক্ত হন। আইয়ুব খানের সময় থেকেই পাকিস্তানে ষড়যন্তের রাজনীতি শুরু হয়। ১৯৫১ সনের ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে গভর্নর জেনারেল নাযিমউদ্দিন প্রধান মন্ত্রি নিযুক্ত হন।

১৯৫০ সনে মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রকাশ করে। পূর্ববাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ বিপিসির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করে। বিপিসি ছিল পূর্ববাংলাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র। গণপরিষদে পূর্ববাংলা থেকে যাঁরা প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে হাত মেলায়। পূর্ববাংলার জনতা মাওলানা ভাসানী, কামরুদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন প্রমুখের নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৫১-৫২ সনে পূর্ববাংলায় তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার লবণ শিল্প ধ্বংস করে দেয়। ফলে লবণের সের ১৬ টাকায় ওঠে। লবণের সের ১৬ টাকা হওয়ায় লীগ সরকার জনপ্রিয়তা হারায়। ১৯৫২ সনের ৩০শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাযিমউদ্দিন ঢাকার পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, উর্দূই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে। নাযিমউদ্দিনের এই ঘোষণার ফলে পূর্ববাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গঠন করা হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী আবদুল হামিদ খান ভাসানী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এবং কাজী গোলাম মাহবুব আহবায়ক নির্বাচিত হন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আবু হাশিম, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মতিন, মুহম্মদ মুজিবুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, শামসুল হক চৌধুরী, অলি আহাদ, শামসুল আলম, মুহম্মদ সুলতান, গাজীউল হক ও খালেক নেওয়াজ প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে রাষ্ট্র ভাষা কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় শেখ মুজিবর রহমান এবং বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ জেলে বন্দি ছিলেন। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাদেশিক আইন পরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে যায়। পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে রফিক, বরকত, জব্বার, সালাম শহীদ হন এবং ১২ জন আহত হন। ছাত্র হত্যার সংবাদ শুনে ফজলুল হক তাঁর ভাগ্নে সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়াকে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চলে আসেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিহত ও আহতদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নূরুল আমিন সরকারের ভাষার দাবিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং সফিকুর রহমান শহীদ হন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এবং অবাঙালি মূখ্য সচিব আজিজ আহমেদ ছাত্র হত্যা কান্ডের জন্য দায়ী ছিলেন। লীগ সরকার শত শত ছাত্র ও নেতাকে বন্দি করে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমেদ জেলে অনশন শুরু করেন। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আনোয়ারা বেগম পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সনে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পরাজয়ের ভয়ে সরকার পূর্ববঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দিচ্ছিল না। তাই ফজলুল হক ১৯৫২ সনে এক পত্রে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমউদ্দিনকে ১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি সরকারকে হুশিয়ার করে, "সরকার যদি নির্বাচনের প্রশ্ন একদিকে ফেলে রাখতে চান তবে নির্বাচনের দাবিতে দেশব্যাপী আমাদেরকে গণআন্দোলন শুরু করতে হবে। কিন্তু এ'রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্বে আমরা সরকারকে দেশবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ দিতে চাই। " সরকার তার মন্ত্রীদের ও সদস্যদের পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচন ১৯৫৪ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখে।

১৯৫২ সনের শেষ ভাগে ছাত্র লীগের একটি অংশ ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে। ১৯৫৩ সনের ১৭ই জানুয়ারি হাজী মোহাম্মদ দানেশ সভাপতি, মহিউদ্দিন আহমেদ সহ-সভাপতি এবং মাহমুদ আলীকে সম্পাদক করে গণতন্ত্রী দল গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আবুল হাশিমের নেতৃত্বে খেলাফতে রব্বানী পার্টি গঠিত হয়। মাওলানা আতাহার আলী গঠন করেন নেজামে ইসলাম পার্টি। এছাড়া ছিল কংগ্রেস ও তফসিলি দল। কউিনিস্ট পার্টি ছিল নিষিদ্ধ। তাদের দলের কর্মী অনেকেই আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ, ১৬ টাকা সের দরে লবণ, খাদ্যাভাব, কোরিয়ায় যুদ্ধের ফলে পাটের নিম্ন দাম, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্প ক্ষেত্রে বৈষম্য, ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যা প্রভৃতি ঘটনা মুসলিম লীগকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। মুসলিম লীগের পতন অত্যাসন্ন হয়ে উঠে। লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তখন সর্বত্র প্রতিবাদ সমাবেশ চলছে। ১৯৫৩ সনে মাওলানা ভাসানীর মুক্তির দাবি জানিয়ে ফজলুল হক বক্তৃতা দেন। তখন তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেল। এপ্রিল মাসে ভাসানী মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সনের ২২শে মার্চ রোববার ফজলুল হক তাঁর কে, এম ,দাস লেনস্থ বাসভবনে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করেন। সভায় সকল বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রাদেশিক নির্বাচন আসন্ন। তাই ফজলুল হক মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে সকল বিরোধী দলকে এক মঞ্চে সমবেত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রি খাজা নাযিমউদ্দিনকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত করেন। খাজা নাযিমউদ্দিনকে পদচ্যুত করায় বিরোধীদলের আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক শ্রমিক পার্টির জন্ম

প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ফজলুল হক বিভিন্ন জেলায় জনসভা করেন। তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। **১৯৫৩ সনের ২৭শে জলাই তাঁর বাসভবনে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মীদের এক সম্মেলন ডাকেন এবং 'প্রজা' শব্দ বাদ দিয়ে 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন করেন।** কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি হলেন এ, কে, ফজলুল হক এবং সম্পাদক হলেন আবদুল লতিফ বিশ্বাস। দলের নেতাদের মধ্যে ছিলেন আশরাফ আলী চৌধুরী, আবুল হোসেন সরকার, আবদুল ওহাব খান, হামিদুল হক চেধুরী, মোহন মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া প্রমুখ। তিনি বিভিন্ন জেলায় জনসমাবেশে ভাষণ দেন। ১৯৫৩ সনের ২১ ও ২২শে জুন বরিশালে জনসভা করেন। ৮ই আগস্ট ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশন হলে আইনজীবী সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে উচ্চারণ করলেন একটি চির স্মরণীয় বাণী,"পাকিস্তান হলো' কিন্তু কেন্দ্র স্থাপিত হলো বৃত্তের ওপর"। তিনি ১৪ই অক্টোবর বরিশাল টাউন হলে, ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর চট্টগাম, ২৪শে নভেম্বর জামালপুর, ২৮শে নভেম্বর খুলনার জনসমুদ্রে ভাষণ দেন। তাঁর প্রত্যেকটি জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হতো। সারা বাংলায় সৃষ্টি হয় গণজোয়ারের।

মুসলিম লীগের অন্তর্বিরোধের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরম খাঁ মুসলিম লীগের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। ১৯৫৩ সনের অক্টোবর মাসে কাউন্সিল কমিটির সভা ডাকা হয়। হামিদুল হক চৌধুরী ও মোহন মিয়া ফজলুল হককে সভাপতি করার চেষ্টা করেন। সভায় নূরুল আমিনের নাম প্রস্তাব হওয়ায় ফজলুল হক শেষ বারের মতো মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর নেতৃত্বে এবং একক জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে কৃষক শ্রমিক পার্টি সংগঠিত হতে থাকে। দ্রুত অপরাপর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের চেষ্টায় দলটি পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ফজলুল হক কোন প্রতিবন্ধী ভূমিকা রাখেননি। তিনি আইন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকবার কারণে কৃষক প্রজা পার্টি রাজনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি। ১৯৫৩ সন থেকে রূপান্তরিত কৃষক শ্রমিক পার্টি তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে রাজনীতিতে অপরিহার্য দল হিসেবে জায়গা করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৪

পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন ও কৃষক শ্রমিক পার্টি

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের সূত্রপাত হয়। মূলত জাতীয়তাবোধের বিকাশের অনিবার্য ফল হলো রাজনৈতিক সচেতনতা। উনিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। এক্ষেত্রে অপরাপর যেসব নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বোম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরাজী, বদরউদ্দীন তায়েবজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং বাংলার আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র প্রমূখ। এ সময়ে নেতৃবৃন্দ উপলব্দি করেছিলেন যে, বিক্ষিপ্ত ও একক প্রতিবাদের স্থলে সমিতির মাধ্যমে যুক্তভাবে অগ্রসর হলে ভারতবাসীর মধ্যে জনমত জাগ্রত করা সম্ভব হবে। এ চিন্তা চেতনা থেকে উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়। পরবর্তীতে এরই পথ ধরে ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে।

৪.১ সাংবিধানিক রাজনীতির ক্রমবিকাশ

উনবিংশ শতাব্দিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে এবং ইউরোপের গণতান্ত্রিক ভাবধারা তাদের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে। তৎকালীন ইউরোপের নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদরা প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের সুফলের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তাদের নতুন রাজনৈতিক চেতনার ঠিক সূচনাতেই সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতিকে চিরন্তন-সত্য বলে ধরে নেন। বার্ক, মেকলে প্রমুখ কয়েক দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতিকদের 'রাজনৈতিক দেব দূত' ছিলেন। আর পেইন ও মাৎসিনি ঐ সময়ের শহুরে বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবেগময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। গ্রিফিথস (Griffiths) বলেছেন যে, "এরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ববর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির বিকাশ ঘটার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।[৮৯] এ বিকাশ ধারায় ইংল্যান্ডের অনুপ্রেরণায় বাংলায় নেতৃত্ব দান করে। অনিল শীল (Anil Seal) তিনি বলেছেন যে, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে ব্রিটিশ রাজ এবং তাঁর শিক্ষিত ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে একটি বিচ্ছেদমূলক ব্যবধান দেখা দেয়"।

---

৮৯. (P.J. Griffiths, The British Impact on India, pp.254-55)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে, "During the last decades of the century a gap began to open between the Raj and some of its educated subjects."[৯০]

বাংলায় রাজনৈতিক সমিতি

শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে রাজনৈতিক সমিতি গঠন আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি শহরগুলো কেন রাজনৈতিক সমিতির কেন্দ্রে পরিণত হয় তার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয় যে, প্রথমত, ব্রিটিশের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এ প্রেসিডেন্সি শহরগুলো। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প এবং ইংরেজি শিক্ষারও এগুলো কেন্দ্রস্থল ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্ররা এ প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে বসবাস করত।

দ্বিতীয়ত, প্রতি প্রেসিডেন্সি শহরের নিজস্ব চরিত্র ছিল। কলিকাতার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ শহরে দিল্লিবা লক্ষ্ণৌর-এর মত কোন পুরাতন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না। কলিকাতার দেশীয় ও বিদেশীর সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত ছিল। কলিকাতায় মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পার্থক্য ছিল। অভিজাতদের মুখপাত্র ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ইয়ং-বেঙ্গলের প্রেরণায় মধ্যবিত্তরা ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য উদারতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে সচেতন হয়। তুলনামূলকভাবে, মোম্বাই শহরে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ছিল কম। ১৮৪৮ খ্রিঃ মোম্বাই এলফিনস্টোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোম্বাই এর পার্শী সম্প্রদায় ছিল শিক্ষিত, সচেতন ও গতিশীল। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাজ কলিকাতার থেকেও এগিয়েছিল।

এ সকল কারণে প্রেসিডেন্সি শহরগুলোকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সমিতিগুলো গড়ে উঠে। অনিল শীল এ সমিতির যুগকে "রাজনৈতিক সমিতির আদিযুগ" (Proto political associations) বলে অভিহিত করেছেন। এ সমিতি গঠনের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসে।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (Banga Bhasa Prakashika) ঃ ১৮৩৬ সালে রাজা রাম মোহন রায়ের সহযোগীরা "বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এটি বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করত এবং সরকারের নিকট আবেদন করার মাধ্যমে সমস্যার প্রতিকার কামনা করত।

---

৯০. (Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism)

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার সমিতি (Landholders Society)

জমিদার সমিতিকে ভারতে প্রথম রাজনৈতিক সমিতি হিসেবে ধারণা করা হয়। ১৮৩৭ সালে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে জমিদার সমিতি গঠিত হয়। জমিদাররাই সাধারণত এ সমিতির সদস্য হতেন। এ সমিতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৩৮ সালে এ সমিতির নাম পরিবর্তন হয়ে ল্যান্ড হোল্ডারর্স সোসাইটি করা হয়। (Landholders Society) এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম থেকেই ল্যান্ড হোল্ডারর্স সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে সংকীর্ণ জাতিভেদ বা আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে একটি উদারনৈতিক নীতি প্রতিফলিত হয়। সমিতির অন্যতম নেতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূমি মালিকদের স্বার্থের পাশাপাশি রায়ত বা কৃষকদের অধিকার রক্ষার কথাও বলেছিলেন। তিনি সমিতির মাধ্যমে ভারতবাসীর নিয়মতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এ সোসাইটি ছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি

১৮৪৩ সালে থম্পসন (Thompson) নামে উদারপন্থী এক ইংরেজ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ এবং ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা করা ছিল এ সমিতির লক্ষ্য। ভারতীয় জনগণের অবস্থা ইংল্যান্ডে প্রচারের ক্ষেত্রে এ সমিতি ভূমিকা রেখেছিল। এ সমিতির সরকারের কাছে সরকারি চাকরিতে বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরি ব্যবস্থা দ্বারা বিচার, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা গঠনের জোর দাবি জানায়। এ সমিতির দাবির ফলেই ভারতে কোম্পানি সরকার ভারতীয়দের মধ্যে হতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ দান করেছিলেন।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association)

কোম্পানির সনদের মেয়াদ ১৮৫৩ সালে শেষ হয়ে এলে, নতুন সনদ কোম্পানিকে প্রদানের প্রাক্কালে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী পার্লামেন্টের কাছে ভারতবাসীর দাবি দাওয়া জানানোর দরকারবোধ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৫১ সালের ২৯ অক্টোবর কলিকাতায় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ এ সমিতিতে যোগ দেন। এ সমিতির বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন জমিদার। জমিদার ছাড়াও বড় বড় ব্যবসায়ী এবং রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এ সমিতির সদস্য হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল আসলে এর আগে প্রতিষ্ঠিত দু'টি সমিতির মিলনের দ্বারা গঠিত। এ দু'টি সমিতির নাম ছিল জমিদার সমিতি (Bengal Landholders Society) এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশন (Bengal British Indian Association) এ দুটি সমিতি ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কেবলমাত্র জমিদারদের স্বার্থই দেখত। শেষ পর্যন্ত এ দুটি সমিতি মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। এ সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬৮% ভাগ ছিল জমিদার বা ব্যবসায়ী। গোড়ায় রাজা রাধাকান্তদে এ সমিতির সভাপতি ছিলেন। পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের লোকেরা কিছুকাল সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এ সমিতির সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার ছিল ৫০ টাকা। এ সমিতি প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবত। তবে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কেও এ সমিতি প্রস্তাব নিত।

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, এ সমিতির সদস্যরা যদি দেখতেন যে, জাতীয় দাবি সমর্থন করলে তাঁদের শ্রেণী স্বার্থ অথার্ৎ জমিদারীর বা ব্যবসায় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে তাহলে তাঁরা পিছু হাটতেন। তবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন আই-পি-এস পরীক্ষার্থীর বয়স কমানোর প্রতিবাদ করে এবং হেইলেবেরী কলেজ লোপ করার দাবি জানায়। ১৮৫৪ খ্রিঃ এ সমিতি কলিকাতা কর্পোরেশন বিলের প্রতিবাদ করে এবং নির্বাচন অপেক্ষা সদস্য মনোনয়নকে সমর্থন জানায়। এছাড়া এই সমিতি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৫৯ খ্রিঃ খাজনা আইনের প্রতিবাদ করে। কারণ এর ফলে জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। বিচার বিভাগের সংস্কার ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের জন্য এ সমিতি দাবি জানায়। সরকার মাঝে মাঝে এ সমিতির সাথে আলোচনা করতেন এবং কোন আইন পাস করার আগে এ সমিতির মতামত নিতেন। বড়লাটের আইন পরিষদে এ সমিতির সদস্যরা মাঝে মাঝে মনোনিত হতেন।

এ সমিতি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং এ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সমিতির অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। সমিতি জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র হওয়ায় এবং মফস্বলে এ সমিতির প্রভাব না থাকায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন বিশেষ সফল হতে পারে নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন লাভে এ সমিতি ব্যর্থ হয়। কলিকাতার প্রতিভাপন্ন ছাত্রদের এ সমিতি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ক্রমে এ সমিতি কিছু সংখ্যক জমিদার পরিবারের কুক্ষিগত হয় যথা, শোভাবাজারের দেব, জোড়াসাঁকোর ঠকুর, উত্তরপাড়ার মুখার্জী পরিবারের সমিতির জনসংযোগ ক্ষীণ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Association)

শীঘ্রই ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন লীগের স্থান গ্রহণ করে। ইন্ডিয়ান লীগের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ও ভাঙ্গন দেখা দিলে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, বাংলার মধ্যবিত্ত এবং জনসাধারণের অভাব অভিযোগ ও দাবি তুলে ধরার জন্যে বাংলায় কোন সমিতি নেই। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সেই অভাব পূরণ করবে। এ সমিতি জনশিক্ষা বিস্তার ও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্যে কাজ করবে। এ সমিতির সদস্য চাঁদা ছিল ৫ টাকা এবং সমিতিটি ছিল প্রকৃতই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র। এ সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন ৩৩% শিক্ষক, ৩৫% আইনজীবী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু সংখ্যক বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। এ সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের হার ছিল বেশি এবং বেশ কিছু কলিকাতার বাইরের মফস্বলের লোক ছিলেন।

এ সমিতির ২৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১০ জন ছিলেন কলিকাতার গ্রাজুয়েট, ১ জন কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট, ৫ জন ব্যারিস্টার প্রভৃতি। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক জমিদার ছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে দলে দলে ছাত্ররা ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনে যোগ দেয়। অনিল শীলের মতে, ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশন ছিল গ্যাজুয়েট ও চাকুরে শ্রেণীর প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্র, যাঁরা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে দাবি করতেন। এ সমিতির বহু শাখা মফস্বলের শহরে ছড়ান হয়। ১৮৭৬-৭৭ খ্রিঃ ছিল ১০টি শাখা। ১৮৮৭-৮৮ খ্রিঃ-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪ টিতে। মফস্বলের স্কুলের ছাত্ররা শহরের ছাত্রদের মতই সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে ইন্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে পরিণত হয়। ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র ছিল গণতান্ত্রিক। যুবক শ্রেণীর কর্মীরা এ সমিতিতে কাজ করার সুযোগ পেত। তবে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের হাতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের মত অর্থবল ছিল না। ১৮৮৮ খ্রিঃ মোট চাঁদার পরিমাণ ছিল মাত্র ১১৪২ টাকা।

ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জেলাগুলোতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন বিষয়ে এ সমিতি আবেদন, প্রচার ও আন্দোলন গঠন করে। প্রথমত, কৃষক শক্তি সম্পর্কে এ সমিতি সচেতন ছিল। ১৮৫৯ খ্রিঃ রেন্ট এ্যাক্ট ও পাবনা কৃষক বিদ্রোহে এ সমিতি কৃষকদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করে। ১৮৮৪ খ্রিঃ প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়ার এরা প্রতিবাদ করনে। ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতি, আমদানি ও শুল্ক আইন, সম্পদের নিষ্ক্রমণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ সমিতি প্রতিবাদ জানায়। শ্রীরজত কান্ত রায়ের "ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ ও একাধিপত্যের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সচেতন প্রতিবাদ জানায়।"[৯১]

---

৯১. (Rajt Kanta Ray- Urban Roots in Indian Nationalism etc.)

Dhaka University Institutional Repository

অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে কৃষকের প্রকৃত বন্ধু বলা যায় না। যদিও এ সমিতি মধ্যবিত্ত কৃষক ও জোতদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু এ সমিতি বর্গা চাষী ও প্রজাদের বিষয়ে দৃষ্টি দেয় নি।

ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন জেলাগুলোতে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। আই-সি-এস পরীক্ষায় যাতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় যোগ দিতে পারে এজন্য এবং জেলাবোর্ড ও পৌরসভার সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগের জন্যে দাবি জানান হয়। জেলা শহরগুলোতে এ জন্য সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীঃ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন চালু হলে, জেলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জেলা বোর্ড ও পৌরসভার নির্বাচনে অংশ নিতে এ সমিতি উৎসাহ দেয়। কৃষক ও গ্রামের মধ্যবিত্তদের সমিতির প্রতি অনুরাগী করার জন্যে গ্রামীণ সদস্য চাঁদা এক টাকা ধার্য করা হয়। কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সাথে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশনের গোলমাল হয়। কর্পোরেশনে জমিদার ও অভিজাতদের প্রাধান্য খর্ব করতে এ সমিতি চেষ্টা চালায়। লর্ড লিটনের দমন মূলক আইনগুলোর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সক্রিয় ও সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়। এ প্রতিবাদকে এ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় চরিত্র দেয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে-"এ্যাসোসিয়েশনকে সর্বভারতীয় চরিত্র দান করার চিন্তা অনেকদিন ধরে তাঁর মনে কাজ করছিল।"[৯২] লর্ড লিটনের আই-সি-এস পরীক্ষার্থীর বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ ধার্য করা, অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উপলক্ষে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সক্রিয় ও সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়। সুরেন্দ্রনাথ আই-সি-এস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমানোর বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান শহরগুলোতে জনসভা অনুষ্ঠান করে সর্বভারতীয় জনমত গড়ে তুলেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ কলিকাতার এক জনসভায় এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে একটি আবেদন পত্রও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পাঠানো হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়া এ্যাশোসিয়েশনের পতাকার নীচে এক সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এ দৃষ্টান্ত জাতীয় কংগ্রেসের পথ রচনা করে। লর্ড লিটন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ভারতীয়দের কণ্ঠরোধ করা জন্যে ১৮৭৮ খ্রিঃ দেশীয় সংবাদপত্র আইন পাস করেন। এ সাথে তিনি অস্ত্র আইন পাস করেন। ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন কলিকাতার টাউন হলে এ দুই আইনের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এ সভায় যোগ দেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর লর্ড রিপন আইনটি সংশোধন করলে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মর্যাদা বাড়ে।

---

৯২. (A Nation in Making- Surendra Nath Banerjee.)

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড রিপনের আমলে আইন মন্ত্রী কোর্টনী ইলবার্ট ভারতীয় বিচারকদের ক্ষেত্রে ইংরেজ বিচারকদের সাথে বৈষম্য দূর করার জন্যে একটি বিল রচনা করেন। তাঁর নামেই বিলটি ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়। এ বিলে ভারতীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামী ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হলে তার বিচারের অধিকার দেয়া হয়। ইউরোপীয় সম্প্রদায় এজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে বিলটির তীব্র বিরোধিতা করে। সুরেন্দ্রনাথের পরিচলনায় ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনসভা ও সংবাদপত্রে মতামত জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপন ইংরেজ প্রতিবাদীদের চাপে বিলটি সংশোধন করেন।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়। ইংরেজদের মতই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে ইন্ডিয়ান এ্যাশোসিয়েশন সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন (ন্যাশনাল কনফারেন্স) আহ্বান করে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস একটি মামলায় শালগ্রাম শিলাকে স্বাক্ষীরূপে আদালতে আনার নির্দেশ দেন। সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় এজন্য বিচারপতি নরিসকে তীব্র আক্রমন করেন। আদালত অবমাননায় সুরেন্দ্রনাথের কারাদন্ড হলে বাংলার ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়ে সভাসমিতি করে প্রতিবাদ জানায়। স্যার আশুতোষ তখন ছাত্র। তিনিও এ প্রতিবাদের পুরোভাগে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজ অধ্যাপকদের, ছাত্রদের শিরোমণি ছিলেন।

মহাজন সভা (Mahazon Association)

বয়স্ক নেতাদের চাপে উত্যক্ত হয়ে মাদ্রাজের নবীন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতারা ১৮৮৪ সালে 'মহাজন সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বণিক সংঘে গণতান্ত্রিক নীতির প্রসার ছিল এ সমিতির অন্যতম লক্ষ্য। মাদ্রাজের থিওজফিপন্থীদের সাথে যুক্তভাবে এ সভা সর্বভারতীয় সংহতির চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহাজন সভার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা থিওজফিপন্থীদের পছন্দ না হওয়ায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও ভারতে ও বিদেশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এদের মধ্যে 'চৈত্রমেলা' পর 'হিন্দু মেলা' নামে প্রসিদ্ধ এবং বিদেশে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৩৯) 'ইন্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি' (১৮৫৩) এবং ১৮৮৬ সালে দাদাভাই নৌরাজী প্রতিষ্ঠিত 'ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোশিয়েশন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমিতিগুলো দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এদের স্থান ছিল অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। সুতরাং দেখা যায়, ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশে উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

কিছু রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমিতিগুলো ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে সরকারের কাজকর্ম এবং নীতির যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করে। সমিতিগুলো ক্রমে নিজ প্রদেশের বাইরে অন্য প্রদেশের সমিতির সাথে মত ও আদর্শের আদান-প্রদানের দ্বারা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। মহাজন সভা জেলাগুলোতে শাখা স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে উদ্যম দেখায়। ১৮৮৫ খ্রিঃ দাদাভাই নৌরোজীর পরামর্শে মহাজন সভা একটি সর্বভারতীয় সমিতি গঠনের জন্যে প্রস্তাব নেয়। শ্রীযুক্ত অনিল শীল তাঁর 'The Emergence of India National' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "রাজনৈতিক সমিতি গঠনের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষ আধুনিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে।" ভারতে আঞ্চলিক, ভাষা ও জাতি ভিত্তিক ব্যবধান অতিক্রম করে ভারতবর্ষকে এক ধর্ম নিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সমিতি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে এ রাজনৈতিক সমিতিগুলো প্রেরণা দেয়। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে এর আগেও ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু তার পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ থাকলেও ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সে বিদ্রোহগুলো দেখা দেয়। এ প্রথম রাজনৈতিক সমিতিগুলো জাতি অঞ্চল, ভাষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটি সার্বিক রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণের পথে আগাতে থাকে। রাজনৈতিক সমিতিগুলো যদিও প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জানায়, তথাপি, তারা সরকারের কাজকর্ম এবং নীতির অবিরাম ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা চালায়।

এ সমালোচনাকে আশ্রয় করে অধিক সংখ্যক ভারতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হয়। ভারতে ব্রিটিশের শাসন ব্যবস্থার ঐক্য ও ইংরেজি ভাষার প্রসারের সুযোগ নিয়ে এ সমিতিগুলো ক্রমে নিজ প্রদেশের বাইরে অন্য প্রদেশের সমিতির সাথে মত ও আদর্শের আদান প্রদানের দ্বারা সর্বভারতীয় রানৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়। অনিল শীলের মতে, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতি ছাড়াও অন্যান্য শহরে অনেক রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয়। গোটা উপমহাদেশ জুড়ে স্থানীয় সমিতিগুলোকে অতিক্রম করে একটি সর্বভারতীয় সমিতি স্থাপনের প্রস্তুতি দেখা দেয়। লর্ড রিপনের ভারত ছাড়ার সময় ভারতের সর্বত্র তাঁকে যে অভিনন্দন জানানো হয়, তার পশ্চাতে এ সমিতিগুলোর ভূমিকা ছিল। লর্ড রিপনের বিদায় সম্বর্ধনায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে উদ্যম, উৎসাহ এ সমিতিগুলো দেখায় তাকে একটি সর্বভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক রুপদানের কথা নেতারা ভাবতে থাকেন। ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় একটি "জাতীয় পার্লামেন্ট"(National Assembly) গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ খ্রিঃ ভারতের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে ন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিঃ জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন শহরগুলোতে রানৈতিক সভা সমিতির ঘন ঘন অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে জাতীয় সম্মেলনের (National Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন তাঁর ভাষণে বলেন যে, "কার্যতঃ এ মুহূর্তে সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির সমস্যাগুলো পর্যালোচনার জন্যে মিলিত হওয়ার বাসনা করছে।" সুতরাং এ রাজনৈতিক সমিতিগুলোই "সমিতির যুগ" (Age of Associations) সৃষ্টি করে যার ফলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়।

৪.১.১ মুসলিম লীগের উদ্ভব

সাংবিধানিক রাজনীতির পথ ধরে ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির পর বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় মুসলীম লীগ। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হতে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সরকারের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষক হিন্দু সম্ভ্রান্ত শ্রেণী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতা স্যঅর সৈয়দ আহমদ খাঁন মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ না দিতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন। তিনি আলীগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর মতো অন্যান্য মুসলমান নেতারাও বিশ্বাস করতেন যে, একটি পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে মুসলমানগণ বৃটিশদের প্রতি বিরোধিতার পরিবর্তে আনুগত্যের মাধ্যমেই অধিকতর সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। এ উপলব্ধি এবং অনুবর্তী সক্রিয়তা। আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

এ চিন্তার অনুসরণে নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে মোহামেডান লিটারি সোসাইটি (১৮৬৩), সেন্ট্রাল মোহামেডান, এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭), ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৮) এবং অনেক স্থানীয় আঞ্জুমান গড়ে ওঠে।

ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের মিথ্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ আলোচনা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রচার করার জন্য বছরে একবার অনানুষ্ঠানিকভাবে সভায় মিলিতি হতো। এমনি এক সভা (সর্ব ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন) ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ কংগ্রেস সমর্থকদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ মোকাবিলা করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনিও সভায় একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠনের প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতি নওয়াব ভিকার উল মূলক প্রস্তাবিত সমর্থন করেন এবং এভাবে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়।

সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যাবলি ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ১৯১০ এর দশকে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমলে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে মুসলিম লীগ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি। ১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগঠনটি রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ ছিল না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জিন্নাহর নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। ১৯৩৭ সালে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ,কে, ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর ফলে তার মন্ত্রিসভা কার্যত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়। হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিম লীগের *** পরিণত করা হয়। ১৯৪০ সনে ফজলুল হক মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি দাবি করে- "লাহোর প্রস্তাব" উত্থাপন করেন।

১৯৪৩ সন থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে মুসলিম লীগ একটি যথার্থ জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হালিম এর নেতৃত্বে মুসলিম লগি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১০টি আসন অর্জন করে।

ফলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লীগই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একক সংগঠন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলের সংগঠনে পরিণত হয়।

৪.২ পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উৎপত্তি

অনেক পরে বাঙালি মুসলমানেরা রাজনীতির আধুনিক যুগে পদার্পন করে। শিক্ষাদীক্ষায়, সংস্কৃতি চেতনায়, আশা আশঙ্কায় অনেকটা পরিণত হয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের পদাচরণ শুরু হয়। ১৯৪০ সালের দিকে তাদের এই রুপান্তর হয়ে উঠে অনেকটা বৈপ্লবিক। ১৯৫০ এর সময়কাল থেকে তাই দেখা যায় বিভিন্নভাবে তাদের গতিশীল প্রকাশ। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ ছিল তাদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩০ সাল থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত ছাত্র নেতৃত্বও ছিল মুসলিম লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাকিস্তান ছাত্রলীগের মাধ্যমেই তারা মুসলিম লীগের রাজনীতিকে প্রাণবন্ত করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও এই সংগঠন ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। মাত্র কিছু দিনের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মুসলিম লীগে উপদল গঠন এবং চূড়ান্ত পর্বে তা বিভক্ত হলে পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হয় নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন। ১৯৪৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর শামসুল হকের নেতৃত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগের জন্ম হয় এক আলোচনা সভায়। পূর্ব বাংলায় এটি হল সব প্রথম অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্য বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী, বিশ্বশান্তিসূচক গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে সমর্থন দান। কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন উপদলের গোপন কার্যক্রম রত বেশ কিছু নেতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে এর সৃষ্টি হয়। ১৯৫১ সাল থেকে এই সংগঠন জোরে সোরে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় জন্ম হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের (The East Pakistan Muslim Students League)। যদিও এই সংগঠনের নামে 'মুসলিম' শব্দটি সংযোজিত ছিল, ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত এর কাউন্সিল অধিবেশনে এই শব্দটি বাদ দিয়ে একে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন রুপান্ত রিত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরানো ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার সকল জেলা থেকে আগত নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের এক আলোচনা চক্রে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এটি ছিল বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম লীগ বিরোধী দল। ১৯৫৫ সালে এই সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে একে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে পরিণত করা হয়। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বেশ কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ ও তরুণ নেতা কর্মী। মাওলানা ভাসানী ছিলেন একজন অভিজ্ঞ কৃষক নেতা, দীর্ঘ কারাগার জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। এক তরুণ ছাত্রনেতা শামসুল হক নির্বাচিত হন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন পরিচালনাকারী ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন এই দলের যুগ্ম সম্পাদক। অল্প দিনের মধ্যেই এই দলটি দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। কার্যত পূর্ব বাংলার উঠতি নেতাকর্মীর দক্ষ এক প্ল্যাটফরম রূপে গড়ে ওঠে আওয়ামী লীগ। সনাতন পন্থী মুসলিম নেতাকর্মীদের দল হিসাবে ১৯৫০ সালে গড়ে উঠে নিজাম-ই-ইসলাম। এই দলের কর্মসূচি ছিল কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। প্রধানত বামপন্থী নেতাদের উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগানের কেন্দ্র রূপে ১৯৫২ সালে গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৫৩ সালে জন্ম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী দলের। এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বামপন্থী নেতাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। আবুল কাশেম ফজলুল হকের সমর্থকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে কৃষক শ্রমিক পার্টি, ১৯৫৩ সালে। ১৯৪৭ সাল

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল একমাত্র বিরোধী দল। ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন শ্লোগান নিয়ে কংগ্রেসও নিজেকে সুসজ্জিত করে এই সময়।

নতুন নতুন দল ও চাপ সৃষ্টিকারী এসব সংগঠনের জন্য, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সৃষ্টি, পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন এক ধারা সৃষ্টি করে। এই নতুন ধারায় প্রতিফলিত হয় নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন নেতৃত্বের নতুন চিন্তা ভাবনা। জমিদার শহরাঞ্চলের পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গড়া অতীতের নেতৃত্ব থেকে নতুন নেতৃত্ব ভিন্ন হয়ে ওঠে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশীদারিত্ব, গ্রামাঞ্চলভিত্তিক ছাত্রকর্মীর অংশগ্রহণে। নতুন নতুন নেতা উদ্যোগ–উদ্দীপনা, কর্ম–দক্ষতায়, নতুন ভাবনায়, সচকিত তারুণ্যে ভরা নতুন নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ একটি জাতীয়তাবাদী, বাম ও ডানপন্থী প্রভৃতি বহুমুখী স্বার্থেও প্রতিনিধিত্বকারী একটি মিশ্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভারতীয় জনগণের কাছে আকাশচুম্বী জনপ্রিয় ছিল। মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মুসলিম লীগের অনন্য ভূমিকা এ দলকে আরও মর্যাদাবান করে তোলে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে তাদের ব্যক্তিগত সংগঠনে পরিণত করে। এ দলের সদস্যপদ লাভের সুযোগও সীমিত করে দেয়া হয়। উপরন্ত ক্ষমতাসীন চক্রের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও গণবিরোধী কার্যকলাপের ফলে অনেক মুসলিম লীগসদস্যই নিদারুণ অসন্তোষের প্রেক্ষিতে দল ত্যাগ করে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী এক সময়ের বিপুল জনপ্রিয় এদল গণবিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক কর্মকান্ড আরম্ভ করে। মুসলিম লীগের ঔপনিবেশিক মনোভাব এবং অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলে দ্রুত এর জনপ্রিয়তা নষ্ট হতে থাকে। এমতবস্থায় মুসলিগ লীগের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটে। মূলত মুসলীম লীগ দলীয় সদস্যদের স্বৈরাচারী মনোভাব ও আচরণই পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দল উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং বিরোধীদলের জন্য পটভূমি তৈরী করে দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন পূর্ব বাংলায় তেমন কোন বিরোধী দল ছিল না। একমাত্র 'আওয়ামীলীগ' ছিল শক্তিশালী বিরোধী দল যা প্রথমে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত ছিল। ধীরে ধীরে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহে অন্তর্ভূক্ত হয়, 'পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস', 'সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন'

Dhaka University Institutional Repository

'জামায়াতে ইসলাম', 'নেজামে ইসলাম', 'পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি', 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)' প্রভৃতি দল।

আওয়ামী মুসলীম লীগ ঃ

আওয়ামী মুসলীম লীগ পাকিস্তানের প্রথম শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল। এ দলের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় সকলেই পাকিস্তান মুসলীম লীগের সদস্য ছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতাগণ এ সময় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরাম খান, নুরুল আমীন প্রমুখ পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ নেতাও এতে যোগ দেন। মুসলিম লীগ নেতাদের ও গণবিরোধী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে এবং এর কেন্দ্রীয় নেতাদের নিকট আবেদনে কোন সুবিচার না পেয়ে মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণ অংশ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আওয়ামী মুসলীম লীগ নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। রোজ গার্ডেনের এ রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ-সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্যতম যুগ্ম–সম্পাদক করে সরকারি মুসলীম লীগের বিপরীতে আওয়ামী (অর্থাৎ জনগণ) লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে দলটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ।[৯৩]

১৯৫১ সালের ২৪ জুন মুসলীম লীগের হুমকি উপেক্ষা করে আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আরমানিটোলা ময়দানে। ১৯৫১ সাল থেকে এ দলটি দেশবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য দেশব্যাপী কর্মীসভা ও জনসভা শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী মুসলীম লীগ সোচ্চার হয়ে উঠে। মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলীম লীগ বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

আওয়ামী লীগ ঃ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে.এম.দাস লেনের 'রোজ গার্ডেন'- এ অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্যতম যুগ্ম–সম্পাদক করে সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী (অর্থাৎ জনগণের) লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৯৩. আবু আল সাইদ- আওয়ামী লীগের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

শুরুতে দলটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রুপমহল সিনেমা হলে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশন দলের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী দলের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ' এর পরিবর্তে নতুন নামকরণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' (সংক্ষেপে, আওয়ামী লীগ)। অর্থাৎ দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। এ ছিল একটি ঐতিহাসিক ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এর ফলে, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়। দলের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে।

নীতি ও আদর্শ ঃ

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও মিশ্র অর্থনীতিতে বিশ্বাসী দল। প্রতিষ্ঠাকালে দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত রাখা ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের বিভক্তি এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রে, অন্তত প্রাথমিক পর্বে, কোন বিরোধী দল গঠন ছিল দুঃসাহসিক ব্যাপার। মুসলিম লীগ সরকার কোনো রকম বিরোধিতা আদৌ সহ্য করতে পারতো না। বিরোধী দলের প্রতি সরকারের অপপ্রচার ও সরকারি রক্তচক্ষু মোকাবেলায় উদ্যোক্তারা নবপ্রতিষ্ঠিত দলের নাম রাখলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। তাছাড়া তখনো পাকিস্তানে ধর্ম-সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

দলের ভূমিকা ঃ

পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম কার্যকরী বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অভ্যুদয় ঘটে। তবে সূচনা থেকেই এটি ছিল বাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দল। সর্ব-পাকিস্তান দল হিসেবে কখনো এটি আবির্ভূত হয় নি। তা ছিল এর শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই উৎস। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি, নির্ভেজাল গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, দু'অঞ্চলের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য অবসান ইত্যাদি কর্মসূচি অবলম্বন এবং এর বাস্তবায়নের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত এ দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল মুখ্য। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত মারি চুক্তির আওতায় পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে 'এক ইউনিট' গঠন ও দু'অংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে 'সংখ্যাসাম্য নীতি' অনুসরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

দাবির ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ায় বাঙালিদের কাছ থেকে এ দলকে সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল- এ ছাড় দেয়ার বিনিময়ে তারা বেসামরিক প্রশাসন, সামরিক বাহিনীর নিয়োগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সমতার নীতিগত স্বীকৃতি আদায় করেছে।

আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে ১৯৫৬-৫৮-এ সময়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রায় দু'বছর পূর্ব পাকিস্তানে সরকার পরিচালনার সুযোগ পায়। এছাড়া, ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৩ মাস ক্ষমতাসীন থাকে। তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ঃ

প্রতিষ্ঠা ঃ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে ন্যাপের প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তনের পররাষ্ট্র নীতি ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে (সন্তোষ) অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে তা প্রকাশ্য বিদ্রোহ রুপ নেয়। সোহরাওয়ার্দী তখন ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বা পাশ্চাত্যঘেষা পররাষ্ট্রনীতির কট্টর সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীরা জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দীও ক্ষুরধার যুক্তির নিকট টিকতে না পেরে এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ওয়াকিং কমিটির সাইত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে ন'জন পদত্যাগ করেন। একই বছর ২৫-২৬ জুলাই ঢাকার রুপমহল সিনেমা হলে ভাসানীর আহ্বানে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, খান আবদুল গাফফার খান, জি.এম.সৈয়দ মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখ বামপন্থী নেতা উপস্থিত হন। এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন রাজনৈতিক দল, ন্যাপ গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার কিছু বামপন্থী কর্মীও উদ্যোগে গঠিত 'গণতন্ত্রী দল', পশ্চিম পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল পার্টি' সহ আরো ক'টি প্রগতিশীল সংগঠন এ দলে অন্তর্ভূক্ত হয়।[৯৪]

---

৯৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ১৩৫-১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

নীতি ও আদর্শ ঃ

সাম্রাজ্যবাদ, সামান্তবাদ, বর্ণ-বৈষম্যবাদের বিরোধিতা, জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শোষণহীন সমাজ, পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদি ন্যাপের মূল নীতি ও আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়।

দলের ভূমিকা ঃ

ন্যাপের প্রতিষ্ঠাকে বামপন্থী, কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তানের মার্কিন বা পাশ্চাত্যঘেষা পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জন্মলগ্ন থেকেই ন্যাপ সোচ্চার থাকে। ন্যাপ গঠিত হলে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০ জনের মতো সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে এ দলে যোগ দেন। কেউ কেউ মনে করেন, আওয়ামী লীগকে দুর্বল করার জন্য পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল ন্যাপের গঠনকে প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহিত করে। তুলনামূলকভাবে, কৃষক, শ্রমিক সাধারণ জনগণের মধ্যে ন্যাপের সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আলোচ্য সময়কালে সাংগঠনিকভাবে এ দল তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম না হলেও, ঘন ঘন সরকারি ক্ষমতার পট পরিবর্তনে আইনসভার অভ্যন্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' ভেঙ্গে দিয়ে সেখানকার প্রদেশগুলোকে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসা এবং পাকিস্তানের জন্য 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তনের সমর্থনে ন্যাপ দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি) ঃ

প্রতিষ্ঠা ঃ

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছিল ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির নতুন সংস্করণ। ব্রিটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বাংলায় প্রজা আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে ফজলুল হকের নেতৃত্বে তা কৃষক-প্রজা পার্টি নাম গ্রহণ করে (জুলাই ১৯৩৬)। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কর্মসূচি নিয়ে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে কৃষক-প্রজা পার্টি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। নির্বাচণের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। দু'দফায় তিনি ১৯৩৭-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ভারত বিভক্তির পূর্বে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র চারটি আসন লাভ করে। বস্তুত পাকিস্তান আন্দোলনের স্রোতে অন্যরা ভেসে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক প্রাথমিক কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। বয়সে তিনি তখন সত্তর-উর্ধ্ব। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে তিনি এ পদ

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করে সারা প্রদেশব্যাপী তাঁর অনুসারীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দিলে কেউ কেউ নিজ সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে ফজলুল হকের দলে যোগ দেন। এদের মধ্যে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও হামিদুল হক চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

নীতি ও আদর্শ ঃ

শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কৃষক-প্রজার স্বার্থে অনেক কিছু করেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তিনি ছিলেন এর উপস্থাপক। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় ভিন্নমুখী অবস্থান গ্রহণ করলেও ফজলুল হক ছিলেন বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক বিশ্বাসে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর নবগঠিত কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি) পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে অবস্থান নেয়।

দলের ভূমিকা ঃ

ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছিল নির্বাচনমুখী ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল। সাংগঠনিকভাবে এ দল আওয়ামী লীগের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল। পুনরায়, এটি ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক দল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এর আত্মপ্রকাশ। কে.এস.পি. ছিল যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল। ৫৪-র নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় অর্জনে সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কে.এস.পি. প্রধান শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচনোত্তর ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। দু'মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৯২(ক) ধারা বলে কেন্দ্র কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হয়। এদিকে যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান শরিক দল, আওয়ামী লীগ ও কে.এস.পি'র মধ্যে তীব্র মতোবিরোধ দেখা দেয়ায় অচিরেই ফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। এরপর বিভিন্ন দল পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। একই কারণে, কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠন এবং তার স্থায়িত্বে চরম অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। ফজলুল হকের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ এবং তাঁর দলের পূর্ব পাকিস্তানে একাধিকবার সরকার গঠন, এ দ্বারা সুদূরপ্রসারী কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা পালন সম্ভব হয় নি।[৯৫]

---

৯৫. আল আহাদ- জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা- ২৮২-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

নিজাম-ই-ইসলাম ঃ

১৯৫৩ সালে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল ইসলামপন্থী দল। এর প্রধান ছিলেন মওলানা আতাহার আলী। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এর সেক্রেটারি জেনারেল।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল হিসেবে নিজাম-ই-ইসলাম থেকে ৫৪ সালের নির্বাচনে ১৯ জন সদস্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। নিজাম-ই-ইসলাম গণভিত্তিসম্পন্ন কোনো দল ছিল না। তবে, যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভূক্ত থাকায় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রচারণা মোকাবেলায় সহায়ক হয়। নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে, এ দল থেকে তিনি আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে অন্তর্ভূক্ত করেন। অচিরেই যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের মতবিরোধ দেখা দিলে, নিজাম-ই-ইসলাম হক সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করে এবং বেশ কিছু কাল তাঁর সঙ্গে থাকে।

কমিউনিস্ট পার্টি ঃ

প্রতিষ্ঠা ঃ

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তানে পৃথক পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্ট সদস্যদের এক কংগ্রেসে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য সাজ্জাদ জহিরকে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক করা হয়। একই দিন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিগণ একটি আলাদা সম্মেলনে মিলিত হয়ে সুধীন রায় ওরফে খোকা রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন মনি সিংহ, বারীন দত্ত, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, পুর্ণেন্দু দস্তিদার প্রমুখ।

নীতি ও আদর্শ ঃ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত বি.টি. রনদীভের থিসিস গ্রহণ করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তার যাত্রা শুরু করে। এই থিসিস অনুযায়ী স্থির হয়-(ক) কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক-এ দু'টি বিপ্লব এক সঙ্গে সমাপ্ত করতে হবে, অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক। (খ) সংস্কারবাদের পথ পরিত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামী ধারা ও ভূমিকা ঃ

পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে পূর্বে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল। তাই, পার্টির তৎপরতা পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক হয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল। তবে পূর্বে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকেও নানা সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। ভারত বিভক্তির সময় এ অঞ্চলের কমিউনিস্ট সদস্যদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান। অপরদিকে, যে সম্প্রদায়িক উন্মাদনার ভেতর ভারত বিভক্ত হয়, সেখানে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম চালানো খুবই কঠিন ছিল। যা হোক, প্রথমে পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের লাইন অনুসরণ করে। অচিরে এর হঠকারিতা উপলব্ধি করে গণআন্দোলন ও জনসম্পৃক্তির লাইন বেছে নেয়। এরই অংশ হিসেবে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গণসংগঠন যেমন, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন, আরো পরে ন্যাপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় এবং সে সময়ে দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের (১৯৪৯) সঙ্গে থেকে পার্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও এ নীতি অনুসরণ করে এবং বেশ কয়েকজন পার্টি সদস্য যুক্তফ্রন্টের টিকেটে মুসলিম আসনে নির্বাচিত হন। সাধারণ বা হিন্দু আসনে পার্টির ৪ জন প্রার্থী জয়লাভ করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের পর ৪ জুলাই (১৯৫৪) কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ন্যাপ এসময় কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে পার্টি কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।[৯৬]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলের টংক, সিলেটের নানকার এবং রাজশাহীর নাচোলের সাঁওতাল ইত্যাদি কৃষক বিদ্রোহ কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দেয়। এছাড়া, ৫২-র ভাষাআন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪) এবং সিয়াটো ও সেন্টো সামরিক বিরোধিতার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার ফ্রন্ট সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিশেষভাবে, সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গণচেতনা জাগিয়ে তোলা এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারার বিকাশে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

---

৯৬. মুসা আনসারী বামপন্থি রাজনীতি সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০২-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দল ঃ

গণতন্ত্রী দল ঃ

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বামপন্থী কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে (দিনাজপুর) সভাপতি এবং মাহমুদ আলীকে (সিলেট) সাধারণ সম্পাদক করে 'পাকিস্তানি গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়। দলটি র‍্যাডিকাল কর্মসূচিতে বিশ্বাসী ছিল। বস্তুত রাজনৈতিক দলের চেয়ে এটি ছিল বামপন্থী কর্মীদের একটি সংঘ বা গ্রুপ। এটি গঠনের পেছনে কমিউনিস্ট পার্টিরও সমর্থন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ এর কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হন। বেশিদিন এ দল টিকে থাকে নি।

জামায়াতে ইসলামী ঃ

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ভারতে মওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে এ দলের প্রতিষ্ঠা। তখন এর নাম ছিল জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর নাম হয় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান। অখন্ড ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলে এ দল ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তা মেনে নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়। ১৯৫১ সালে এ দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখা মওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক গোলাম আজম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন। জামায়াতে ইসলামী একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। গণসংগঠন অপেক্ষা এটি ক্যাডারভিত্তিতে সংগঠিত। কোরআন ও সুন্নাহরভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন ছিল এ সময়ে এর মূল দাবি। পাকিস্তানের রাজনীতির এ পর্ব অপেক্ষা আইয়ুব-দশকে এ দলের তৎপরতা অধিকতর লক্ষণীয় ছিল।

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ঃ

অমুসলিমদের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ছিল প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান অঞ্চলভুক্ত কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এ দল গঠিত হয়। নতুন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া ছাড়াও কংগ্রেস বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হয়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে (১৯৪৭ -৫৪) কংগ্রেসই ছিল সরকারিভাবে স্বীকৃত বিরোধী দল। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি তুলে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন ঃ

সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশন ছিল পাকিস্তান কংগ্রেস দল এর উত্তরসূরি। এ দলের সদস্যরা দলে তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে সন্দিস্থান ছিল। সিডিউল কাষ্ট সদস্যরা আইনসভায় তাদের পৃথক সদস্যপদ এবং প্রশাসনে বিশেষ চাকরি কোটা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করেন। একজন সিডিউল কাষ্ট হিন্দু সদস্য পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য ছিল।

৪.৩ ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন ঃ

১৯৪৭ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী পাকিস্তানে একটি গণপরিষদ তথা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।

কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতির শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রায়শই হস্তক্ষেপ করত। প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ প্রায়ই ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বাধীনতা লাভের সাত বছরের মধ্যে দশটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। যেমন- ১৯৪৭ সালের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান সাহেব এবং রশিদের মন্ত্রিসভা, ১৯৪৮ সালে সিন্ধু প্রদেশে খুরু, (Khuro), ১৯৪৯ সালে সিন্ধুর খোদা বক্স এবং পাঞ্জাবের মামদূত খান, ১৯৫১ সালে সিন্ধুর খুরু, (Khuro), ১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের মোমতাজ খান দৌলতানা, ১৯৫৪ সালে সিন্ধুর পরীজাদা আব্দুস সাত্তার, পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান এবং পূর্ব বাংলার ফজলুল হক। কেন্দ্রীয় সরকারের এ হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা খোদ প্রদেশগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়ই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২–ক ধারা জারি করে প্রাদেশিক সরকারের স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে ব্যাহত করত।[৯৭]

---

৯৭. Shamsul Huda Harun, Parliamentary Behavior in A Multinational State 1947-58: Bangladesh Experience, Dhaka 1984. PP.203-32

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন প্রত্যাশিত ছিল, তথাপি ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা স্থগিত থাকে। নানা অজুহাতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত করাটা আসলে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতারই পরিচয় বহন করে। এই দল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কংগ্রেসের মতো ১৯৪০-এর দশকের মুসলিম লীগ ছিল জাতীয়তাবাদী, বাম ও দক্ষিণপন্থী ইত্যাদি বহুমুখী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি মিশ্র প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং দেশ বিভাগ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে এ দলে যোগদান করেছিল, তাদেরকে আর ধরে রাখা এ দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি।[৯৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছরেই (১৯৪৭-৫৪) জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষ করে পাকিস্তান মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক উপদলসমূহের মধ্যে ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর কাছে প্রায় অপরিচিত 'উদু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন উদ্যোগ এই বিরোধকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। পুর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের অসম বন্টন ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সাংবিধানিক সরকারের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে ১৯৫৩ সালের ১৭ই এপ্রিল খাজা নাযিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেন যদিও তিনি গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাবান ছিলেন। মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত পরবর্তী সরকার অনেক চেষ্টা করেও সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সুচিত হয়েছিল তার একটা বিরাট প্রভাব পাকিস্তানের রাজনীতির উপর গিয়ে পড়ে। সে যা-ই হোক ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশল ও জোর পূর্বক নীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে।

---

৯৮. (Keith Callard, Pakistan: A Political Study, P.162)

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি প্রাদেশিক নিবাংচনে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দী অবশ্য এর জন্য নির্বাচনে কারচুপি, বল প্রদর্শন, ভয়-ভীতি প্রদর্শনকে দায়ী করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলায় এর বিপরীতধর্মী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এখানে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং ক্ষমতাসীন লীগ নেতৃবৃন্দ কোনরুপ নির্বাচন দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর বরং প্রাদেশিক পরিষদের মেয়াদ গণপরিষদের মাধ্যমে বর্ধিত করতে সচেষ্ট ছিলেন।[৯৯]

১৯৪৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর নিজের জেলা ময়মনসিংহের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূণ্য আসনগুলির উপনির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। এটি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগের জনসমর্থন নেই, তখন তিনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে প্রাদেশিক আইনসভার ৩৪টি আসন ছিল শূণ্য। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জি. ডাব্লিউ চৌধুরী মন্তব্য করেন, "এমনকি প্রাদেশিক আইনসভার কার্যকালও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্দেশে বাড়ানো হয়, অথচ কেন্দ্রীয় আইনসভা নিজেই স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল।"[১০০]

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরপরই আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে এর সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের উপর আর কোন আস্থা নেই এবং তারা পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করতে ঐক্যবদ্ধ।[১০১]

৪.৪ যুক্তফ্রন্ট

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। তবে এ জয়লাভের পিছনে সর্বাধিক অবদান ছিল হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর।

---

৯৯. EBLA (Continuance) Act 1953

১০০. G.W. Choudhury, *Democracy in Pakistan,* (Dacca 1963), 56-57.

১০১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট,* পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর ১৯৫৫, পৃষ্ঠা- ২১।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন শেষে সোহরাওয়ার্দী বাংলার মূখ্যমন্ত্রি হন। লাহোর প্রস্তাবে আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মুসলিম লীগ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার জনগণ মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের কয়েক দিন পরেই ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল মুসলিম লীগের এক সম্মেলনে ১৯৪০ সালের মূল লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধিত করা হয়। ঐ সংশোধনীতে বলা হয় যে, ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে "একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে"। এ সংশোধনী ঘোষণার ফলে বাঙালিদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যখন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখনই বেশ কয়েকজন বাঙালী মুসলিম লীগ সদস্য এ সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। এতদসত্ত্বেও সংশোধনটি গৃহীত হয়। ঐ পেক্ষাপটে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম একটি " স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার" পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনা সফল হয়নি। বৃটিশ সরকার ষড়যন্ত্র করে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে উপমহাদেশ ত্যাগ করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। পাকিস্তানের শাসনভার স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম লীগের উপর ন্যাস্ত হয়। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠি প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ শুরু করে। পূর্ব বাংলাকে বিভিন্নভাবে শাসন ও শোষণের জন্য মুসলীম লীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ দল পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি দাওয়া পূরণ করতে অক্ষম। বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক ও ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সকল ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খাঁন, মাওলানা আকরাম খান, খাজা নাযিমুদ্দিন প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের" পকেট সংগঠন" এ পরিণত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল রীতিনীতি উপেক্ষা করে জিন্নাহ লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এর প্রতিবাদে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে "আওয়ামী মুসলিম লীগ" এর জন্ম হয়। "আওয়ামী মুসলিম লীগ" বাঙালিদের দাবি দাওয়ার সাংগঠনিক মুখপাত্রে রুপান্তরিত হয়। আর এর ফলেই মুসলিম লীগের বিরোধী একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে উঠে।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন সংঘঠিত হলে এ আন্দোলন বাঙালি জনগনকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সে সময় বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে বামপন্থী তরুনরা "গণতন্ত্রী দল" গঠন করে। আবার ১৯৫৩ সালেই এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল এর পদ ত্যাগ করে তাঁর মূল

Dhaka University Institutional Repository

দল "কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে সংগঠিত করতে প্রয়াসী হন। মোট কথা, ২১ ফেব্রুয়ারীর বিয়োগান্তক ঘটনা, ময়মনসিংহে হাজং কৃষকদের নির্মমভাবে হত্যা, খুলনায় পুলিশের গুলিবর্ষণ, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর নির্যাতন, নাটোরে কৃষক বিদ্রোহ দমনে পাশবিক নির্যাতন, লবন সংকট, পাট শিল্পের কেলেংকারী এবং বিভিন্ন ধরনের গণবিরোধী কাজের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সাত বছর পর সে নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষিত হবার পর মুসলিম লীগ বিরোধী সকল শক্তি এই ঐক্যমত্যে পৌঁছে যে, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে সরকারি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা যাবে না। আওয়ামী মুসলিম লীগের ভিতরে ও বাইরে অবস্থানকারী বামপন্থি রাজনৈতিক নেতা কর্মীগণ মাওলানা ভাসানীকে মুসলিম লীগ বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট গঠনে রাজি করান এবং তার নির্দেশনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলও ব্যক্তিবর্গের সাথে দ্রুত যোগাযোগ চলতে থাকে। ফজলুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গ সরকারের এডভোকেট জেনারেল যে পদটি গ্রহণ করেছিলেন তা ইতিপূর্বেই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। নির্বাচন ঘোষিত হবার পর ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তখন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে পূর্ববঙ্গে এসে ঐক্যফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রাখেন। মাওলানা ভাসানী ইতিপূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও ফজলুল হকসহ অন্যান্য বিরোধী মহলের সাথে অনেকে আলোচনা করে ঐক্যফ্রন্ট গঠন যখন প্রায় নিশ্চিত করে এনেছেন, তখন এতে সোহরাওয়ার্দী এসে যোগদান করার ফলে ফ্রন্ট গঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়।

এভাবে গঠিত হয় ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট। মাওলানা ভাসানী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের মধ্যমনি। সদরঘাটের ৫৬ সিমসন রোড যুক্তফন্ট্রের প্রধান অফিস স্থাপিত হয়। যুক্তফন্ট্রের নির্বাচনী প্রতীক ছিল "নৌকা"। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রথম সারির নেতা। অফিস সম্পাদক ছিলেন কামরুদ্দিন আহমেদ এবং ট্রেজারার ছিলেন আব্দুস সাত্তার (পরে বিচারপতি ও প্রেসিডেন্ট) । মনোয়ন দেবার জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। তার চেয়ারম্যান করা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এবং প্রত্যেক দল থেকে সমসংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩ সনে সাপ্তাহিক ইত্তেফাককে দৈনিকে পরিবর্তন করা হয় এবং একে যুক্তফ্রন্টের মুখপত্র হিসেবে কাজ করতে বলা হয়। কারণ এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কোন দলের লোক ছিলেন না। মোহন মিয়ার 'মিল্লাত' ও হামিদুল হক চৌধুরীর 'পাকিস্তান অবজারভার' ছিল কৃষক–শ্রমিক পার্টি সদস্যদের কাগজ। দৈনিক ইত্তেফাক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে অনন্য অবদান রাখে। সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পত্রিকায় শোসকের নামে কলাম লিখতেন। তার লেখনি জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতেফাক পড়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টে মহান ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে ঐতিহাসিক ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয়। আর মুসলিম লীগ স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি ও পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা সংক্রান্ত প্রধান ইস্যুকে সামনে রেখে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ, কে, ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নিযাম ই ইসলাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রী দল অর্থ্যাৎ মধ্যপন্থি, গণতন্ত্রী, ইসলামী, বামপন্থি ইত্যাদি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সত্যিকার অর্থে ব্যপক ভিত্তিক জোটের রূপ লাভ করে।

৪.৪.১ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো

নির্বাচনের প্রাক্কালে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম যুক্তফ্রন্ট, ২১ দফা সম্বলিত এমনই একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটিই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ২১ দফা।

১৯৫৪ সনের জানুয়ারিতে যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর থেকে একুশ দফা কর্মসূচি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

একুশ দফা ঃ

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে,

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সংগত ভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ব–বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলে কেলেংকারী তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ব বাংলাকে লবন শিল্পে উন্নত করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবন তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে লবন কেলেংকারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করে তাহাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা হবে।

৭. খাল–খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা এবং দূর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করিতে হবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করতে হবে এবং আর্ন্তাতিক শ্রমিক সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়া একই পর্যায়ভূক্ত করে সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহার্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সহ প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতন ভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্নবেতন ভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিসাওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর, ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীর মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্র দ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা হবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে যারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছে তাহাদের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরুপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমিক করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতে আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পুরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।[১০২]

---

১০২. S.F. Levin- "The Peoples Party" in A.M. Yakov (ed) Pakistan : History and Economy, (Moscow, 1969), P- 86, 21 দফা সম্পর্কে বিস্তারিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদলসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

যে সকল দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল সে সকল দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

আওয়ামী মুসলিম লীগ ঃ

আওয়ামী মুসলিম লীগ' পাকিস্তানের প্রথম শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল। এ দলের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাগণের প্রায় সকলেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র পরিচারনার ভার মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতাগণ এ সময় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেও ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। খাজা নাজিমুদ্দিন, মাওলানা আকরাম খান, নুরুল আমীন প্রমুখ পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতাও এতে যোগ দেন। মুসলিম লীগ নেতাদের গণবিরোধী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে এবং এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় লীগ নেতাদের নিকট আবেদন করে কোন সুবিচার না পেয়ে মাওলানা ভাসানী ও হোসন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণ ও ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। রোজ গার্ডেনের ও রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক করে সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী (অর্থ্যাৎ জনগণ) লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে দলটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ"।

১৯৫১ সালের ২৪ জুন মুসলিম লীগের হুমকি উপেক্ষা করে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আরমানিটোলা ময়দানে। ১৯৫১ সাল থেকে এ দলটি দেশবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য দেশব্যাপী কর্মীসভা ও জনসভা শুরু করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ সোচ্চার হয়ে উঠে। মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই দলটির প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনের শেষ দিনে আওয়ামী মুসলিম লীগের যে কমিটি গঠিত হয় তা ছিল নিম্নরুপ।[১০৩]

---

১০৩. M. Rashiduzzaman, The Awami League Dacca- 1968, P- 576

Dhaka University Institutional Repository

ছক- ৩

সভাপতি	মাওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানী
সহ–সভাপতি	আতাউর রহমান খান
সহ–সভাপতি	আবুল মনসুর আহমেদ
সহ–সভাপতি	আব্দুস সালাম খান
সহ–সভাপতি	খয়রাত হোসেন
সাধারণ সম্পাদক	শেখ মুজিবুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	কোরবান আলী
প্রচার সম্পাদক	আব্দুর রহমান
দপ্তর সম্পাদক	মোহাম্মদ উল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ	ইয়ার মোহাম্মদ খান

কৃষক–শ্রমিক পার্টি (কে,এস,পি) ঃ

কৃষক–শ্রমিক পার্টি ছিল ফজলুল হকের কৃষক–প্রজা পার্টির নতুন সংস্করণ। বৃটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বাংলায় প্রজা আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে ফজলুল হকের নেতৃত্বে তা কৃষক–প্রজা পার্টি নাম গ্রহণ করে (জুলাই ১৯৩৬)। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কর্মসূচি নিয়ে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে কৃষক–প্রজা পার্টি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। দু' দফায় তিনি ১৯৩৭–১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রি ছিলেন। কিন্তু ভারত বিভক্তির পূর্বে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক–প্রজা পার্টি প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র চারটি আসন লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক প্রাথমিক কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। বয়সে তিনি তখন সত্তর-উর্ধ্ব। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে তিনি এ পদ ত্যাগ করে সারা প্রদেশ ব্যাপী তাঁর অনুসারীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক–শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব নিয়ে চরম দ্বন্দ –কলহ দেখা দিলে কেউ কেউ নিজ সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে ফজলুল হকের দলে যোগ দেন। এদের মধ্যে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও হামিদুল হক চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দলের ভূমিকা ঃ

ফজলুল হকের কৃষক–শ্রমিক পার্টি ছিল নির্বাচনমুখী ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল। এটি ছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক দল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এর আত্মপ্রকাশ। কে,এস,পি, ছিল যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল। '৫৪-র নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় অর্জনে সেহারাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কে,এস,পি প্রধান শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচনে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

নিযাম–ই–ইসলাম ঃ

১৯৫৩ সালে নিজাম ই ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল ইসলামপন্থী দল। এর প্রধান ছিলেন মওলানা আতাহার আলী। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এর সেক্রেটারি জেনারেল। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল হিসেবে নিযাম ই ইসলাম থেকে '৫৪ সালের নির্বাচনে ১৯ জন সদস্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। নিজাম ই ইসলাম গণভিত্তিসম্পন্ন কোনো দল ছিল না। তবে, যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভূক্ত থাকায় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রচারনা মোকাবেলায় সহায়ক হয়। নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে, এ দল থেকে তিনি আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে তাতে অন্তর্ভূক্ত করেন। অচিরেই যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের মতবিরোধ দেখা দিলে, নিযাম ই ইসলাম হক সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করে এবং বেশ কিছু কাল তাঁর সঙ্গে থাকেন।

গণতন্ত্রী দল ঃ

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বামপন্থী কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে (দিনাজপুর) সভাপতি এবং মাহমুদ আলীকে (সিলেট) সাধারণ সম্পাদক করে 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়। দলটি র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচিতে বিশ্বাসী ছিল। বস্তুত রাজনৈতিক দলের চেয়ে এটি ছিল বামপন্থী কর্মীদের একটি সংঘ বা গ্রুপ। এটি গঠনের পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ এর কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৩ নির্বাচনী প্রচারণা কেন্দ্রীক রাজনীতি

১৯৩৭ সনে এ, কে, ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ২২ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছিল। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে সেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন করে। ২১ দফা ছিল তৎকালীন সাড়ে চার কোটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ২১ দফার মধ্যে নিহিত ছিল পূর্ববাংলার স্বাধীনতার দাবি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসন, সার্বভৌমত্বের দাবি ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন ও পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দাবি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নেতারা তাদের নির্বাচনী প্রচারে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে লবন কেলেঙ্কারির ঘটনা সম্মুখে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য যে, তখন দুই থেকে তিন আনার প্রতি সের লবনের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ টাকা পর্যন্ত হয় এবং তা ভোটারদের সাংঘাতিকভাবে ক্ষুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের সুনির্দিষ্ট কোন আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিলনা। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ দলের প্রচারণা ইসলাম বিপক্ষ, পাকিস্তান বিপক্ষ 'কমিউনিস্ট ভারতীয় চর' ইত্যাদি বক্তব্য প্রাধান্য পায়। কার্যত ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে।

১৯৫৪ সনের ১০ই মার্চ প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা। যুক্তফ্রন্টের সাথে মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল যোগ দেয়। একমাত্র প্রতিদ্বন্দি মুসলিম লীগের প্রতীক ছিল হারিকেন। আইন সভার মোট আসন সংখ্যা ৩০৯। তখন স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা ছিল। মুসলিম আসন ২৩৯ এবং হিন্দু আসন ৭০টি। মহিলাদের ১০টি আসন নির্দিষ্ট ছিল। মহিলা সদস্যরা পৌরসভার মহিলাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি করে। যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয় স্লোগান ছিল-' রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।, হক-ভাসানী-হোসেন মহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ "খুনী নুরুল আমিনের ফাঁসী চাই" প্রভৃতি। এ, কে, ফজলুল হক, ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র মুসলিম লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত করতে চায়। তাঁরা লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন আদায় করার দাবিতে অটল।

মুসলিম লীগ নির্বাচনে সকল মসুলিম আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে। তাদের পেছনে ছিল পুঁজিপতিরা এবং সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র। মূখ্যমন্ত্রি নূরুল আমিন কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অবতীর্ণ হন। পুর্ববাংলার মুসলীম লীগের কোষাধ্যক্ষ ইস্পানীর প্রভাবে মিস ফাতেমা

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহ লীগের প্রচারে অবতীর্ণ হন। ই,পি,আই, ডি,সি-র তৎকালীন চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থের যোগান দেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী দলবল নিয়ে স্পেশাল ট্রেন-স্টিমারে ভ্রমণ করতে থাকেন। সংবাদপত্রগুলো ছিল তাদের একান্ত অনুগত। ১৯৫৩ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বৃদ্ধ বয়সে অসংখ্য জনসভা করেন। ১৯৫৩ সনের ১২ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি কুমিল্লা, মাইজদি, পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী এবং ১৯৫৪ সনের ১লা ও ২রা জানুয়ারি বগুড়া ও কুষ্টিয়ায় বক্তৃতা দেন। তিনি শেষ জনসভা করেন বগা ও পটুয়াখালীতে। তাঁর গণসংযোগ সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুল বিশ্বাস, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া, বি. ডি. হাবিবুল্লাহ ও গায়ক আব্দুর রাজ্জাক। বি, ডি, হাবিবুল্লাহ নির্বাচনী সঙ্গিত রচনা করেন। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গান হলো, 'হকের নৌকায় ভোট দে সবে ভাই এবং 'শোনরে লীগের কারখানা, লীগের পোলা বিলাত যায় মোগো পোলা মইষ খেদায়।" ১৯৫৪ সনের ১৯শে জানুয়ারি মূখ্যমন্ত্রি নুরুল আমিন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবদুল কাইয়ুম খান, শর্শিনার পীর বরিশাল শহরে আগমন করলে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ফলে মুসলিম লীগের কর্মী আবদুল মালেক নিহত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ বরিশালে নুরুল আমিন হত্যার ষড়যন্ত্র ও মালেক হত্যা মামলা দায়ের করে। আওয়ামী লীগ, যুব লীগ ও ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলে।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত এর ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ২১ দফা কর্মসূচিকে 'ভার্নাকুলা এলিট' অর্থ্যাৎ বাঙালি এলিট শ্রেণীর কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের' চেয়ে সমাজের বিভিন্ন বৃহত্তর সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভোটারসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ এই কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়াও ২১ দফা কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি প্রতিরক্ষা বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা রেখে অন্যান্য বিষয় পূর্বাঞ্চলের হাতে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, রাজবন্দীদের মুক্তি, নূরুল আমিনের সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমী'তে রূপান্তরিতকরণ, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশের গুলিতে যে স্থানে ছাত্ররা শহীদ হন সেখানে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই.এল.ও) বিধান অনুযায়ী শিল্পশ্রমিকদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, পাটশিল্প জাতীয়করণ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তাবিধান এবং সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এটি স্পষ্ট যে, যদিও ২১ দফা মূলত বাঙালি এলিট গোষ্ঠীরই কর্মসূচি ছিল, তবু এতে শ্রমিক ও কৃষকদের দাবিদাওয়াও অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এই কর্মসূচি-

> খুব সহজেই ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলায় যারা মুসলিম লীগ শাসনের অবসান কামনা করছিলেন তাদের জন্য ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। সরকারপন্থী লোকজন কর্তৃক ২১ দফাকে একটি অবাস্তব কর্মসূচি হিসেবে প্রচার করা সত্ত্বেও জনগণ একে পূর্ব বাংলার 'মুক্তিসনদ' হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।

তবুও এ কথা বলা দরকার যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে বৈপ্লবিক কোন কিছু ছিল না। কোন কোন দফায় অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগ ছিল বেশি। তা সত্ত্বেও ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়।[১০৪]

যুক্তফ্রন্টের সুদক্ষ নির্বাচনী প্রচারণা নির্বাচকমন্ডলীকে এ ধারণা দিতে সমর্থ হয় যে, মুসলিম লীগ 'গণবিরোধী','দুর্নীতিপরায়ণ' এবং এর শাসন পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া, যুক্তফ্রন্ট যে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী জোট তা মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে নি। এমনকি তারা জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন নির্বাচনী কর্মসূচি উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা একটি 'ইসলামিক শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করবে। লীগের মূল শ্লোগান ছিল দুটি- এক, 'ইসলাম বিপন্ন',দুই, 'পাকিস্তান বিপন্ন'। কাজেই মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব বাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। ফলে মুসলিম লীগ ভোটারদের কাছে কোন প্রশংসনীয় বিকল্প তুলে ধরতে সক্ষম হয় নি।[১০৫]

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বিমান, বিশেষ ট্রেন ও স্টিমার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। তাছাড়া মুসলিম লীগ এর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ভাড়াটে 'মওলানাকে' নিয়োজিত করে। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।[১০৫]

---

১০৪. Abu Jafar Shamsuddin, *Sociology of Bengal Politics,* (Dacca 1973), 33.

১০৫. Keelings, Contemporary Archives, April, 10-17, 1954

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের চেয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল। কেননা '৫৪ সালে অনেক নতুন ইস্যু নির্বাচনে প্রাধান্য পায়। বোধগম্য কারণেই পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান ইত্যাদি ছিল ভোটারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলি লীগকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। যেমন, *পাকিস্তান রিভিউ* পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লীগকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়।

> বিরোধীরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সাধারণ দাবিতে এমনিভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে যাতে মনে করার কারণ রয়েছে যে, তারা কোন সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতেই এভাবে একত্রিত হয়েছে এবং যেকোন প্রকারে ক্ষমতালাভই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[১০৬]

অন্যান্য যেসব পত্রিকা নির্বাচনে মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেগুলি হলো ডন (করাচি), *মর্নি নিউজ* (ঢাকা) এবং *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা)। এসব পত্রিকায়ও পূর্ব বাংলার জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার অর্থ হলো পাকিস্তানের শত্রুদের সহায়তা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন পূর্ব বাংলার জনগণকে এভাবে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়নি। পূর্ব বাংলার জনগণ চেয়েছিল, যুক্তফ্রন্ট যথেষ্ট শক্তি নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করুক। কেননা তারা মনে করেছিল, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হলে তাদের দাবিসমূহ পূরণ করা সম্ভব হবে।

মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অধিকন্তু, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের তুলনায় শক্তিশালী ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ.কে. ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীর মতো অভিজ্ঞ ও সম্মোহনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন নূরুল আমিন, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সবুর খানের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গ। তাছাড়া, মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মিস ফাতেমা জিন্নাহ, আবদুল কাইউম খান এবং সরদার ইব্রাহিম খান প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপরও নির্ভরশীল ছিল। এঁরাও নির্বাচনী প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পত্র-পত্রিকায় যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করা হয় এবং বলা হয় যে, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য প্রচুর ভারতীয় অর্থ পূর্ব বাংলায় ছড়ানো হয়েছে", যার অর্থ হলো, ভারত আশা করছে যে, যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে সে লাভবান হবে।[১০৭]

---

১০৬. The Pakistan Review, PII- 3 (1954)

১০৭. M. Rashiduzzaman, "The Awami League," P- 577.

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরিক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের প্রচারাভিযান ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য শহর থেকে সুদূর লোকালয়ে গিয়েও কাজ করতে থাকে। এমনকি ছাত্ররা ঘরে ঘরে গিয়ে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি প্রচার করার চেষ্টা করে। পূর্ব বাংলার খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা, যেমন মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবির পক্ষে বাঙালি জনমত সৃষ্টি করেন। বাস্তবিক পক্ষে স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের প্রচারণা ভোটারদের মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা আসলেই অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক ছিল।

লীগের সকল বাধা ও অপপ্রচার উপেক্ষা করে যুক্তফ্রন্টের নৌকার অগ্রাভিযান তখন অব্যাহত। জনসভায় ফজলুল হক সুন্দর গল্প বলে জনতাকে উজ্জীবিত করেন। তিনি ময়মনসিংহের নান্দাইলের জনসভায় বলেন, আপনারা আমাকে চান না নুরুল আমিনকে চান ? জনতা সমস্বরে বলেন, আপনাকে। 'খালেক নেওয়াজ আমার পোলা।' মঠবাড়িয়ার জনসভায় বললেন, মহিউদ্দিন আমার পোলা। এভাবে তিনি যুক্তফ্রন্টের সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করান। ভোটের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে বাম ডানের সমন্বয় ঘটানো হয়, যদিও সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানীর নেতৃত্বে কেন্দ্রই ছিল ভোটের শক্তিকেন্দ্র। ফজলুল হকের নেতৃত্বের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছিল মধ্যপন্থি। আওয়ামী লীগের বামে ছিল গণতন্ত্রী দল এবং ডানে ছিল ইসলাম পন্থী নিযাম ই ইসলাম ও খিলাফতে রাব্বানী। দুটি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে নতুন রাজনৈতিক দলসমূহ এই জোট গঠন করে। লক্ষ্য দুটি ছিল সমন্বয়কারী মুসলিম লীগের পরাজয় নিশ্চিত করা এবং পূর্ব বাংলার বৈধ দাবিসমূহকে সুস্পষ্টভাব উত্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮-৪৯ সনের শীত মৌসুমে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপ নির্বাচনের পর পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের আর কোন মূল আসনে মুসলিম লীগ সরকার তাদের ভরাডুবির ভয়ে উপ নির্বাচন দেয়নি। এমনকি ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পূর্ব বঙ্গে হয়নি। সে নির্বাচন পূর্ব বঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে।

পশ্চিম পাকিস্তানেও মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী ভূমিকা ও গরীব জনসাধারণের ওপর শোষণ নিপীড়ন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ১৯৫১ সালের নির্বাচনে সেখানকার প্রদেশসমূহে মুসলিম লীগ আশানুরুপ ফল লাভ করতে পারেনি। পাঞ্জাবে ১৯৭টি আসনের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ ৩২টি আসন লাভ করে। কিন্তু এই দলটি সরকারি দলের প্রবল প্রতিরোধের মুখে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। এমতাবস্থায়, সোহরাওয়ার্দী সমগ্র পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপী মুসলিম লীগ বিরোধী একটি সম্মিলিত জোট গঠনের উদ্দেশ্যে লাহোরে একটি সর্বদলীয় কনভেনশন আহবান করেন। সে সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লাল কোর্তা নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফার খান, মানকে শরীফের পীর, বামপন্থী নেতা মিয়া ইফতেখার উদ্দীন মামদোদের নওয়াব, জি,এম,সাইদ, আব্দুল মজিদ সিন্ধী, মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। এই সম্মেলন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শাসনতন্ত্র রচনা বিতর্কে না জড়িয়ে বৈদেশিক নীতি, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাব সমূহ মুসলিম লীগ সরকারের ওপর উল্লেখ্যযোগ্য কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তথাপি সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, যা পাকিস্তানের পরবর্তীকালের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে,পাঞ্জাবের জিন্নাহ আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে একাত্ম হয় এবং গঠিত হয় পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিকই থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেনি। পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে দাঁড়ায় নাম মাত্র এবং মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব বঙ্গে নয়, কেন্দ্রেও মুসলিম লীগ সরকারের বিপরীতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা রেখে অগ্রসর হতে থাকে।[১০৮]

৪.৪.৪ নির্বাচনের ফলাফল ঃ

১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইনসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি, নির্দলীয় সদদ্যগণ ৪টি এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি আসন লাভ করে। অবশ্য নির্বাচনের প্রাক্কালেই বাংলার কৃতি সন্তান এ, কে, ফজলুল হক ও অবিসংবাদিত নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পাবে। নির্বাচন শেষ হলে দেখা গেল, তাদের সেই অমোঘ বাণী ব্যর্থ হয়নি। অন্য দিকে, পূর্ব বাংলা আইন সভার অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কমিউনিষ্ট পার্টি ৪টি এবং নির্দলীয় সদস্যগণ ১টি আসন লাভ করে। অর্থ্যাৎ ৩০৯টি আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন লাভ করে। নিচে ছকের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো।

---

১০৮. Talukder Moniruzzaman, ** Politics and the Emergence of Bangladesh, Dacca- 1976, P-33

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

ছক ঃ ৪

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭টি	১। যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	২। মুসলিম লীগ	৯
	৩। নির্দলীয় সদস্য	৪
	৪। খেলাফতে রব্বানী	১
		= ২৩৭ টি
অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২টি	১। কংগ্রেস	২৪
	২। তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	৩। যুক্তফ্রন্ট	১৩
	৪। খ্রিষ্টান	১
	৫। বৌদ্ধ	২
	৬। কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	৭। নির্দলীয় সদস্য	১
		= ৭২টি
	সর্বমোট আসন (২৩৭ + ৭২)= ৩০৯টি	

যুক্তফ্রন্টের ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারি প্রাপ্ত আসন ছিল নিম্নরুপ ঃ

ছক ঃ ৫

দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ	১৪৩
কৃষক–শ্রমিক পার্টি	৪৮
নেজামে ইসলামী	১৯
গণতন্ত্রী দল	১৩
সর্বমোট	= ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর সার সংক্ষেপ

ছক ঃ ৬

নির্বাচনী এলাকা	মোট আসন	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত আসন সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা	মোট ভোটারের সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী এলাকার মোট ভোটার	প্রদত্ত মোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। মুসলমান	২২৮	-	৯৮৬	১,৫১,৫৯,৮২৫	১,৫১,৫৯,৮২৫	৫৬,৯৯,৪২৭	৩৭.৬০
২। সাধারণ	৩০	২	১০১	২০,৯৫,৩৫৫	২০,৯৫,৩৫৫	৭,৭৬,৭২৬	৩৯.১৯
৩। তফসিলী হিন্দু	৩৬	-	১৫১	২৩,০৩,৫৭৮	২৩,০৩,৫৭৮	৭,৬৬,২৪৫	৩৩.২০
৪। মহিলা							
(ক) মুসলমান	৯	-	৩২	১,৬১,৯৬৬	১,৬১,৯৬৬	৬০,৭৫২	৩৭.৩১
(খ) সাধারণ	১	১	-	২৫,৭২৬	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বতাহীন
(গ) তফসিলী হিন্দু	২	১	৩	১৪,৭৮৫	৫,০১৪	১,৭৭৯	৩৫.৪৮
৫। পাকিস্তানী খ্রিস্টান	১	১	-	৪৩,৯১১	-	-	প্রতিদ্বন্দ্বতাহীন
৬। বৌদ্ধ	২	-	১২	১,৩৬,৪১৭	১,৩৬,৪১৭	৩৯,২৮৭	২৮.৮০
মোট	৩০৯	৫	১,২৮৫	১,৯৯,৪১,৫৬৩	১,৯৭,৪৮,৫৬৮	৭৩,৪৪,২১৬	৩৭.১৯

উৎস ঃ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, ১৯৫৪-এর উপর প্রণীত রিপোর্ট থেকে সারণিকৃত।

৪.৪.৫ নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'নৌকা'। প্রতীকটি হক ভাসানীর প্রতীক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ফলে 'নৌকা' প্রতীক প্রাপ্তির বদৌলতে যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রী দল সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী ও আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ দলীয় এ, কে, রফিকুল হোসেন বিপুল ভোটাধিক্যে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই কেন্দ্র দুইটি ছিল যথাক্রমে সরাইল, নাছিরনগর এবং নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর। উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মনোনয়ন, বাছাই ও প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাওলানা তাজুল ইসলাম ও মাওলানা মোসলেউদ্দিন আহম্মদকে এই দুইটি কেন্দ্র হতে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করায়। ফলে তাদের ভাগে পরাজয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও একাগ্র প্রচেষ্টা এবং শেরে বাংলা ও মাওলানা ভাসানীর বিপুল জনপ্রিয়তার ফসল যুক্তফ্রন্টের এই অপূর্ব রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সাফল্য। জনাব সেহারাওয়ার্দী সম্যকভাবেই সচেতন ছিলেন যে, যেকোন রাজনৈতিক অভিযানের সাফল্য পরিশ্রমী ও সৎ কর্মী বাহিনীর উপর নির্ভরশীল এবং তিনি নির্দ্বিধায় সৎকর্মীদের দেয় অভিমত ও রিপোর্ট বিশ্বাস করতেন। সোহরাওয়ার্দী কুমিল্লা সিলেট মহিলা আসনের জন্য পূর্বাহ্নে যুক্তফ্রন্ট কৃর্তক মনোনীত প্রার্থী মিসেস রাজিয়া বেগমের মনোনয়ন বাতিল করে এক অজানা অপরিচিতা মিসেস আমেনা বেগমকে যুক্তফ্রন্টের

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়ন দান করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও মজলুম নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে সেতুবন্ধন। মান-অপমান জ্ঞান তুচ্ছ করে সোহরাওয়ার্দী যদি যুক্তফ্রন্টের ৫৬ নং সিমসন রোডস্থ দ্বিতল অফিসে বসে রাত দিন পরিশ্রম না করতেন, তা হলে আঁতুড় ঘরেই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো।[১০৯]

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্যও পরাজয় বরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। খালেক নেওয়াজ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ৭ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুস সেলিমের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতা, যেমন মোনায়েম খান, টি, আলী, খান এ, সবুর, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল প্রমুখ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, সে মুসলিম লীগের জন্য এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল একটি চরম আঘাত। এমনকি ইসলামের দোহাই এবং পৃথক নির্বাচনের ওয়াদাও মুসলিম লীগকে' ৫৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারে নি। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রকে অবাধে নিজেদের পরোক্ষ ব্যবহার করেও মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার গণরায়কে পরিবর্তন করতে পারে নি। যুক্তফ্রন্টের এই বিপুল বিজয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমি স্বার্থবাদীদের মোহমুক্তিই শুধু ঘটায় নি, তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও করে তোলে। নির্বাচনী ফলাফলে ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পূর্ব বাংলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার হয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এই নির্বাচনে মুসলমান মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টা আসনে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই আসনগুলির সব ক'টিতেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। '৫৪ সালের নির্বাচনে সন্ত্রাস, প্রতারণা, কারচুপি প্রভৃতি অনুসৃত হয়েছে বলে কোন মহল থেকে অভিযোগ উঠে নি।

বাকেরগঞ্জ জেলায় ভোটার তালিকায় কিছু অনিয়ম ধরা পড়লে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অমোচনীয় কালির ব্যবহার এবং 'পূর্ব বাংলা নির্বাচনী অপরাধ অধ্যাদেশ' জারি প্রার্থী ও ভোটারদেরকে নির্বাচনে অবৈধ উপায় ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। মাত্র পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের বৈধ্যতা চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়।

---

১০৯. M. Mahfuzul Huq, Electrical Problems in Pakistan, Dacca, P- 80.

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচটি আবেদনের একটিকে গর্ভনর 'ভারত প্রাদেশিক নির্বাচন, দুর্নীতি ও নির্বাচন আবেদন) আদেশ, ১৯৩৬' এর তৃতীয় খন্ডের চতুর্থ অনুচ্ছেদ বলে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন।

মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে শতকরা ৩৭.৬০ ভাগ ভোটার ভোটদান করেন। সমসাময়িক রেকর্ডের তুলনায় এ হার কম হলেও পুরনো যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মুসলমান মহিলা ভোটারদের রক্ষণশীলতার কথা বিবেচনা করলে এ হার কোন মতেই কম ছিল না।

কৌশলগত কারণে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এভাবে কমিউনিস্টরা ১৫টি আসনে জয়লাভ করেন। কমিউনিস্টদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন হাজি মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ আবদুল মতিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সরদার ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ তোয়াহা।[১১০]

অন্যান্য যেসব কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধারণ আসন (হিন্দু) থেকে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন বিজয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন কান্তি রায়, পূর্ণেন্দু দস্তিদার এবং হিমাংশু বিমল দত্ত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলমান মহিলা আসন থেকে সেলিনা বানু প্রথম একজন মহিলা কমিউনিস্ট প্রার্থী রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনো ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এঁদের অনেকেরই পূর্ব-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের।

---

১১০. A.K. Choudhury, *The Independence of East Bengal,* (Dacca 1984), 14.

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে বিভিন্ন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নির্বাচন কমিশনার এম. আজফার সংবিধান কমিশনের সামনে এর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হারানোর প্রধান কারণ ছিল, এ সরকার পূর্ব বাংলার প্রধান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে নি এবং তারা এক অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ধারণাই ভোটারদের মুসলিম লীগকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল নির্মমভাবে প্রমাণ করে মুসলিম লীগ তখন পূর্ব বাংলার জনগণ থেকে কি পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।[১১১]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে পূর্ববাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এর পরে রাজনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একদিক থেকে বলা যায়, এটি ছিল এক শুভ লগ্ন, কেননা এর ফলে পূর্ববাংলায় গণতন্ত্রের ক্ষেত্র উর্বর হয়ে উঠে। সাধারণ জনগণও আগের চেয়ে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ রাজনৈতিক কর্মসুচিতে রুপান্তরিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হলো, এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের আসন গ্রহণের ফলে মুসলিম লীগের একচেটিয়া প্রভাব ভীষণভাবে হ্রাস পায়।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে কিছু কারণ ছিল যারফলে নির্বাচনের ফলাফল একচেটিয়াভাবে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যায়। পাকিস্তান সৃষ্টিকে ঘিরে বাঙালীদের স্বপ্ন ছিল তাদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এ স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। পূর্ব বাংলার উপর-পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নতুন ধরনের শাসন শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে দ্রুত বাঙালিদের মধ্যে উপলব্দি ঘটে যে, তারা এক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আরেক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। '৫৪ এর নির্বাচন ছিল এই অবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট প্রতিবাদ।

যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন বাঙালির প্রিয় নেতা ও ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সিপাহশালার যুক্তবাংলার শেষ মূখ্যমন্ত্রি ও বিরল সাংগঠনিক প্রতিভা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী।

---

১১১. Kamruddin Ahmed, A Social History of Bengal, (Dacca 1970), 113-114.

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগে ও ন্যাপের কোনো গণভিত্তিক নেতৃত্ব ছিল না। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বাঙালি রাজনৈতিক এলিটদের নানা কৌশল নিয়ে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সেসঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে প্রায় ৩৪টি শুন্য আসনে উপ নির্বাচন না দিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সর্বপ্রকার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে।

যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা সম্বলিত একটি বিস্তৃত নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে বা সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে সরকারী দল মুসলিম লীগের সুনির্দিষ্ট এবং গণমূখী কোন কর্মসূচি ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ দল কিছু সংখ্যক নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়। ফলে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়।

প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীরা মুসলিম লীগের প্রতি বিরুপ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দী দল, যেমনঃ সীমান্ত প্রদেশের কর্মী পীর মানকে শরীফের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পাঞ্জাবে মামদতের নেতৃত্বে জিন্নাহ মুসলিম লীগ ইত্যাদি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম লীগ সংগঠন হিসেবে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং এ দল সম্পর্কে দেশবাসীর মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের নায্য দাবির প্রতি মনযোগ না দিলে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে জনগণ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে।[১১২]

গঠনকাল হতেই মুসলিম লীগ জমিদার, জোতদার, ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত ছিল। পুর্ববাংলার সাধারণ মানুষের রক্ষার ব্যাপারে মুসলিম লীগ এর তৎপরতা ছিলনা বললেই চলে। ফলে মুসলিম লীগ সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরাজয় বরণ করে।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ছিল কায়েমি স্বার্থবাদীদের সবার। এ সরকার প্রথম হতেই দেশের আপামর জনগণের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না। ফলে দলটি কিছু সংখ্যক বিত্তশালী নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়। এ স্বার্থবাদী শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করলে জনগণ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তাই স্বায়ত্বশাসনের দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পতাকার নিচে সমবেত হয়।

---

১১২. G.W. Choudhury, Democracy in Pakistan, P- 58

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ দলীয় সরকার প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মুসলিম লীগ শাসনামলে খাদ্য সংকট, লবন সংকট ও বন্যা সমস্যা ইত্যাদি কারণে বাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাদের ২১ দফা কর্মসূচিতে লবন সংকট, খাদ্য সংকট ও বন্যা সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান ও মুসলিম লীগ শাসনামলের দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পরিচালনার ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকামী ছাত্র-যুব-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 'দেশদ্রোহী', ভারতের অনুচর, কমিউনিস্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এ নির্যাতিত নেতারাই যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তফন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়িক, সরকারী কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীগণ ব্যাপক হারে ভারতে চলে যাওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে শুন্য স্থান পূরণের জন্য উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে অতি শীঘ্রই উর্দুভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বার্থে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দে সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনী লীগের পরিবর্তে যুক্তফন্ট্রের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ বেছে নেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব প্রথম গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নের্তৃবৃন্দ অতি দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে পূর্ব বাংলার জনগণ একত্রিত যুক্তফন্টের প্রতি তাদের সমর্থন জানায়।

১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের কারণে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন স্থগিত রেখে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন পরিষদের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়। এ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে পূর্ব থেকেই সচেতন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্বশাসন প্রদানের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়নের পথ

Dhaka University Institutional Repository

বেছে নেয়। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে বাঙালি জনগণ একত্রিত হয়ে উঠে যা মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ডেকে আনে।

মুসলীম লীগ শাসক গোষ্ঠী ও নেতৃত্বের চারিত্রিক দূর্বলতার সুযোগে দুই একজন ব্যতিক্রম ব্যতীত সরকারী কর্মচারীরা অবাধ লুটপাট আরম্ভ করে। ফলে এ সকল স্বল্প সংখ্যক চরিত্রহীন সুবিধাভোগী শ্রেণী ব্যতিত ভাগ্যহত সাধারণ লোক হতবাক ও বিভ্রান্ত না হয়ে পারে নাই। অবস্থা মোকাবেলার জন্য Public and Representative Office Disqualification Ordinance জারী করা হলেও বাস্তবে তা দূর্নীতি দূর না করে বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয়েছে। একারণেই ক্রমে ক্রমে চাপা অসন্তোষ সর্বত্র পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। এরই বহিঃপ্রকাশ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলীম লীগ শাসক গোষ্ঠীর ভরাডুবি।

পাকিস্তান ও ভারত চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ভারত স্বীয় সংবিধান রচনা করে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এবং সংবিধানিক সরকার আইন সভা প্রতিষ্ঠা করে। অথচ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় গণপরিষদে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার দেশকে সংবিধান দিতে ব্যর্থ হন। তদুপরি গণপরিষদকে ব্যবহার করে সকল প্রকার অপকর্ম অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিধি বিধানকে নির্বাসন দিতে আরম্ভ করেন। যেমন- ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী আইন অনুসারে ছয়মাসের মধ্যে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হলে, ছয় মাসের মেয়াদকে দশ মাসে বৃদ্ধি করা হয়। কেহ কেহ যেমন, গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য আবুল কাশেম ৭ই জুলাই (১৯৫৪) বিশ বৎসরের জন্য মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবী জানান। অন্যদিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করে সম্ভাব্য নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীতার দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তেত্রিশটি উপ নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার মত অগণতান্ত্রিক বিধান ও রীতিনীতিও গণপরিষদ বেমালুম অনুমোদন দেয়। ফলে সমগ্রদেশে ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রবর্তিত না হওয়ার আশঙ্কায় শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্বিয় হয়ে উঠেন। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় বরণ আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

বাঙালী জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরীসিম। নির্বাচনে এটাই প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলার জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। পাকিস্তানী শাসনামলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মত রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের পশ্চাতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যুক্তফ্রন্টের বিজয়। এমনকি তা পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকারের দাবিকে সুসংহত করে পরবর্তীতে মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করে।

৪.৫ ঃ যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক সরকার গঠন ঃ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জনের পর যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২রা এপ্রিল ১৯৫৪ সনে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টারী সভায় শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভায় সভাপতিত্ব করেন। যুক্তফ্রন্টের সিদ্ধান্ত ছিল ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে নের্তৃত্ব দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হকের নের্তৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনে নানা অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে তাকে বিলম্বিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানান। ৩ এপ্রিল ১৯৫৪ সনে শেরে বাংলা মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

মন্ত্রিসভার গঠন ছিল এরূপ- শেরে বাংলা ফজলুল হক (মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব), আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ), এবং সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), (শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প)।

মন্ত্রিসভার গঠন নিয়ে যুক্তফ্রন্টের শরীক বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরীক দল এবং যুক্তফ্রন্টের টিকেটে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও দলের হওয়া সত্ত্বেও এর কাউকে মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (নিজাম-ই-ইসলাম) ব্যতীত মন্ত্রিসভার অন্য সবাই ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টিভূক্ত ছিলেন। অধিকন্তু সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক সাহেবের আপন ভাগ্নে। যাহোক পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মধ্যস্থতায় ১৫ই মে পূর্ণ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। প্রথম দফায় মন্ত্রিসভা গঠনের একমাস বার দিন পর তা সম্প্রসারিত হয়। এবার মন্ত্রিসভায় আরো ১০ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হন। এর ৭জন আওয়ামী লীগ, ৩জন কৃষক শ্রমিক পার্টির। মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ হলেন- এ.কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন, ত্রাণ ও পূর্ববাসন, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি বিষয়; আবু হোসেন সরকার-অর্থ; আতাউর রহমান খান-বেসামরিক সরবরাহ; আবুল মনসুর আহমদ-জনস্বাস্থ্য; কফিলউদ্দিন চৌধুরী- বিচার ও আইন; সৈয়দ আজিজুল হক-শিক্ষা ও

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্ট্রেশন, আব্দুস সালাম খান-শিল্প ও শ্রম; শেখ মুজিবুর রহমান-কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন; আব্দুল লতিফ বিশ্বাস- রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার; মোয়াজ্জেমউদ্দিন হোসেন, স্টেট একুইজেশন; বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন; রেজ্জাকুল/হামিদ উদ্দিন আহমেদ, হায়দার চৌধুরী-স্বাস্থ্য ও জেল; ইউসুফ আলী চৌধুরী-কৃষি, বন ও পাট; আশরাফ আলী চৌধুরী- সড়ক ও গৃহনির্মাণ। সুদীর্ঘ ১১ বছর পর শেরে বাংলা আবার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেই পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে উপবেশন করলেন। সম্প্রসারণের পর মাত্র ৫৬ দিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পায়।[১১৩]

শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ১৯৬৪ সনের ৩রা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের যে জায়গায় নিহত হয়েছিলেন সেখানে শহীদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শহীদ মিনারের নির্মাণের কাজ শুরু করেন। যুক্তফ্রন্টের আমলেই পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশ সাধনের বিরুদ্ধে পরিবেশ দূরীভূত হয়। শেরে বাংলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশের পরিকল্পনাস্বরূপ সর্বপ্রথম পহেলা বৈশাখকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে তিনি অতি চমৎকার একটি বাণী দেন। বাঙালিরা তখন এই সর্বপ্রথম বাঙালি জাতি হিসেবে তারা যে স্বতন্ত্র, তা অনুভব করে।[১১৪]

সুতরাং নতুন ভাবনা চিন্তার অধিকারী, নতুন নেতৃত্ব, যাকে অনেক পর্যালোচনা ভাষাভিত্তিক এলিটরূপে চিহ্নিত করেন সেই শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলে স্বভাবতই জনগনের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু এই সরকারের আয়ু ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শপথ গ্রহণের মাত্র ৫৬ দিন পর ফজলুল হক মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেয় কেন্দ্রিয় সরকার। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন চালু হয় এবং তা ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

---

১১৩. Rounaq Jahan, Pakistan : Failure in National Integration (Dacca 1977, P. 47- 57)

১১৪. Sayed Qamrul Ahsan, Politics and Personalities in Pakistan Dacca- 1967, 94.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৫

যুক্তফ্রন্ট সরকার

জনগণ থেকে সর্বোচ্চ সমর্থন আদায় এবং ঐক্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে যুক্তফ্রন্ট যে চমকপ্রদ বিজয় অর্জন করে, তা ছিল অসাধারণ এবং প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মাত্রার কারণ ও বিজয় এক টি গণ সমর্থন সুষ্ঠ সরকার গঠনের ভিত্তি গড়ে তোলে। বিশেষত ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণার পক্ষে জনগণকে সমবেত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শেরে বাংলার ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চয়ের ক্ষমতা বিপুল ভোটে ফ্রন্টের জয় লাভের একটি প্রধান কারণ ছিল।

যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় ছিল জনতার বিজয়, নিষ্পেষিত বাঙালি জাতির বিজয়, মুসলিম লীগের সাত বছরের কুশাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিজয়। এই বিজয় পূর্ব বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত বেদনা ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ছিল। যুক্তফ্রন্ট ও এ.কে ফজলুল হকের এ গৌরবজ্জল বিজয় উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেকে এই বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন।

৫.১ যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রম

১৯৫৪ সনের ২ এপ্রিল পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হক। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হক মন্ত্রীসভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন এবং ২১শে ফেব্রয়ারীকে শহীদ দিবস হিসেবে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। শেরে বাংলা মূখ্যমন্ত্রী হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশের পরিকল্পনা স্বরূপ সর্ব প্রথম পহেলা বৈশাখকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। সাবেক মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের বর্ধমান হাউজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আবাসিক হোস্টেল করার প্রস্তাব দিলে ফজলুল হক তা গ্রহণ না করে বর্ধমান হাউজকে বাংলা ভাষার গবেষণা কেন্দ্র বা বাংলা একাডেমী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও আইনসভায় কয়েকটি আইন পাশ করা ছিল উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.১ ১৯৫৪ সনে পাশকৃত আইনসমূহ ঃ

স্বল্প সময়ের জন্য যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকবার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন পাশ করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ১৯৫৪ সনে এই ১ বছরে আইনসভা উল্লেখ করার মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে নাই। তথাপি ১৯৫৪ সনে যে সকল এ্যাট পাস হয়েছে তার কিছু সেকশন তুলে ধরা হলো যার প্রভাব পরবর্তী রাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছে।

East Bengal Act IV of 1954.

THE EAST BENGAL CONTROL OF DISORDERLY AND DANGEROUS PERSONS (GOONDAS) ACT, 1954.[1]

[30th July, 1954.]

An Act to provide for the better control of riotous and disorderly persons commonly known as goondas residing in or frequenting certain cities and towns in [2][*East Pakistan.*]

WHEREAS it is expedient to provide for special measures for better control of disorderly persons commonly known as goondas in certain cities and towns in [2][East Pakistan] and the neighbourhood of those towns and cities and for ancillary matters ;

AND WHEREAS the Governor of East Bengal has, in pursuance of a proclamation, dated the 29th May, 1954, issued by the Governor-General of Pakistan under section 92A of the Government of India Act, 1935, assumed, on behalf of the Governor-General, all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature under the said Act ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers so assumed, the Governor is pleased hereby to enact as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the East Bengal control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act, 1954.

(*2*) It extends to the whole of [2][East Pakistan.]

[3](*3*) It shall come into force in such city or town and neighbouring areas thereof, and on such dates, as the Provincial Government may, by notification in the *Official Gazette*, direct.

Definitions.

2. Unless the context otherwise requires, all expressions used in this Act shall have the meanings assigned to them in the Pakistan Penal Code, 1860, or in the Code of Criminal Procedure, 1898.

XLV of 1860.
V of 1898.

[1] For Statement of Objects and Reasons, *see Dacca Gazette, Extraordinary*, dated the 30th July, 1954, Part III, p. 263

[2] The words within square brackets were substituted for the words "East Bengal" by E. P. Ord. XXVIII of 1960. First Schedule.

[3] The Act came into force in the areas within the jurisdiction of Kotwali, Sutrapur, Lalbagh, Tejgaon, Keraniganj, Joydebpur, Kaliganj, Rupganj, Narayanganj and Fatullah Police-stations in the district of Dacca and in areas within the jurisdiction of Kotwali, Double Moorings, Panchlaish, Sitakunda and Patiya police-stations in the district of Chittagong with effect from the 13th August, 1954, *vide* Notifications No. 2612-Pl. and No. 2613-Pl. dated the 13th August, 1953, published in the *Dacca Gazette, Extraordinary*, dated the 13th August, 1954, Part I, pages 2683 and 2684.

Dhaka University Institutional Repository

(*Sections 3—6.*)

Constitution of Tribunal.

3. The Provincial Govenment may, for the purposes of this Act, by notification in the *Official Gazette*, constitute for any city or town and neighbouring areas thereof to which this Act may be applied, a Tribunal (hereinafter called the Tribunal) consisting of the official for the time being holding the office of District Magistrate.

Powers of Tribunal.

4. (*1*) For the purpose of conducting enquiries under this Act, the Tribunal shall have all the powers of a District Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 1898, for issuing summonses and warrants for the production of witnesses and documents, for the examination of persons complained of and witnesses, and for issuing commissions for the examination of witnesses. V of 1898.

(*2*) Proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1898. V of 1898.

(*3*) The Tribunal shall keep its records in English.

Contempt Proceedings.

5. The Tribunal shall have the powers of a Court of Record for punishing contempts of its authority provided that the maximum period for which any person may be committed to prison under this provision, shall be three months.

Orders by Tribunal.

6. The Tribunal shall not be bound to follow the rules of evidence prescribed under the Evidence Act, 1872, and may *inter alia* by written order— I of 1872.

(*a*) direct that the whole or any part of the enquiry against any person complained of shall be held in *camera* ;

(*b*) for reasons to be stated in the order, accept evidence on affidavit of witnesses whose presence cannot be secured without such amount of delay or expense as would in the opinion of the Tribunal be unreasonable in the circumstances of the case, or any other ground sufficient in its opinion and connected with any matter arising in the case ;

(*c*) for reasons to be stated in the order, record the statement of any witness in *camera* in the absence of the person complained against and his counsel, if the Tribunal is satisfied that the person complained against is deliberately evading appearance ;

(*d*) receive in relation to the person complained of evidence of previous conviction or previous occasions of having been bound over to keep the peace or be of good behaviour ;

Dhaka University Institutional Repository

(*Section* 7.)

(*e*) receive evidence of general repute in relation to the person complained of ;

(*f*) direct any Magistrate having jurisdiction in the area to take such steps as may be necessary to protect the life and property of any person who has given or is required to give evidence in an enquiry under this Act ;

(*g*) grant immunity from prosecution to any witness appearing in any enquiry under this Act, in respect of any matter relevant to the enquiry contained in his evidence; and

(*h*) direct, with reference to specified portions of the record of the enquiry, that no copies or abstracts shall be made by or furnished to any person including the persons complained of.

Cognizance of cases by Tribunal.

7. (*1*) The Tribunal shall take cognizance of a case only when an information in respect of a specified person is laid before it by a police officer of the area concerned, not below the rank of an Inspector of Police who has taken part in the investigation of the case. The information shall be signed by the officer concerned and shall briefly set out—

(*a*) the practices with which the person complained of is charged ;

(*b*) instances, with details of time and place, of such practices ;

(*c*) a statement of any relevant general reputation in which the said person is held and any other ground on which the information is based ;

(*d*) names and other particulars of witnesses who will be produced to support the allegations contained in the information ; and

(*e*) whether the said person is sought to be declared a goonda or a dangerous goonda.

(*2*) The officer laying the information may, if he thinks fit, enclose any of the above particulars in a sealed cover and request that the same be kept secret and the Tribunal shall order that such particulars shall not be disclosed at any stage of the enquiry, and that when the said particulars fall under clause (*d*) of sub-section (*1*) the name of the witness shall not be disclosed until such time as such witness is produced in evidence :

Provided that if the said officer or the person conducting the prosecution before the Tribunal desires that the name of any witness may not be disclosed at all, the Tribunal shall order accordingly.

Dhaka University Institutional Repository

THE POLICE (EAST BENGAL AMENDMENT) ACT, 1954.[1]

[17th August, 1954.]

An Act to amend the Police Act, 1861.

V of 1861.

WHEREAS it is expedient to amend the Police Act, 1861 for the purpose hereafter appearing;

26 Geo. V, Ch. 2.

AND WHEREAS the Governor of East Bengal has, in pursuance of a Proclamation, dated the 29th May, 1954 issued by the Governor-General of Pakistan under section 92-A of the Government of India Act, 1935, assumed, on behalf of the Governor-General, all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature under the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers so assumed, the Governor is pleased hereby to enact as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Police (East Bengal Amendment) Act, 1954.

(2) It shall come into force at once.

Substitution of section 17 of Act V of 1861.

2. For section 17 of the Police Act, 1861, the following shall be substituted, namely:—

"17 (*1*) When it shall appear that any unlawful assembly, or riot or disturbance of the peace has taken place or may be reasonably apprehended, or that an offence under the Prevention of Sumggling Act, 1952, has been committed or may be reasonably apprehended, and that the police force ordinarily employed for preserving the peace or for prevention of an offence under the Prevention of Smuggling Act, 1952, is not sufficient, for preservation of peace and for protection of the inhabitants and security of the property in the place where such unlawful assembly or riot or disturbance of the peace has occurred or is apprehended, or for prevention of such offence, it shall be lawful, for any police officer not below the rank of an Inspector to apply to the nearest Magistrate, and for the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate on his own motion, to appoint so many of the residents of the neighbourhood, as such police officer may require or the District Magistrate or the Subdivisional Magistrate may deem proper, to act as special police officers for such time and within such limits as the Magistrate

LVIII of 1952.

[1]For Statement of Objects and Reasons, *see Dacca Gazette, Extraordinary*, dated the 17th August, 1954, Part III, p. 2794-95.

Dhaka University Institutional Repository

(Section 2.)

or the District Magistrate or the Subdivisional Magistarte shall deem necessary; and the Magistrate to whom such application is made by the police officer shall, unless he see *cause to the contrary, comply with the application.

(*2*) The names of the special police officers appointed under sub-section (*1*) shall forthwith be forwarded to the District Superintendent."

---

*Sic.

Dhaka University Institutional Repository

East Bengal Act XII of 1954.

THE EAST BENGAL STATE ACQUISITION AND TENANCY (AMENDMENT) ACT, 1954[1].

[30th August, 1954.]

An Act further to amend the East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950.

E. B. Act XXVIII of 1951.

WHEREAS it is expedient further to amend the East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950, for the purposes and in the manner hereinafter appearing;

26 Geo. V, Ch. 2.

AND WHEREAS the Governor of East Bengal has, in pursuance of a proclamation, dated the 29th May, 1954, issued by the Governor-General of Pakistan under section 92-A of the Government of India Act, 1935, assumed, on behalf of the Governor-General, all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature under the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers so assumed, the Governor is pleased hereby to enact as follows:—

Short title.

1. (*1*) This Act may be called the East Bengal State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 1954.

(*2*) Sections 6, 7, 9 and 10 shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1952 and the remaining sections shall come into force on the date of publication of this Act in the *Official Gazette*.

2 to **15.** [Repealed by the East Pakistan Repealing and Amending Ordinance, 1960 (E. P. Ord. XXVIII of 1960)].

---

[1]For Statement of Objects and Reasons, see *Dacca Gazette, Extraordinary*, dated the 30th August, 1954, p. 2918.

Dhaka University Institutional Repository

East Bengal Act XIV of 1954.

THE EAST BENGAL SCHOOL TEXT-BOOK ACT, 1954.[1]

[23rd September, 1954.]

An Act to make provision for establishment of a School Text-Book Board in [2][*East Pakistan.*]

WHEREAS it is necessary to achieve improvement in the quality of the text-books of the primary and secondary stages and for that purpose to establish a Board;

AND WHEREAS the Governor of East Bengal has, in pursuance of a Proclamation, dated the 29th May, 1954, issued by the Governor-General of Pakistan under section 92-A of the Government of India Act, 1935, assumed on behalf of the Governor-General, all powers vested in or exercisable by the Provincial Legislature under the said Act;

26 Geo. V, Ch. 2.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers so assumed, the Governor is pleased hereby to enact as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the East Bengal School Text-Book Act, 1954.

(*2*) It extends to the whole of [2][East Pakistan.]

(*3*) It shall come into force on such date[3] as the Provincial Government may, by notification in the *Official Gazette*, direct.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(*a*) "Board" means the East Pakistan School Text-Book Board established under section 3;

(*b*) "prescribed" means prescribed by the Regulations made under this Act; and

(*c*) "school" means any educational institution up to and including the secondary stage whether established, recognised or approved by any law or not.

---

[1]For Statement of Objects and Reasons, *see* the *Dacca Gazette, Extraordinary*, dated the 23rd September, 1954, Pt. III, p. 2963. The Act was extended to those areas of the Mymensingh district which were known as "Partially Excluded Areas" immediately before the coming into force of the constitution which was abrogated by the Presidential Proclamation of the 7th October, 1958, *vide* Notification No. 5377, dated 30th November 1954, published in the *Dacca Gazette, Extraordinary*, dated 16th December, 1954, Pt. I, p. 1292.

[2]The words within square brackets were substituted for the words "East Bengal" by E. P. Ord. XXVIII of 1960, First Schedule.

[3]The Act came into force with effect from 22nd October, 1954, *vide* Notification No. 3030 Edn., dated 18th October, 1954, published in the *Dacca Gazette, Extraordinary*, dated 18th October, 1954, Pt. I, p. 3055.

Dhaka University Institutional Repository

(*Sections 3, 4.*)

Establishment of the Board.

3. The Provincial Government may, by notification in the *Official Gazette*, establish a Board to be called "the East Pakistan School Text-Book Board" for the purpose of carrying out the provisions of this Act and such Board shall be a body corporate and have perpetual succession and a common seal and shall, by the said name, sue and be sued.

Constitution of the Board.

4. [1][(*1*) The Board shall consist of the following members, namely:—

(*a*) The President to be appointed by the Provincial Government;

(*b*) The Director of Public Instruction, [2][East Pakistan,] *ex-officio;*

(*c*) The President, East Pakistan Secondary Education Board, *ex-officio;*

(*d*) Four members to be appointed by the Provincial Government to represent persons interested in education;

(*e*) Two members to be appointed by the Provincial Government from amongst the members of the East Bengal Legislative Assembly;

(*f*) One member to be appointed by the Provincial Government to represent the minority communities in [2][East Pakistan];

(*g*) One member to be appointed by the Provincial Government to represent Madrasah Education in [2][East Pakistan];

(*h*) One member to be appointed by the Provincial Government to represent Primary Education;

(*i*) One member, being an officer of the Provincial Government, to be appointed by the Provincial Government as Member-Secretary.]

(*2*) The President and members, other than *ex-officio* members, of the Board shall be appointed upon such conditions and for such period as the Provincial Government may think fit.

---

[1]This sub-section was substituted for the original sub-section (*1*) by the E.B. School Text-Book (Amendment) Ordinance, 1956 (E.B. Ord. No. II of 1956), section 3, which shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1955.

[2]The words within square brackets were substituted for the words "East Bengal" by E.P. Ord. XXVIII of 1960, First Schedule.

Dhaka University Institutional Repository

Functions of the Board.

5. Subject to the provisions of this Act and the Regulations made thereunder, the functions of the Board shall include—

(*a*) approval of text-books for schools;

(*b*) preparation, publication and sale of text-books for schools;

(*c*) approval of prize books for schools;

(*d*) approval of library and reference books for schools;

(*e*) encouragement of useful literature and preparation, publication and sale of such literature; and

(*f*) distribution of text-books [1][and other books] free of cost to poor and deserving students.

Text-Book for Schools.

6. No book which has not been approved as a Text-Book by the Board or which has not been prepared and published by it shall be prescribed as a Text-Book in any school:

Provided that the Provincial Government may, by notification in the *Official Gazette*, exempt any school, or category of schools from the operation of this section.

Information, report, etc. from the publishers.

7. The Board may call for any information, return or report in respect of a book from the publisher applying for its approval as a text-book or from the publisher of a book approved as a text-book and such publisher shall furnish correct and true information, return or report as the case may be.

Royalty

8. The Board may demand such royalty, for approval of a book as a text-book, from its publisher, as may be determined by the Board.

Determination of number, designation, etc., of officers and servants of the Board.

9. The Board may, subject to such conditions as may be prescribed, determine the number, designation and grades of officers and servants whom the Board considers it necessary to employ for the purposes of this Act and the amount and nature of the salary, fees and allowances to be paid to each such officer and servant.

Power of appointment, suspension, etc., of officers and servants of the Board.

10. The power of appointing, promoting and granting leave to officers and servants of the Board and reducing in rank, suspending or dismissing them for misconduct shall, subject to such conditions as may be prescribed, be vested in the Board.

[1]These words were inserted by section 4 of E. B. Ord. II of 1956, which shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 1955.

Dhaka University Institutional Repository

Delegation of power to the President.

11. The Board may, from time to time, authorise its President to exercise and perform, subject to the control of the Board, any of the powers and duties conferred or imposed on the Board by or under this Act.

Text-Book Fund.

12. (*1*) There shall be constituted a fund called the Text-Book Fund to which shall be credited all sums received by or on behalf of the Board.

(*2*) All moneys payable to the credit of the Text-Book Fund shall forthwith be paid into a Government Treasury.

(*3*) The Text-Book Fund shall be vested in the Board and shall be administered by the Board and applied for the purpose of this Act in such manner as may be prescribed.

Power to call for information and report.

[1][**12A**. The Provincial Government may call for any information or report from the Board on any matter and it shall be the duty of the Board to furnish such information or report to the Provincial Government within a reasonable time or within the time specified by the Provincial Government.

Enquiry into the affairs of the Board.

12B. The Provincial Government may cause an enquiry to be made into the affairs of the Board by such person or persons as the Provincial Government may deem fit and such person or persons after making the necessary enquiry shall submit the report to the Provincial Government which may direct the Board to take necessary action on such report as the Provincial Government may deem proper.

Provincial Government's power to pass orders.

12C. Notwtihstanding anything contained in this Act, if, in the opinion of the Provincial Government, the Board has shown its incompetency to perform, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, the Provincial Government may pass such order as it may deem fit and the Board shall be bound to carry out such order.]

Regulations.

13. (*1*) Subject to the previous approval of the Provincial Government, the Board may make Regulations for carrying out the purposes of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the procedure to be observed at a meeting of the Board and the number of members required to form a quorum;

---

[1] These sections were inserted by the East Bengal School Text-Book (Amendment) Ordinance, 1956 (E.B. Ord. No. II of 1956), section 5, which shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 1955.

Dhaka University Institutional Repository

(*b*) the manner of submission of books for the approval of the Board as text-books and for payment of fees therefor;

(*c*) the manner of imposition and realisation of royalty;

(*d*) the conditions subject to which the number, designation and grades of the officers and servants of the Board and the amount and nature of their salaries, fees and allowances shall be determined;

(*e*) the conditions of appointment, promotion, leave, reduction in rank, suspension and dismissal of officers and servants of the Board;

(*f*) the head of account to which the money payable to the credit of the Text-Book Fund shall be paid and the manner of receipt to and expenditure from that Fund and administration and audit thereof;

(*g*) preparation of panel of expert reviewers on each subject and for fixation of their honoraria;

(*h*) the manner in which text-books are to be prepared, published and sold and for fixation and payment of honoraria for preparation of such books; and

(*i*) the type of paper, illustration, printing and format of a text-book.

বিভিন্ন অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার পর পূর্ব বাংলার রাজনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে পরিবর্তন ঘটতে থাকে সরকারের। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের হস্তক্ষেপের কারণ কেমন ছিল তা আলোচনা করা। একই সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান বিশেষত কৃষক শ্রমিক পার্টির।

৫.২ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

জন্মক্ষণে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে যে কাঠামোগত ব্যবধান বিদ্যমান ছিল, প্রথম থেকে সরকার কর্তৃক অনুসৃত কিছু নীতি অনুসরণের ফলে সেই ব্যবধান আরো বিস্তৃত হয়ে উঠতে থাকে। কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল পাকিস্তানে শাসনব্যবস্থার মৌলিক দলিল। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই আইনের ভিত্তিতে পাকিস্তানে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই আইনে প্রাদেশিক সরকার ছিল কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হয় নি। প্রাদেশিক গভর্ণরকে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে প্রদেশে কেন্দ্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়েছে। কার্যত তিনি হয়ে উঠেছিলেন কেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক গভর্ণরকে নির্দেশ দিতে পারতেন। প্রয়োজনবোধে প্রাদেশিক সরকারের সকল দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করতে পারতেন। এভাবে প্রদেশে তিনি কেন্দ্রের শাসন প্রবর্তন করতে পারতেন। এর অশুভ নগ্ন প্রকাশ ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে, ১৯৫৪ সালে। জনগণের বিপুল ভোটে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নির্বাচনের মাত্র ৫৬ দিন পরে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রদেশের রাজনীতিকদেরও নিয়ন্ত্রণ করতেন The Public and Representative Offices (Disqualification) Act (PRODA) এর মাধ্যমে। এর প্রয়োগও ছিল ব্যাপক। ১৯৫৬ সালের সংবিধানেও কেন্দ্রের শক্তিশালী অবস্থান সংরক্ষিত থাকে। হক মন্ত্রিসভার কাঠামো যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ শরিক দলের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি এবং এর পরিণতি হয় অশুভ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং শরিক দলগুলি মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচীগত মতভিন্নতার কারণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রসভা অচিরেই সংবিধান এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে করাচীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ফলে ক্ষমতায় আরোহণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে দেশদ্রোহিতা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফজলুল হককে সরিয়ে দেয়া হয়। তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগও আনা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের প্রতি বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

প্রশাসনিক ক্ষেত্র ঃ

কেন্দ্রিকরণের সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম অবশ্য হয়ে পড়ে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিস, অডিট এবং একাউন্টস সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিসের মত প্রশাসনের এলিট ক্যাডারসমূহ। এসব সার্ভিসের কর্মকর্তারাই কেন্দ্র ও প্রদেশে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এসব কর্মকর্তার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের উপর, যদিও অনেকেই প্রদেশে কর্মরত থাকতেন। এই পর্যায়ে যে অবস্থা বিরাজ করতো তা ছিল অনেকটা স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে বিদ্যমান

Dhaka University Institutional Repository

"গভর্ণর জেনারেলের শাসন ব্যবস্থার" (Vice-Regal System) মত। ঐ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ছিলেন কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে একক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনস্বরূপ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের প্রধান দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত হয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করতেন সামরিক বিভাগের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যানুপাতে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে "বাঙলা ভাষাভাষী এলিটবৃন্দ (Vernacular Elite) প্রশাসনিক-রাজনৈতিক কেন্দ্রিকরণের এই প্রক্রিয়ায় ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হন। কেননা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া শক্তিশালী কেন্দ্রে শুধু যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল অপ্রতুল তাই নয়, নিজেদের ঘরে পূর্ব পাকিস্তানেও তাদের অংশগ্রহণ হয়ে পড়ে অত্যন্ত সীমিত। কেন্দ্রিকরণের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিও তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্বায়ত্তশাসনের দাবি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাসীন করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপসারণ তথা পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি অগ্রাহ্য করে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রে অব্যাহত শাসন এই দাবিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। হামজা আলাভি ও এঙ্গাস ম্যাডিসন (Hamza Alavi & Angus Maddison) মত প্রকাশ করেন যে, প্রথম থেকেই পাকিস্তানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছিল "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক"। বিশ শতকের পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তারা "সংসদীয় বাতাবরণে" কাজ করেছেন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তারা প্রকাশ্যেই তা প্রয়োগ করতে থাকেন।

পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের মূলে রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক কারণ আর রয়েছে সামাজিক অবস্থার গতিসূত্র (Social dynamics)। একটি উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্র (As a post-colonial state) হিসেবে পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে "অধিকতর প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা" এবং তার "পদ্ধতি-প্রক্রিয়াসমূহ"। পাকিস্তানের উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (ICS) প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। তারা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ধ্যান-ধারণা প্রবণতা লাভ করেন পূর্বসূরীদের নিকট থেকে। তাদের পূর্বসূরীরা ব্রিটিশ ভারতে যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের প্রধান মাধ্যম ছিলেন, কার্যত ভারত সাম্রাজ্যের ইস্পাত কাঠামোরূপে (Steel Frame) শাসনব্যবস্থায় ভূমিকা পালন করেন, পাকিস্তানের কর্মকর্তাবৃন্দ সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইন্ডিয়ান সার্ভিসের সদস্যদের মত অল্প বয়সে তারা নিয়োগ লাভ করতেন। সাধারণ শিক্ষা-

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণ-ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেন। পাকিস্তানে তারা পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধ কর্মকর্তারূপে বিকশিত হতেন। পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের চরিত্রও ছিল ভারতে ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তাদের মতই প্রায় অভিন্ন। বৃটিশ ভারতের সামরিক কর্মকর্তাদের মত পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের মন-মানসিকতার প্রকৃতি নির্ধারিত হতো Sandhurst, Cranwell ও Woolwich প্রমুখ শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা। ব্রিটিশ ভারতের সামরিক বাহিনীর মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য তারা সারা জীবন সযত্নে সংরক্ষণ করতেন। এভাবে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ ব্রিটিশ ভারতের কর্মকর্তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার লাভ করে, ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কাঠামো অনুসরণ করে, শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানের প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ সবচেয়ে প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হন।

এর ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও প্রশাসনিক কাঠামোয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রভাবশালী অবস্থান সৃষ্টিতে সামাজিক পরিবেশ (Social dynamics) গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা ছিল প্রধান।

উপমহাদেশের এই অঞ্চলেই আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য হয়ে উঠেছিল শীর্ষস্থানীয়। এর মূলে ছিল দুটি কারণ। প্রথম, ভারতের এই অংশ ছিল ব্রিটিশ রাজের নন-রেগুলেশন বা অনিয়ন্ত্রিত এলাকা। ফলে এসব এলাকায় আমাদের শাসন ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত এবং অভিভাবকসুলভ। তারা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েই শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।

দ্বিতীয়, এই এলাকায় ছিলেন পর্যাপ্ত সংখ্যক সামন্তপ্রভু এবং তারাই ছিরেন রাজনীতির দন্ডমুন্ডের কর্তা। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রধানত নির্ধারিত হত আলোচনা-পর্যালোচনার পরিবর্তে উপদলীয় কোন্দল অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে।

এসব কোন্দল বা ষড়যন্ত্রের ছিদ্রপথে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাত শক্তিশালী হত। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হয়ে ওঠেন প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ। পূর্ব পাকিস্তানে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট জেলা কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করে। তাছাড়া, পূর্ব পাকিস্তান ছিল নিয়ন্ত্রিত বা রেগুলেটেড অঞ্চল। পূর্ব পাকিস্তানে সামন্ত প্রভুদের প্রভাবও তেমন ছিল না। সামন্ত প্রভুদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু। ভারত বিভাগের সময় তারা ভারতে চলে যান। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্মকর্তার কোন সময় তেমন প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অতি অল্পসংখ্যক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং শীর্ষ পর্যায়ে কার্যত কেউ ছিলেন না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে। কিন্তু যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বায়ত্বশাসন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে ছিল প্রতিবাদমুখর ও আন্দোলনমুখী, তাই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সন্দেহের চোখে দেখত এবং নীতি নির্ধারণী কাঠামো থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ক'বছরে তা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আইন পরিষদ ও স্থানীয় সরকারের মত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ, যাদের সৃষ্টি হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলের শেষলগ্নে, অনেকটা দেরিতে এবং দ্বিধান্বিত প্রক্রিয়ায়, তাদের শিকড়ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাও ছিল অনেকটা ঔপনিবেশিক ভারতের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত, অত্যন্ত কেন্দ্রিভূত ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আমলা ব্যবস্থায় এক বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্য শুধু যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও ছিল তা অত্যন্ত প্রকট। সিন্ধু থেকে এলিট কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কর্মকর্তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল সবচেয়ে কম। ভারত বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন মাত্র দু'জন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (Indian Civil Service-ICS) কর্মকর্তা। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ১৭৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১৭জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (Civil Service of Pakistan-CSP) নিয়োগ লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-৬৮ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন ভাবে নিয়োগ প্রাপ্তদের সংখ্যা হয় শতকরা ৪২ ভাগ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে এই প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৩০ ভাগের ওপরে ওঠেনি।

ছক ঃ ৭

East- West Representation in Civil Service of Pakistan, 1950-58.

Year	Total No. of CSP	East Pakistan		West Pakistan	
	Officers	No	%	No	%
1950	11	4	36.4	7	63.6
1951	17	5	29.4	12	70.6
1952	13	3	23.0	10	77.0
1953	25	7	28.0	18	72.6
1954	17	5	28.4	12	70.6
1955	21	11	52.4	10	47.6
1956	20	7	35.0	13	65.0
1957	24	10	41.7	14	58.3
1958	25	12	48.0	13	52.0

Source : Ahamed, Emajuddin, Bureaucratic Elites In Segmentd Economic. Growth : Pakistan and Bangladesh, (Dhaka-1980, 65-66.)

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়কালে ফরেন সার্ভিস, অডিট ও এ্যাকাউন্ট সার্ভিস ও ট্যাক্সেসন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে শতকরা ৩৭.৫, ২৫.৩ এবং ৩৮ ভাগ। অবশ্য এই প্রতিনিধিত্ব ছিল আমলাব্যবস্থার নিম্ন পর্যায়ে এবং গুরুত্বহীন বিভাগসমূহে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এর প্রভাব তেমন ছিল না। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন সচিব ছিলেন না। তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন মাত্র ৩ জন যুগ্মসচিব এবং ৮ জন উপ-সচিব। কিন্তু কেবিনেট ডিভিশন, এস্টাব্লিশমেন্ট ডিভিশন, অর্থনৈতিক বিষয় অথবা অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানের কোন কর্মকর্তা সাচিবিক দায়িত্ব লাভ করেননি। এমন কি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র। কোন কোন বিভাগে তা ছিল শতকরা ১০ থেকে ১৩।

ছক- ৮

Secretaries in the Central Secretariat, 1956

	Number	East	West
Secretry	19	-	19
Joint Secretry	41	3	38
Deputy Secretry	133	10	123
Under Secretry	548	38	510
Total	741	51	690

Source : Ahamed, Emajuddin, op. cit. 66

বেসামরিক কর্মকর্তাদের মত শীর্ষ পর্যায়ে সামরিক কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। এর মূলেও রয়েছে ঐতিহাসিক কারণ।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিত ভাবে উত্তর ও পূর্ব-ভারতের কোন কোন গ্রুপ ও জাতিকে ব্রিটিশ ভারতের সামরিক বাহিনীতে ভর্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ব্রিটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তথাকথিত সামরিক জাতিগুলির (Martial Race) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইমন কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে কোন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনে যারা সক্ষম নয় এসব জনগোষ্ঠী বা জাতি থেকেই ব্রিটিশ ভারতের সামরিক বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি সিপাহী নিয়োগ করা হয়েছে"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব জাতিগোষ্ঠীকে "অসামরিক" বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক সৈনিক নিয়োগ করা হয়। তারা যে ভাবে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তার ফলে "অসামরিক জাতি" সম্পর্কিত কিংবদন্তী (Myth) মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের পরে তাই ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক বাহিনীতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে। পাকিস্তানে কিন্তু তা বিদ্যমান থাকে এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে প্রায় সকল সৈনিক পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই নিয়োগ লাভ করেন, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চারটি জেলা থেকে। মোটকথা, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব কর্মকর্তা ও সৈনিক পর্যায়ে শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগের অধিক হয়নি। এভাবে প্রথম থেকে পাকিস্তানে অনুসৃত প্রশাসনিক কেন্দ্রিকরণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ঃ

পাকিস্তানের শাসনকারী এলিটদের প্রশাসনিক-রাজনৈতিক কেন্দ্রিকরণের নীতি বাঙালিদের আত্মশাসনের আকাঙ্খা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনে উদ্দীপ্ত করে। সরকারের সাংস্কৃতিক অঙ্গীভূতকরণের নীতি সেই দাবিকে আবেগময় করে আরো গতিশীল করে তোলে এবং কালক্রমে তা পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ উন্মেষে সহায়তা দেয়। পাকিস্তানের শাসনকারী এলিটরা বিশ্বাস করতেন যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হবে যদি উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে একই ভাষা ও একই সংস্কৃতি। এই ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন পাকিস্তানের স্থপতি ও প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেই। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আপনাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে উর্দু এবং অন্য কোন ভাষা নয়"। সাথে সাথে সাবধান বাণী রূপে তিনি এও উচ্চারণ করেন যে, "এ ব্যাপারে যিনি আপনাদের বিভ্রান্ত করতে চাইবেন তিনি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত কোন জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে টিকে থাকতে পারে না"।[১১৫]

পাকিস্তানের মত অসমসত্ত (Heterogenous) সমাজে ভাষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গীভূতকরণ নীতি নির্ধারিত হয়েছিল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণের লক্ষে। সামাজিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানকে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমজাতীয় এক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক এলিটরা ভেবেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অংশ সম্মিলিত থাকতে পারে যদি দেশে বিদ্যমান থাকে এক ভাষা এবং একই সংস্কৃতি। বাঙালিরা এই নীতির তীব্র বিরোধীতা করেন।

---

১১৫. M. Ispahni, 'Quaid-i-Azam Jinnah as I knew him'- Karachi- Elite publishers, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

তারা যে শুধু তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভীষণভাবে দুর্বল তাই নয়, পাকিস্তানের এই নীতির মধ্যে তারা ভাষার উর্ধ্বে দেখেছিলেন শাসনকারী এলিটদের এক কুমতলব।

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত বাঙালিদের পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনকে স্থায়ী করার ষড়যন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছিল। স্ট্যানলী ম্যারন লিখেছেন, (বাঙালিদের প্রতিবাদে) "সাংস্কৃতিক গর্ববোধ ছাড়াও ছিল কিছু ব্যবহারিক সমস্যা। পাকিস্তানে যদি উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হত তাহলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালিরা প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যেত। অন্যদিক থেকেও বাঙালিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এই ভাবে যে, এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর।

বাঙালিরা ১৯৪৮ সাল থেকে এই পদক্ষেপের বিরোধীতা করে এসেছেন এবং সেই বিরোধীতার প্রকাশ ঘটেছে হাজারো প্রকরণে, বিভিন্ন মঞ্চে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার জনগণ, এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকরাও। এই তিক্ততা অব্যাহত থাকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত মারী চুক্তির ফলে এ বিষয়ে দেশের দুই অংশের রাজনীতিকদের মধ্যে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই দাবী আদায়ের সংগ্রামে যে সরকারী অসহযোগীতা এবং ভাষা সৈনিকদের যে ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তা কোন দিন ভোলেননি পূর্ব বাংলার জনগণ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ঃ

পাকিস্তান সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্রিকরণ এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গীভূতকরণ নীতি স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে সংযুক্ত করে আবেগজড়িত এক আবেদন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সংগঠনে সহায়তা করে। কিন্তু সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সমাজের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে জনগণকে গভীরভাবে বৈরী করে তোলে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ছিল অনেক পার্থক্য, কিন্তু দুই এর মধ্যে একটা বড় মিল ছিল। দুই অংশই ছিল শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত এবং কৃষিজ কাঁচা পণ্যের উৎপাদক। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত হত শতকরা ৮৫ ভাগ বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট পাট এবং পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত হত প্রচুর পরিমাণে উন্নত জাতের তুলা। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের দুই অংশে শিল্পের মান ও ভিত্তি ছিল একটু এগিয়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কিছুটা বেশি সুবিধা ছিল চিনি ও ধাতব পণ্য উৎপাদনে।

Dhaka University Institutional Repository

পানি সেচের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা ছিল একটু সুবিধাজনক, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংকিং কার্যক্রম ছিল কিছুটা এগিয়ে। মোটকথা, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না।

দুই অঞ্চলের মধ্যে যে ছোট্ট ব্যবধান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৬০ সালের দিকে তা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানে মোট আঞ্চলিক উৎপাদন (Gross Regional Products-GRP) ১৯৪৯/৫০ সালে ১২,৩৬০ মিলিয়ন রুপি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৯/৬০ সালে হয় ১৪,৯৪৫ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে হয় ২৩,১১৯ মিলিয়ন রুপি। প্রথম দশকে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ০.২ ভাগ এবং দ্বিতীয় দশকে তা হয় শতকরা ৫.৪ ভাগ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে মোট আঞ্চলিক উৎপাদন (GRP) ১৯৪৯/৫০ সালে ছিল ১২,১০৬ মিলিয়ন রুপি। ১৯৫৯/৬০ সালে তা হয়, ১৬,৪৯৪ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে হয় ৩১,১৫৭ মিলিয়ন রুপি। প্রথম দশকে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩.৬ এবং দ্বিতীয় দশকে তা বেড়ে হয় শতকরা ৭.২ ভাগ।

মাথাপিছু আয়ের নিরিখে দেখলেও বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছিল অনেক বেশি। ১৯৪৯/৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৮ রুপি। ১৯৫৯/৬০ সালে তা হয় ৩৬৭ রুপি এবং ১৯৬৯/৭০ সালে হয় ৫৩৩ রুপি। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯/৫০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭ রুপি এবং ১৯৫৯/৬০ সালে তা নেমে আসে ২৭৭ রুপিতে, যদিও ১৯৬৯/৭০ সালে তা হয় ৩৩১ রুপি। স্বাধীনতার পর থেকেই আন্তঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯/৫০ সালে বৈষম্যের হার ছিল শতকরা ১৯। ১৯৫৯/৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ এবং ১৯৬৯/৭০ সালে শতকরা ৬১।

ছক- ৯

Per Capita Income in East and West Pakistan, 1959/60 Prices (Rupees)

	1949/50	1959/60	1969/70
East Pakistan	287	277	331
West Pakistan	338	367	533

Source: Ahmed, Emajuddin, OP.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক বলেন, "অনগ্রসর দেশসমূহকে সঙ্গতভাবেই অর্থনীতি বৃদ্ধির দর্শনকে গ্রহণ করতে হবে। এবং দূর ভবিষ্যতের জন্যে সুষম বণ্টন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাকে তুলে রাখতে হবে। এটি স্বীকার করা উচিত যে সুষম বণ্টন ও কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার বিলাসীতা শুধুমাত্র উন্নত দেশসমূহের সাজে।"

হারভার্ড উন্নয়ন সার্ভিস মিশনের উপদেষ্টা গুষ্টাভ পাপানেক আরো জোরেসোরে বলেন- "অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যাটাকে যথার্থ প্রেক্ষাপটে বিচার করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক এবং তাই কালক্রমে নিম্ন আয়ের লোকজনদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে পারে।"

যে সকল ব্যবসায়ী-শিল্পপতি এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে সম্পদশালী হয়ে ওঠেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা হয়ে পড়েন দারিদ্যপীড়িত। শাসকদের অনুসৃত কৃষিনীতির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী ও ধনাঢ্য কৃষকগণ প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক, শিল্প-শ্রমিক এবং অন্য নিম্ন আয়ের ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত আয় অনেক নিচে নেমে আসে। উন্নয়নমূলক কাজের অধিকাংশ সম্পন্ন হয় শহর ও নগরাঞ্চলে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নগরাঞ্চলের পেশাজীবীরা সর্বাধিক সুযোগ লাভ করেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল পরিণত হয় গ্রাম্যবস্তিতে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ

প্রথম দশকে (১৯৪৭-৫৬) পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাংঘর্ষিক সম্পর্কের পরিবর্তে বিদ্যমান ছিল সমঝোতা, প্রতিযোগীতা ও সমন্বয়মূলক সম্পর্ক। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অভিযোজনের পরে ১৯৪৭ *সালের ভারত স্বাধীনতা আইনকে* গ্রহণ করা হয় পাকিস্তানের আইনগত ও সাংবিধানিক কাঠামো রূপে। ১৯৫৬ সালে নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়া পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ পরিচালিত হয়। পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা যেহেতু ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাই কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন সম্পন্ন হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশে যেহেতু শাসন ব্যবস্থা ছিল সংসদীয় প্রকৃতির, তাই উভয় ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ ছিল আইন পরিষদের নিকট দায়ী। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ছিল দ্বিবিধ ভূমিকা (ক) সংবিধান প্রণয়নের জন্যে তা পাকিস্তানের গণপরিষদ রূপে কার্যকর ছিল। (খ) কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইন পরিষদ রূপে কার্যকর ছিল। ১৯৪৭ সালের ৩ জুনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হোয়াইট পেপারে পাকিস্তানের গণপরিষদের গঠনের বিবরণ দেয়া হয়। গণপরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদ কতৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক আইন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, যদিও নির্বাচকমন্ডলীর আকার ছিল খুব ছোট। মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ ব্যক্তি ছিলেন ভোটার। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছিল এক কক্ষ বিশিষ্ট। প্রথমে এই আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৯ পরে এই সংখ্যা ৭৯তে উন্নীত হয়।

ছক ঃ ১০

গণপরিষদে পাকিস্তানের বিভিন্ন বিভাগের সদস্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব বাংলা	৪৪*
পশ্চিম পাঞ্জাব	২২
সিন্ধু	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩
বেলুচিস্তান	১
বেলুচিস্তান (রাষ্ট্রসমূহ)	১
বাহাওলপুর	১
খয়েরপুর	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত (রাষ্ট্রসমূহ)	১

Source : The Constituent Assembly Pakistan (Increase and Rehabilitation of Seats) Act, 1949 মন্ত্রিপরিষদ এবং গণপরিষদ ছিল পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যদিও ১৯৪৭ *সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের* ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণপরিষদের সম্মতি সাপেক্ষে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার কথা। ১৯৪৭ সালের ১১ আগষ্ট জিন্নাহ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৪ আগষ্টে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নবম তফসিল অনুযায়ী পাকিস্তানের নতুন গর্ভনর জেনারেলের ক্ষমতার বিবরণ সম্পর্কে ক্যাম্পেবেল জনসন (ঈধসঢ়নবষষ-ঔড়যহংড়হ) লিখেছেন ঃ "দেখুন পাকিস্তানের রাজকীয় সম্রাট, ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ, স্পীকার এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্মিলিত অবয়বে প্রবল পরাক্রমশালী কায়েদে আজম"। লিয়াকত আলী খানকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

তখন পাকিস্তানের যে অরাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল সেজন্যে তখন দরকার ছিল শাসন-প্রশাসনের কাঠামো রচনার। দরকার ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সচল করার। নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পাকিস্তানে ভীড় জমায়। সরকারকে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বহু সংখ্যক অ-মুসলিম দেশ ত্যাগ করে। সব মিলিয়ে মুহূর্তটি ছিল এমন, যখন প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপের। ফলে জিন্নাহর যোগ্যতার নেতৃত্ব ছিল অপরিহার্য। এই অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

আলঙ্কারিক রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালনে জিন্নাহ এর ভূমিকা সীমিত থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদও তার কর্তৃত্বকে সীমিত রাখতে চায়নি। তিনি অবশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে কিন্তু পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা তিনি নিজে সৃষ্টি করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি ছিলেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক, কিন্তু ঐ সময় ও অবস্থায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে যে গতিশীলতা, সাহস এবং উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা তাঁর ছিল না।

এটি সবার জানা যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অখন্ড ভারতে একটি মুসলিম জাতির যে চিন্তা-ভাবনা করতেন তার তিনটি উপাদান ছিল ঃ (ক) উত্তর-পূর্ব (বঙ্গদেশ ও আসাম), (খ) উত্তর-পশ্চিম (পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং (গ) ভারতের উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণাঞ্চল।[১১৬] উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিমরা ছিলেন সমগ্র মুসলমান জনসমষ্টির প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিলেন অনগ্রসর। প্রশাসনিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল সর্বনিম্ন পর্যায়ের। হিন্দু জমিদারের ভূমির উপর নির্ভরশীল থেকেই তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে এই অঞ্চলের মুসলমানদের সর্বাধিক ভোটের ফলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি বেগবান। নির্বাচনের পর অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট এবং মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তান আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং এর ঢেউ সাধারণ মানুষকেও সংশ্লিষ্ট করে ফেলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব বাংলার জনগণের আকাঙ্খা তাই হয়ে ওঠে আকাশ ছোঁয়া। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্খা ধারণ করতে ব্যর্থ হয় তার অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী ভূমিকার জন্যে। এর অবশ্য কারণও ছিল। মুসলিম লীগে বিভক্তি তার একটি কারণ। এই বিভক্তির ফলে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার সমর্থনের প্রত্যাশায় কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফজলুল হকের নেতৃত্ব গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের এক অংশ প্রধানত ছিল আধুনিক এবং শহরাঞ্চলভিত্তিক। এই অংশের প্রতি উঠতি মধবিত্ত শ্রেণীর আবেদনও ছিল প্রচুর। সাংগঠনিক দিক থেকেও এই অংশের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল প্রমাণিত। খাজা নাজিমুদ্দিন এসব কারণে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে। আবার এসব কারণে পূর্ব বাংলায় নাজিমুদ্দিন সরকার মুসলিম লীগের অন্য দুটি উপদলের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্খা ধারণে ব্যর্থ হয়।

---

১১৬. M.A.Jinnah to M.A.H Ispahani, ibid.P- 77

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের তিনটি উপদল ছিল ঃ নাজিমুদ্দিন উপদল, ফজলুল হক উপদল ও সোহরাওয়ার্দী উপদল। নাজিমুদ্দিন উপদলের অন্তর্গত ছিল ভূমি মালিক ও জমিদার শ্রেণীর মত সমাজের সনাতন ও রক্ষণশীল উপাদানসমূহ। গ্রামাঞ্চলে তাদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বের এই অংশ পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়। ফজলুল হক ইম্পেরিয়াল প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বহুবার প্রতিবাদ করেছেন, কোন কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত হন।[১১৭]

অতএব, বলা যায় ১৯৪৭ সালে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠে তখন পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ নতুন পথের দিগন্ত খুঁজে পায়। তাই তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মোহ ভেঙ্গে যায়। কেননা তারা তাদের কল্পিত পাকিস্তানে যে স্বপ্নের স্বাদ পেতে চেয়েছিল সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ। কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালীদের অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উদাসীনতা, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাঙালীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণে বাঙালী জনগণ ও নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। প্রথম থেকেই অবাঙালী শাসকবর্গ বাংলাকে একটি কলোনী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কখনও পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী দওয়ার প্রতি সমর্থন দেয়নি। সুতরাং বলা যায় পূর্ব বাংলার ইতিহাস ছিল মূলতঃ শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের ঐ অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের রোষানলে পড়ে যার ব্যাপক নগ্ন প্রকাশ ঘটে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী পরিষদের ওপর হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে।

৫ ঃ ৩ ঃ কেন্দ্র ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্বন্দ্ব ঃ

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই পূর্ব বাংলার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি খারাপ ছিল। যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতাকালীন সময়ে এ অবস্থার আরও আবনতি ঘটে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের ২৩ মে আদমজী জুট মিলে দাঙ্গার সংবাদ আসে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং মন্ত্রী পরিষদের চেষ্টায় দাঙ্গা বন্ধ হয়। কিন্তু আদমজীর পরেই ২৫ মে চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে দাঙ্গা বাঁধে। এ সময়ে পূর্ব বঙ্গের সশস্ত্র বাহিনীকে সামরিক বাহিনীর প্রধান জিওসির আইনে নেয়া হয়।

---

১১৭. 'Huq-Jinnah Correspondence' in S.S Pirzada ed. *Quaid-Azam Jinnah's Correspondence*. Karachi 1996, 55-84. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মতামতের জন্য মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন-Abul Monsur Ahmed *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা-১৯৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আইন শৃংখলার অবনতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের ভিতরে সক্রিয় কম্যুনিষ্টদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে এবং কলকাতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও উপমহাদেশ বিভক্তি সম্বন্ধে ফজলুল হকের বিবৃতি যুক্তফ্রন্টের বিশ্বস্থতার প্রতি কেন্দ্রের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়।

তাছাড়া সংবিধান প্রণয়ন বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্কের ব্যাপারে ফজলুল হকের সাথে প্রধান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের আলোচনা অসফল প্রতিয়মান হয়। প্রধান মন্ত্রীর মতে ফজলুল হক কৌশলে ঘোষণা করেছিলেন যে, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা। আর তিনি (ফজলুল হক) শুধুমাত্র অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বৈদেশিক বিষয়, মুদ্রা এবং প্রতিরক্ষা বিষয়াদি দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অসহযোগীতায় Undeterred থেকে এবং সেখানে জনগণের রায়কে অবহেলা করে মোহাম্মদ আলী সংবিধান প্রনয়নের কাজ হাতে নেন। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরের নভেম্বর মাসে সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা পরিত্যাক্ত হয়েছিল। কন্সটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির ১৬তম অধিবেশন ১৪ মার্চ আহবান করা হয়েছিল, আর এটি ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এসময় Basic Principles Committee Report চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।[১১৮] এই রিপোর্টের সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা প্রভৃতির মধে সীমিত রাখার কথা বলা হয়। বিরোধী দলের একজন হিন্দু ধর্মাবলী সদস্য এসময় স্মরণ করিয়ে দেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণ ঘোষণা করেছেন যে সদস্যরা এখানে বসে আছেন তারা পূর্ব বাংলার জনগণের মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং তাদের পক্ষে কথা বলার অধিকার এই সদস্যদের নেই।[১১৯] কিন্তু বিরোধী সদস্যদের Taunting পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই মুসলিম লীগের সদস্যগণ গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি পুরোপুরি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন।

তবে পাঞ্জাবী নেতৃত্ব, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে রাজনৈতিক আঙ্গিনায় যে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যে নিরংকুশ ভোট পড়েছিল তার প্রভাব অতি দ্রুত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পার্লামেন্টে বাঙ্গালীদের ঝড়ষরফ Block খুব সহজেই ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোকে প্রণোদিত করতে সক্ষম ছিলেন আর এ প্রভাবে পাঞ্জাবী প্রভাব ক্ষুন্ন করার প্রয়াস নিতে পেতেন।

---

১১৮. Index to the Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol.xvi, 1954 (14 March 1954 to 21 September 1954).

১১৯. Constituent Assembly Debates, Vol.xvi, No.27 (15 September 1954) 375
রির্পোটের শিডিউল ১ এর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনকালে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বক্তৃতা।

Dhaka University Institutional Repository

লীগ ও দলীয় নেতাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের যে ফর্মূলা মোহাম্মদ আলী গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি পাঞ্জাবী নেতৃত্ব সহমত পোষণ করেছিলেন। তবে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সামঞ্জস্য বিধানে যত দ্রুত রাজী হয়েছিলেন, বাঙ্গালী রাজনীতিকগণ অত সহজেই তাতে রাজী হতে পারেন নাই। ১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হক কলকাতা সফর করেন।

কলকাতায় একটি 'হক সংবর্ধনা সমিতি' গঠিত হয়েছিল। বিমান বন্দরে এক বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানান। কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার নসরুল্লাহ ও কলকাতায় তাঁর পুরানো বন্ধুরা তাঁকে স্বাগত জানান। সাংবাদিকরা তাঁর কলকাতা আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "পায়ের চিকিৎসা করানো একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি। এই কলকাতা শহরে ৬০ বছরেরও বেশি আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলি কাটিয়েছি। সে দিনগুলির কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। সেসব প্রাচীন স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হ'লে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি, ভবিষ্যতেও আবার আসব, ইনশাল্লাহ।" [১২০]

তিনি সমবেত সাংবাদিকদের বলেন, "আমি আমার বন্ধু ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গেও উভয় বঙ্গের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।" ১লা মে, শনিবার পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলা সরকারের সদর দপ্তর কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডা. বিধান চন্দ্র রায় ও ফজলুল হকের অনেক কর্মচারী তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। উভয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দুই বাংলায় যাতায়াতের ভিসা প্রথা বিলোপ, স্বাভাবিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভ্রমণ সহজতর করা, সীমান্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি শিথিল করা, পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ফজলুল হক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য উভয় বঙ্গের মধ্যে বাঙালি মনীষী বিনিময়ে ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

১৯৫৪ সনের ২রা মে রোববার কলকাতায় শেরে বাংলাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন যে, জীবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে তাঁর আর কোনো আশা বা আকাঙ্কা নেই- দুই বাংলার মধ্যে যে প্রাচীর রচিত হয়েছে, তা অপসারিত করার কাজ যদি তিনি আরম্ভ করে যেতে পারেন, তাহলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। কিন্তু পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, কলকাতা সফরকালে ফজলুল হক রাষ্ট্র বিরোধী বক্তব্য রাখেন। এ প্রসঙ্গে আয়ান স্টিফেন্স বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কলকাতা সফরে গিয়ে অসতর্কভাবে এমন সব বক্তব্য রাখেন, যা পাকিস্তানের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়।"

---

১২০. জননায়ক ফজলুল হক- সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা- ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি দেশে ফিরে "কেন্দ্রের সাথে পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দেবেন"- এই মর্মে তিনি কলকাতায় বক্তব্য রেখেছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের মালিকানাধীন পত্রিকাগুলি তাঁর এ বক্তব্য 'সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত' বলে গণ্য করে। *পাকিস্তান রিভিউ*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "বিদেশী সরকারের সাথে উচ্চ পর্যায়ের নীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর কাজ নয়, ঢাকায় তাঁর আসন যতো সুদৃঢ় হোক না কেন কিংবা তিনি যতো জনপ্রিয় নেতা হোন না কেন।"[১২১]

একই বছর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফজলুল হক আওয়ামী লীগ সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর মন্ত্রিসভাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন এবং যুক্তফ্রন্ট, সরকার গণপরিষদ বিলোপ এবং অচিরেই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী গণপরিষদে বলেন ঃ

> গণপরিষদ বিলুপ্ত করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কেননা এর সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের জন্যই ম্যানডেট দেয়া হয়েছে ..... তাছাড়া এমন কোন সাংবিধানিক বিধানও নেই যার অধীনে গণপরিষদ বিলুপ্ত করা যেতে পারে। .... প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাদেশিক সরকার কি ধরনের হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের রূপ কি হবে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনভাবেই মতামত দেয়ার জন্য ভোটদাতাদের আহবান করা হয় নি।[১২২]

ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি ও বিহারীদের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ফলে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ এবং চট্টগ্রামে চন্দ্রঘানা পেপার মিলের বাঙালি শ্রমিক ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় এবং এতে ২ শ্রমিক নিহত হয়।

গর্ভণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী, মোহাম্মদ আলী মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনের নামে ফজলুল হককে করাচিতে ডেকে পাঠান। মুখ্য মন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্য আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হক ২৯শে মে করাচি পৌঁছান এবং এক সপ্তাহ ব্যাপী তাদের আলাপ আলোচনা চলে। এককালের আমলা গোলাম মুহম্মদ ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। সেখানে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরোধীতা ও পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়। হক ও তার মন্ত্রীরা অনুগত পাকিস্তানি, কেবল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন চান, স্বাধীনতা চান না এই মর্মে ২৯শে মে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। ৩০শে মে শাসকচক্র ফজলুল হককে দিয়ে এক বিবৃতি দিতে বাধ্য করেন।

---

১২১. Shamsuehuda Harun, Parliamentary Bhehaviour in A Multi National State 1947-58; Bangladesh Experience, Dhaka- 1984. P. 209-32

১২২. Muzaffer Ahmed Choudhuri, Government and Politics in Pakistan, P.P- 237-240.

Dhaka University Institutional Repository

ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের প্রতি আমার কোন অসদিচ্ছা নেই। পাকিস্তানের কোন ক্ষতি আমি চাই না। পাকিস্তানের প্রতি আমার আনুগত্যে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এমন সব উক্তি করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বার্ধক্য হেতু আমি রাজনৈতিক- জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করছি।" কিন্তু এতেও কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। ৩০শে মে সকাল সোয়া নয়টায় মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক, মন্ত্রী আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জেল হোসেন মানিকা মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচি ত্যাগ করেন। কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রা বিরতির পথে সাংবাদিকরা ফজলুল হককে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, "আমার কাছে এসে আর কোন লাভ নেই। আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমার মুখ বন্ধ।" করাচির সংবাদ ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে- বাংলার রাজনীতিতে কিছু একটা হ'তে যাচ্ছে। ১৯৫৪ সনের ৩১শে মে রোববার পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মুহম্মদ ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করে এবং ৯২ (ক) ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। ৩১শে মে প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ আলী জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ফজলুল হককে পাকিস্তানের শত্রু ও পূর্ববঙ্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন। প্রচার করা হলো যুক্তফ্রন্ট পূর্ববঙ্গকে ভারতের সাথে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই পূর্ববঙ্গকে রক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়েছে।[১২৩]

পূর্ববঙ্গের গর্ভনর চৌধুরী খালেকুজ্জামানকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং তাঁর স্থলে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং চিপ সেক্রেটারি হাফিজ ইসহাকের পরিবর্তে এন,এম খানকে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার সংবাদ পত্রের উপর সেন্সার আদেশ জারি এবং যুক্তফ্রন্ট কর্মীদের গ্রেপ্তারের হুকুম জারি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫জন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যসহ প্রায় ১০০০ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন।

৫ ঃ ৪ ঃ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঃ

নের্তৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং শরিক দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিগত মতভিন্নতার কারণে যুক্তফ্রন্টে খুব শীঘ্রই বিভক্তি দেখা দেয়। বলা যায় যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচন মোর্চা। যা কিনা নির্বাচন ও মুসলিম লীগ বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতাদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং অতি দ্রুত যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১২৪]

---

১২৩. Lan Stephens, *Pakistan: Old Coutry New Nation,* (London 1963), 293.

১২৪. Najma Choudhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the Bengal Legislature, 1947-58,* (Dacca 1980), 22.

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি ও বিহারীদের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ফলে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ এবং চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা পোর মিলস্ (চট্টগ্রাম)-এর অবাঙালি শ্রমিক ও বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এতে বহু শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কেন্দ্রের শাসন জারি করে। হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে একজন 'স্বঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেন্দ্রের শাসন জারি করার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে.বি. সাঈদ-এর মতে "পূর্ব বাংলায় পাঞ্জাবের মতোই কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ নেতারা ধর্মীয় বিভেদ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, আর পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট নেতারা, যাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে, যদিও শুধু পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং পূর্ব বাংলায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার উপর বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[১২৫]

বস্তুত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা অংশত কেন্দ্রের হস্তক্ষেপজনিত কারণে এবং আংশিকভাবে তাঁদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে পূর্ব বাংলায় একটি গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার সুযোগ হাতছাড়া করেন। কেন্দ্রের শাসন জারির পর সশস্ত্র পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় এ.কে. ফজলুল হক নিজ বাড়িতে অন্তরীণ হন। হক মন্ত্রিসভা বাতিলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থান থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রায় ১৬শ' নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রাদেশিক পরিষদের আরো ৩০ জন সদস্য। আওয়ামী লীগের মুখপত্র *দৈনিক ইত্তেফাকের* উপর কড়া বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়।

---

১২৫. Khalid B. Sayed, Politics in Palistan. P- 41

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে বেশ ঘন ঘন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে। দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় নি। পূর্ব বাংলায় এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫৪-৫৮ কালপর্বে পূর্ব বাংলায় তিনটি এবং কেন্দ্রে পাঁচটি সরকার গঠিত হয়। অধিকন্তু ঐ সময়ে দুই বছরের জন্য পূর্ব বাংলায় সরাসরি গভর্নরের শাসন জারি হয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তৎকালীন পাকিস্তানে রাজনৈতিক ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, এই নির্বাচন ছিল পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন।

দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনের মাধমে পূর্ব বাংলার জনগণের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। তৃতীয়ত, এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চতুর্থত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এটি প্রথমে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের বহুলাংশে মোহমুক্তি ঘটায়। শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, এই নির্বাচন পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটায়।

বস্তুত এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ এমনভাবে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় যে পুনরায় জনসমর্থন লাভ করা মুসলিম লীগের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হয় নি।

অসাংবিধানিকভাবে হক মন্ত্রিসভা বাতিল এবং পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আঞ্চলিক অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং উপদলীয় কোন্দলের কারণে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। তবুও '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

৫ ঃ ৫ কৃষক শ্রমিক পার্টির ভূমিকা ও রাজনীতিতে কৌশলগত অবস্থান ১৯৫৮ পর্যন্ত ঃ

গোলাম মুহম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৫৪ সনের ২৩শে অক্টোবর মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে গণ-পরিষদ গঠন করেন। সেনাপতি লে. জেনারেল আইয়ুব খান প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হলেন। শাসনতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন সংক্রান্ত সঙ্কট উত্তরণের জন্য গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণাপন্ন হন। ১৯৫৪ সনের ১১ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচি ফিরে আসেন। ২০ শে ডিসেম্বর তিনি আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিদেশ থেকে মাওলানা ভাসানী দেশে ফিরলেন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করে তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে পূর্ববাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেলেন। ১৯৫৫ সনের ৪ঠা জানুয়ারি আবু হোসেন সরকার কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেন। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধ বৃদ্ধি পেল। আওয়ামী লীগের একাংশ ফজলুল হকের প্রতি অনাস্থা আনার চেষ্টা করে। আপসের চেষ্টা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় এ.কে.ফজলুল হক প্রদেশের নেতা এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রের নেতা হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐক্য হলো না। আওয়ামী লীগ ও কে.এস.পি উভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করে। ১৯৫৫ সনের ২৫শে এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে ঢাকায় আসেন। গোলাম মুহম্মদ গণ-পরিষদের পরিবর্তে একটি শাসনতন্ত্র কনভেনশন গঠনের আর্ডিন্যান্স জারি করেন। এটা ছিল অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কনভেনশন ও প্যারিটি মেনে নিলেন। ফজলুল হক তাঁর দল নিয়ে কনভেনশন ও প্যারিটির বিরোধিতা করেন।

তিনি দলীয় নেতাদের নিয়ে ১৯৫৫ সনের ২৬ শে মে থেকে ২৯ মে তারিখে পাবনা, রাজশাহী, রংপুর এবং বগুড়ায় জনসভায় বক্তৃতা দেন। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট কনভেনশনকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ২৮শে মে গর্ভনর জেনারেল ফেডারেল কোর্টের রায় মোতাবেক নতুন গণ-পরিষদ গঠনের অর্ডিন্যান্স জারি করেন। পূর্ববাংলা থেকে ৩রা জুন ৯২ (ক) ধারা উঠে যায়। ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বের হয়ে যায়। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হলেন না। তাঁর প্রতিনিধি আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ সনের ৬ই জুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নেজামে ইসলাম, কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য যুক্তফ্রন্ট থেকে যায়। আওয়ামী লীগ ১০৪ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দল গঠন করে এবং বিরোধীদলের নেতা হলেন আতাউর রহমান খান।

ফজলুল হক ও তাঁর দল সংখ্যাসাম্য নীতি কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ঘোর বিরোধীতা করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নিলে তাদের দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৫৫ সনের ৫ই জুন সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল। কিন্তু দলের ১৯ জন কে.এস.পি দলে এবং ২০ জন আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪ জন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে গণ-পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ৩১ জন মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হন। কে.এস.পি ও নেজামে ইসলাম দল থেকে ১৬ জন, আওয়ামী লীগ থেকে ১২, মুসলীম লীগ থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র থেকে ২ জন নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ আলী ছিলেন একমাত্র লীগ সদস্য। বাকি ৯ জন ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মোট ৮০ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে ৪০ জন সদস্য ছিল। ১৯৫৫ সনের ৭ই জুন মারিতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৪ই জুলাই পর্যন্ত তা চলে।

মারি চুক্তি, ১৯৫৫

পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ছিল বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানি, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে বাঙালি-পাঞ্জাবি দ্বন্দ্ব। বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (শতকরা ৫৬ ভাগ)। অপরদিকে, পাঞ্জাবিরা ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মালিক। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুক এটি কিছুতেই পাঞ্জাবিদের কাছে কাম্য ছিল না। তাদের আরো আশঙ্কা ছিল যে, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য যে কোনো প্রদেশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে একটি ইউনিটে অন্তর্ভূক্ত করা এবং কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে 'সংখ্যাসাম্য নীতি' প্রবর্তন করা। সংখ্যা সাম্যনীতির পক্ষে পাঞ্জাবিরা অবস্থান নেয়। সরকার, প্রশাসন, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে 'প্যারিটি' বা সংখ্যাসাম্য নীতি অনুসরণ সাপেক্ষে বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অবশেষে এ অবস্থা মেনে নিতে সম্মত হন। 'মারি চুক্তি' হলো এরই পরিণাম। ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মারিতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটিই 'মারি চুক্তি' নামে পরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল-

⇒ পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে নিয়ে এক ইউনিট গঠন।

⇒ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রদেশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

⇒ পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সকল বিষয়ে 'সংখ্যাসাম্য নীতি' অনুসরণ ও তা কার্যকর করা।

⇒ 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তন।

⇒ বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

মারি চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে এক ইউনিটে পরিণত করে দ্বিতীয় গণপরিষদে একটি বিল পাশ হয়। মারি চুক্তির সময় উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ মর্মে সমঝোতা হয় যে, এরপর থেকে 'পূর্ব বাংলার' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' হবে। মারি চুক্তিতে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক প্রমুখের স্বাক্ষর দান করা সত্ত্বেও, এর (চুক্তির) বিশেষ করে সংখ্যাসাম্য নীতির বিরুদ্ধে বাঙালিদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ চুক্তির ফলে পাকিস্তানে একটি সংবিধান রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই চুক্তির ভিত্তিতে গণ-পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনায় অগ্রসর হয়। ১৯৫৪ সনের মার্চ মাসে পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের জন্য যথাসময়ে স্পিকার নির্বাচিত হতে পারে নি। স্পিকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য ফজলুল হককে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান পদ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি ২৫শে জুলাই জানান যে, আইনসভার সদস্য হিসেবে তিনি সরকারের কাছ থেকে বেতন ভাতা গ্রহণ করেন না। এই প্রসঙ্গে সরকারের প্রকাশিত রিপোর্ট।

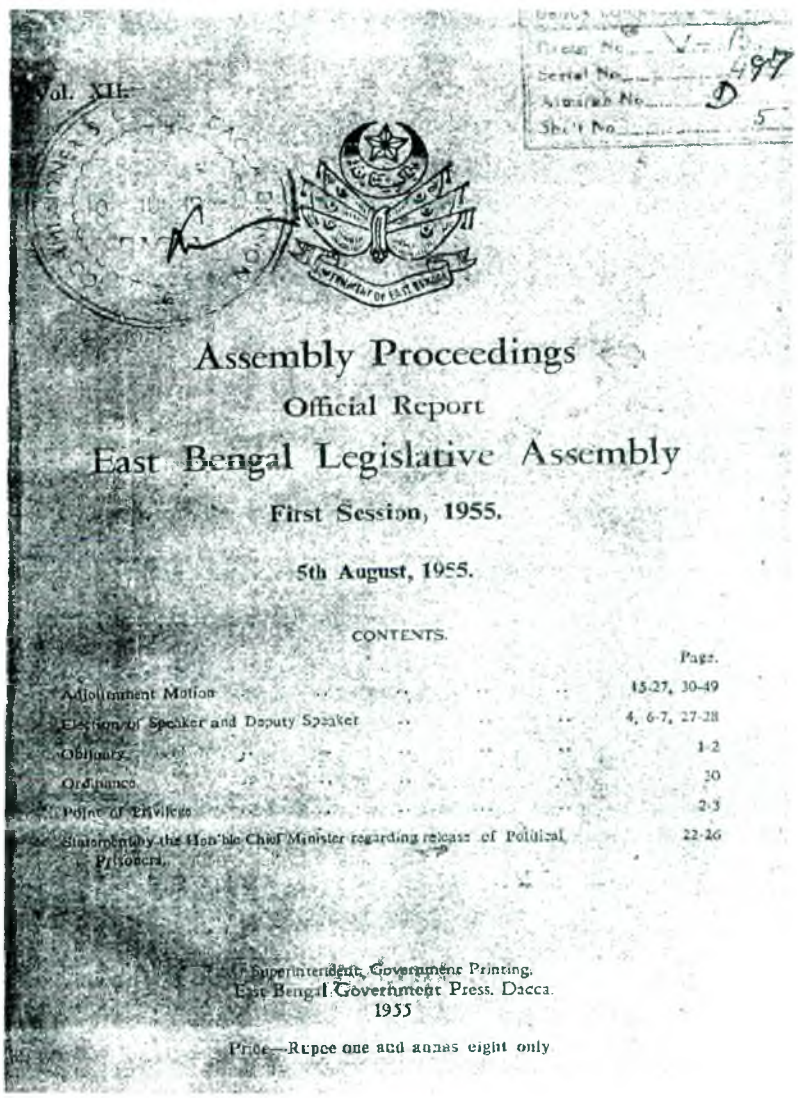

Vol. XII

Assembly Proceedings

Official Report

East Bengal Legislative Assembly

First Session, 1955.

5th August, 1955.

CONTENTS.

	Page.
Adjournment Motion	15-27, 30-49
Election of Speaker and Deputy Speaker	4, 6-7, 27-28
Obituary	1-2
Ordinance	30
Point of Privilege	2-3
Statement by the Hon'ble Chief Minister regarding release of Political Prisoners.	22-26

Superintendent, Government Printing,
East Bengal Government Press, Dacca.
1955

Price—Rupee one and annas eight only

Dhaka University Institutional Repository

GOVERNMENT OF EAST BENGAL

GOVERNOR OF EAST BENGAL

His Excellency Mr. AMIR-UD-DIN AHMAD

COUNCIL OF MINISTERS.

The Hon'ble Mr. ABU HOSSAIN SARKAR	..	(*a*) Chief Minister's Department (*b*) Home Department. (*c*) Judicial and Legislative Department. (*d*) Public Relations Department.
The Hon'ble Mr. ABDUS SALAM KHAN	..	(*a*) Communication, Buildings and Irrigation Department. (*b*) Medical, Health and Local Self-Government Department.
The Hon'ble Mr. ASHRAFUDDIN AHMED CHOUDHURY	..	(*a*) Education and Registration Department. (*b*) Finance Department.
The Hon'ble Mr. SYED AZIZUL HUQ	..	(*a*) Commerce, Labour and Industries Department. (*b*) Revenue Department.
The Hon'ble Mr. HASHIMUDDIN AHMED	..	Agriculture, Co-operation and Relief Department.

Dhaka University Institutional Repository

Mr. CHAIRMAN (Mr. A. K. Fazlul Huq): I do not know what is the contention of my honourable friend. So far as I am concerned, I have only one duty to perform here today with regard to the conduct of the business of the House, namely, the election of the Speaker. As soon as the Speaker is elected, he will come over here and take the chair.

Mr. KHAIRAT HUSSAIN: Mr. Chairman, Sir, I want to know whether you will abide by the provisions of the Government of India Act. You have been appointed Chairman with effect from the 26th of July, 1955, and you are acting as Speaker of the House from that date. You are, therefore, entitled to draw salary of your office as Speaker from the 26th till this day, while Mr. Abdul Karim is also entitled to draw salary up to this day, because he still exists as Speaker until a new Speaker is elected.

The Assembly Procedure Rules and the Government of India Act do not give any power to the Governor to appoint anybody, whoever he may be, earlier to the election of the Speaker. Mr. Karim is continuing as the Speaker of this Assembly and as such he will be drawing his salary till to-day, and as the Governor has appointed you as Chairman with effect from 26th July, you will also be drawing your salary till to-day.

Mr. CHAIRMAN (Mr. A. K. Fazlul Huq): Ladies and gentlemen, as regards salary, I am not drawing any salary. So far as salary is concerned, you may give it to anybody you like. (*Laughter.*)

As regards the powers of the Governor, I do not know what powers the Governor has or has not. So far as I am concerned, my duty as Chairman to-day is to conduct the election of the Speaker of the House, and as soon as that is over I shall vacate my chair.

Now, let me announce the names of the gentlemen who are candidates for Speakership.

Mr. KHAIRAT HUSSAIN: I rise on a Point of Privilege, Sir.....
(*Great uproar in the House.*)

Mr. MUJIBAR RAHMAN SHEIK: On a Point of Privilege, Sir. When a member rises on a Point of Privilege, he is always allowed by the Chairman to have his say, Sir. (VOICES: Yes, yes.)

Mr. KHAIRAT HUSSAIN: Sir, Mr. Nurul Amin was the Speaker of the undivided Bengal Assembly and in 1948 he became the Minister in charge of Civil Supplies Department. The Governor did not appoint anybody as Speaker of the House till the first sitting of the Assembly on the 17th March, 1948, when Mr. Munawwar Ali was appointed Chairman to preside over the first meeting of the Assembly. That order of appointment of the Chairman was legal, but this particular order, Sir, is illegal and *ultra vires*. So, Sir, I want your ruling whether that order of the Governor appointing you as Chairman is legal or not.

Dhaka University Institutional Repository

ELECTION OF SPEAKER.

Mr. CHAIRMAN (Mr. A.K. Fazlul Huq): I have no comment to make whether it is legal or illegal. Ladies and gentlemen, we will now proceed to elect the Speaker of East Bengal Legislative Assembly. The following candidates have been duly nominated for the post of Speaker:—

	Proposed by.	Seconded by.
Mr. Abdul Ghani Khan	Mr. Moslem Ali Mollah	Mr. Abdul Rashid Tarkabagish.
Mr. Abdul Hakim	Mr. Rezzaqul Haider Chowdhury.	Mr. Tayebur Rahman.
	Mr. Md. Abdus Sobhan	Mr. Anwaruddin Shikdar.
	Mr. Mufizuddin Ahmed	Mr. Jasiruddin Ahmed.
	Mr. Md. Rahatullah Mia.	Mr. Mirza Gholam Hafiz.
	Mr. Abdul Hafiz	Mr. Jasimuddin Ahmed.
Mr. Abul Mansur Ahmed	Mr. Shamsul Hoq	Mr. Tajuddin Ahmad.
Mr. Iqbal Anwarul Islam	Mr. Abul Khair Rafiqul Hussain.	Mr. Abdus Samad.
Mr. Khurshiduddin Ahmed	Mr. Abu Ahmed	Mr. Abdul Wahed Bokainagari.
Mr. Masihur Rahman	Mr. Habibur Rahman Chowdhury.	Mr. A.F.M. Abdul Jalil.
Mr. Syed Akbor Ali	Mr. Khairat Hossain	Mr. Yar Mohammad Khan.

Since then Messrs. Abdul Ghani Khan, Abul Mansur Ahmad, Iqbal Anwarul Islam, Khurshiduddin Ahmad and Syed Akbor Ali have withdrawn their candidature, leaving Messrs. Abdul Hakim, and Masihur Rahman to contest for the Speakership.

Mr. MUJIBAR RAHMAN SHEIK: Mr. Chairman, Sir, kindly allow me to speak.....(*Shouts from the Government Benches*).....Sir, allow me to speak something about the release of political prisoners. (*Interruptions*).

Mr. CHAIRMAN Sir, আপনি আমাকে allow করেছেন কিছু বলবার জন্য, আমি বলতে চাই যে আমরা যুক্তফ্রন্ট করেছিলাম ২১ দফার ভিত্তিতে, পূর্ববাংলায় আন্দোলন করেছিলাম, মুসলিম লীগকে পরাজিত করেছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সনের ৫ই আগষ্ট শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কে.এস.পি'র প্রার্থী আবদুল হাকিম ১৭০ ভোটে স্পিকার এবং শাহেদ আলী পাটওয়ারি ১৭৭ ভোটে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী যশোরের শহীদ মশিউর রহমান ও বদরুন্নেসা ৯৩ ও ৯৯ ভোট লাভ করে পরাজিত হন। আওয়ামী লীগ প্রদেশে হেরে যাওয়ায় কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যরা ছিলেন মুসলিম লীগ দলের। চৌধুরী মুহম্মদ আলী মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হলেন। গোলাম মুহম্মদ অসুস্থ হয়ে পড়লে ইস্কান্দার মির্জা অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। মির্জা যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘাত তীব্র করে তোলেন। এ.কে ফজলুল হক তাঁর দল ও হিন্দু ৫ জন সদস্য নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে সম্মত হন। ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয় নি।

১৯৫৫ সনের ১০ই আগষ্ট চৌধুরী মুহম্মদ আলী কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ.কে ফজলুল হক এ মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর কৃষক শ্রমিক পার্টির কয়েকজন সদস্য মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিরোধীদলের নেতা হিসেবে পাকিস্তান গণ-পরিষদে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ২১ দফা ও মারি চুক্তির ৫ দফার সবগুলো আদায় করা সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের বিজয়গত ফলাফল ব্যর্থ হতে থাকে। ১৯৫৫ সনের ১২ই আগষ্ট জাতীয় পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রার্থী বরিশালের আবদুল ওহাব খান (১৯০১-১৯৭২) পাকিস্তান গণ-পরিষদের স্পিকার, গিবন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সনের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে এক ইউনিট বিল পাস হয়। ৬ অক্টোবর নবাব মুশতাক আহমেদ গুরমানী পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর এবং ডা. খান মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান নিয়ে ১৯৫৫ সনের ১৪ই অক্টোবর পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত হয়।

দীর্ঘ ৮ বছরেও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয়নি। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগ দানের পর ফজলুল হক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনের ৯ই জানুয়ারি থেকে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু হয়। পাকিস্তান গণ-পরিষদের বিতর্কে এতদিন ইংরেজী ও উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল এবং উভয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। নতুন গণপরিষদে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য ফজলুল হকের অনুমোদন পায়। পূর্ববাংলার অধিকাংশ সদস্য বাংলায় বক্তৃতা দিতেন এবং তা ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে আবাঙালি সদস্যদের শোনানো হতো। বিরোধীদলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পার্লামেন্টে বির্তকে অংশগ্রহণ করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্বায়ত্তশাসন, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, এক ইউনিট, যুক্ত নির্বাচন, বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা, সংখ্যাসাম্য নীতি ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে স্থান পায়। দীর্ঘ ৮ বছর পর এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান একটি শাসনতন্ত্র পেল। ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ২৪শে মার্চ গর্ভনর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাঙালি গর্ভনর। তাঁর পূর্বে অবাঙালি গর্ভনর ছিল। নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে ফজলুল হক আবার আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী পরিষদকে শপথ গ্রহণ করালেন এবং নিজে শপথ পরিচালনা করলেন। কেন্দ্রে চৌধুরী মুহম্মদ আলী ও মন্ত্রীরা নতুন করে শপথ বাক্য পাঠ করেন। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন। আওয়ামী লীগ সংখ্যাধিক্য প্রমাণের জন্য বারবার আইনসভার অধিবেশন ডাকার জন্য সরকারি দলের প্রতি চাপ প্রয়োগ করে চলে। ১৯৫৬ সনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলা করার জন্য গর্ভনর ফজলুল হক ১৯৫৬ সনের ১১ই জুলাই খাদ্য দপ্তরের ভার সেনাবাহিনীর হাতে দেন। ১৯৫৬ সনের ৪ঠা আগষ্ট আওয়ামী লীগ মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভুখা মিছিল বের করে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ১৯৫৬ সনের ১৩ই আগষ্ট আইনসভার অধিবেশন বসে। আওয়ামী লীগের পক্ষে ২০০জন সদস্য আবু হোসেন সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। ১৯৫৬ সনের ৩০শে অক্টোবর আবু হোসেন সরকার গর্ভনরের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

ফজলুল হক কৃষক-শ্রমিক পার্টির মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান করে পত্র লেখেন। কংগ্রেসের ২৯ জন, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্লামেন্টারি পার্টির ৭ জন, তফসিলি ফেডারেশনের ১২ জন ও গণতন্ত্রী দলের ২ জন আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব আর রইলো না। কৃষক-শ্রমিক পার্টি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৫৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও তাঁর মন্ত্রিসভা এ.কে ফজলুল হকের কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহম্মদ আলীর মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেলে চৌধুরী মুহম্মদ আলীর পক্ষে সদস্য সংখ্যা কমে যায়। ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্রে মুসলিম লীগ ভেঙে যায় এবং অধিকাংশ মুসলিম লীগার মিলে রিপাবলিকান দল গঠন করেন। চৌধুরী মুহম্মদ আলী ১৯৫৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫৬ সনের ১১ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ৬ষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রিসভায় পূর্ববঙ্গ থেকে জহিরুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুল খালেক, দেলদার আহমেদ, লুৎফর রহমান, নুরুর রহমান, বসন্ত কুমার দত্ত মন্ত্রী হন।

কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র ও তরুণ নেতাদের অনৈক্যের ফলে ১৯৫৫ সনে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩৭ সনে যেমন কংগ্রেস তাঁকে বাধ্য করেছিল মুসলিম লীগের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করতে, তেমিন ১৯৫৫ সনে তিনি বাধ্য হলেন কেন্দ্রে মুসলিম লীগের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করতে। ১৯৫৫ সনে যদি যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত না হতো তবে ১৯৫৫ সনের শাসনতন্ত্রে বাংলার অনেক দাবি শাসনতন্ত্রভূক্ত হতো। শেরে বাংলা নিজের দলের অস্তিত্বের জন্য বাংলার সকল স্বার্থ শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ শাসনামালে পূর্ববাংলার জনগণ আত্মবিকাশের সুযোগ পায়। সংখ্যাসাম্য নীতের ফলে বাঙালি যুবকেরা চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ লাভ করে। পূর্ববাংলায় অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম লীগের ৭ বছরে স্বৈরাচারী শাসনের পর বাংলার জনগণ গণতন্ত্রের স্বাদ পায়।

কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুন ও ডা. খানের রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায়। আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের আশ্বাসে রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন দেয়। যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এদিকে গণতন্ত্র বিরোধী প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। সংসদে সংখ্যাগুরু না থাকায় গর্ভনর এ.কে. ফজলুল হক আতাউর রহমানকে পদত্যাগ করতে বলেন। আতাউর রহমান পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে গর্ভনর এ.কে. ফজলুল হক ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[১২৬]

---

১২৬. Pakistan Middle East Journal, Vol. 13, Autumn, 1959.

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে দিয়ে কৃষক-শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ৩১শে মার্চ রাতেই গর্ভনর ফজলুল হককে গদিচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি হামিদ আলী অস্থায়ী গর্ভনর নিযুক্ত হন। ১লা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে গদিচ্যুত করা হয়। তিনি মাত্র ১২ ঘন্টা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আতাউর রহমান খান ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৫৮ সনের ১লা এপ্রিল জননায়ক ফজলুল হক গর্ভনর পদ থেকে অপসারিত হন।

সামরিক শাসন জারী, ১৯৫৮ ঃ

১৯৫৮ সনের ১৮ই জুন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯ই জুন আইনসভায় একটি কাট মোশনে আওয়ামী লীগ হেরে যাওয়ার ফলে আতাউর রহমান খান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিমধ্যে হামিদ আলীর পরিবর্তে সুলতানউদ্দিন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিযুক্ত হন। ২০শে জুন আবু হোসেন সরকার তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তিনদিন পর ২৩শে জুন সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তিনি পদত্যাগ করেন। ২২শে জুন আওয়ামী লীগ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। প্রস্তাবটি ১৫৬-১৪২ ভোটে পাস হয়। ২৩শে জুন প্রদেশে ৯২-ক ধারায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। দু'মাস পর প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নেয়া হয়। আতাউর রহমান খান ১৯৫৮ সনের ২৯শে আগষ্ট পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে নবম মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ দলগুলো পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পিকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টি অনাস্থার বিরোধিতা করে। ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী পাটোয়ারিকে পরিষদের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য আওয়ামী লীগ অনুরোধ জানায়। ২৩শে সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার আসনে বসলেন। বিরোধীদের আঘাতে এক পর্যায়ে শাহেদ আলী আহত হলেন এবং তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর গর্ভনর আইনসভার বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে শাহেদ আলী মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা ইতিহাসে এক করুণ ও কলঙ্কিত অধ্যায় সংযোজিত হলো।[১২৭]

---

১২৭. G.W Choudhury, Democracy in Pakistan, Dacca 1963, P. 56-57

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রে ফিরোজ খান নতুন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান দলের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভার সদস্য। ৭ই অক্টোবর ফিরোজ খান নুন কৃষক-শ্রমিক পার্টি থেকে মন্ত্রী নিতে রাজি হলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থ মন্ত্রী সৈয়দ আমজাদ আলীর স্থলে হামিদুল হক চৌধুরীকে অর্থ মন্ত্রী করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থের ভার বাঙালিদের হাতে তুলে না দেবার অভিপ্রায় থেকেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাধ্য হয়ে ফিরোজ খান নুন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে একই দিনে দু'বার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি পূণরায় আওয়ামী লীগকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সমস্যা হলো দপ্তর বণ্টন ও মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে। মন্ত্রিসভা গঠনের এই সংকটের সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করেন।[১২৮]

ইসকান্দার মির্জা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করেন, আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন এবং জেনালে আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এভাবে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির পর পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। সামরিক শাসন জারির সমর্থকরা এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানান। তারা একে "একটি বিপ্লব, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং নতুন এক যুগের সূচনা" বলে আখ্যায়িত করেন। অধ্যাপক কে.জে. নিউম্যান একে 'প্রতিরোধকমূলক স্বৈরতন্ত্র' (Preventive Autocracy) বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৯] তবে অধ্যাপক খালেদ বিন সাঈদ সামরিক শাসন জারিকে পাকিস্তানের শাসন পদ্ধতি ভেঙ্গে যাওয়া এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা পর্যদুস্ত হয়ে যাবার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা অবশ্য সামরিক শাসন জারির কারণ নির্দেশ করেছেন তাঁর সামরিক শাসন জারির ঘোষণায় এবং তাতে তিনি বলেন-

"There was reithless, struggle for power, corruption, the shameful exploitation of the simple, honest, patriotic and industrious masses, the lack of decorum and the prostitution of Islam for political ends".[১৩০]

---

১২৮. The Dawn Karachi, October 8, 1958

১২৯ Pakistans Preventive Autocracy and causes Pacific Affairs, Vol. 32, March 1969, No. PP 18-33.

১৩০. Government Press note reprinted in The New York Times, October 8, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসন কর্তার দায়িত্বভার গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকা আগমন করেন ও ঢাকা ষ্টেডিয়াম এক বিশাল জনসভায় ভাষণদান করেন। অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতির দরুন লোকচোখে হেয় রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক অংগন হতে বিদায় দেওয়ার কারণে সামরিক অভ্যুত্থানে জনগণ সেই সময়ে আনন্দিত হয়েছিল এবং জেনারেল আইয়ুব খান সাধারণ লোকের প্রাণঢালা সমর্থনও লাভ করেছিলেন। জেনারেল আইয়ুব খান ঢাকা অবস্থানকালেই ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল আইয়ুব খানকে ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং লেঃ জেঃ মুসাকে জেনারেল পদে উন্নীত করে প্রধান সেনাপতির পদ দান করেন। ২৭শে অক্টোবর সকাল ১০টায় জেনারেল আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। দিবা অবসানের কিয়ৎকালের মধ্যেই লেঃ জেঃ আজম খান, লেঃ জেঃ কে,এম, শেখ লেঃ জেঃ ডবলিউ, এ, বার্কী প্রেসিডেন্ট মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পদত্যাগপত্র সই করতে বাধ্য করেন। পদত্যাগপত্র সই করে সস্ত্রীক লন্ডনের পথে রওয়ানা হবার পূর্বকাল পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ কোয়েটা সার্কিট হাউসে ইস্কান্দার মির্জা কালযাপন করতে বাধ্য হন। অর্থ্যাৎ মাত্র ২০ দিন পর দিবাগত রাতে ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৮ সনে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হন। ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পরে পাকিস্তানের রাজনীতিকরা দেশে পারস্পারিক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। দেশে এর অশুভ প্রভাবের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে অবিরাম সংঘর্ষে।"[১৩১]

ছক ঃ ১০

পাকিস্তানের কেন্দ্রে ১৯৪৭-৫৮ সময়কালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল নিম্নরূপ ঃ

পদ	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাষ্ট্র প্রধান	২	২
প্রধানমন্ত্রী	৩	৪
মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী	২৭	২৭
গণপরিষদ ও জাতীয় পরিষদের সদস্য	৮৪	৭৫

উৎস ঃ Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration, Dhaka, UPL, 1972, P. 125

১৩১ Mohammad Ayub Khan, Friends Not Masters, Lahore, 1967m 56-58.

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পরে বহু সংখ্যক আদেশ নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এসময়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের নিকট রাজনীতিকদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা। এসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল সংবাদ পত্রের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা। রাজনৈতিক জনসভা, মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ সীমিত করা।

সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার অব্যবহিত পরই গভর্নর সুলতানুদ্দিন আহমদের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেন গর্ভনরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কালাবাগের নওয়াব পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

সামরিক শাসন জারির কিছু কালের মধ্যে জাতীয় নেতা মাওলানা ভাসানীসহ শত শত দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ১২ই অক্টোবর (১৯৫৮) মাওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ হলেন এবং ১৯৫৯ সালের ৬ই অক্টোবর হইতে ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় সরকারী ভাড়া বাড়ীতে অন্তরীণ রইলেন। সাবেক দুর্নীতি দমন মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৮ সালের East Pakistan Act L X X II/58 এর VA Act 1147 (2) ইত্যাদি দুর্নীতি ধারায় ১৯৫৮ সনের ১২ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৫৯ সনের ৭ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন।[১৩২]

সুতরাং একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পেছনে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সামরিক শাসকবৃন্দ নিজেরাই। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানে রাজনীতির যে নতুন ফর্মূলা তৈরী হয়েছিল তা যদি দীর্ঘকালীন পরিসরে কার্যকর হত। তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব আরো শক্তিশালী ও কার্যকর হত। পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণী কাঠামোয় তারা আরো সুযোগ পেতেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মত শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকও আশাহত হন এবং একই সঙ্গে তার কৃষক শ্রমিক পার্টি কার্যকারিতা হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ পাকিস্তানে শাসনের দায়িত্বে আসেন সংকীর্ণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক প্রমাণিত কর্মকর্তাবৃন্দ। ফলস্বরূপ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কার্যক্রম চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৩২.
আবু আল সাইদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ৯৯- ১০০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৬

উপসংহার ঃ

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক, বাঙালি জাতীয়তাবদের অন্যতম স্থাপতি, লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক, শোষিত, লাঞ্চিত কৃষক প্রজার মুক্তিদাতা শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল জ্যোতিষ্ক। তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মহা আকর্ষণে তিনি লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে জয় করে জননায়ক হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সাধারণ বাঙালির কাছে 'হক সাহেব' ছিলেন তাদের একান্ত আপনজন। তাঁর সমাজ দরদী আদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রচলিত সুবিধাবাদী মুসলিম নবাব ও নাইটদের রাজনীতি থেকে ছিল স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী। এজন্যে তাঁর বক্তৃতায় শোষিত মানুষ, নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের ***** ও সমস্যাবলির প্রতিফলনের আধিক্য দেখা যায়। বস্তুত আজকের শিক্ষিত বাঙালি বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির পিছনে ফজলুল হকের অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনি বক্তৃতায় প্রায়ই বলতেন, "বাংলার নরম মাটির সাধারণ মানুষকে চিরদিন নিশ্চিন্তে নিজস্ব কুঁড়ে ঘরে থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনতের বদৌলতে দুবেলা দু মুঠো ডাল-ভাতের সংস্থান করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমার রাজনীতিক এই ডাল-ভাতের রাজনীতি। তাই লাঙ্গল যার জমিন তার, ঘাম যার, দাম তার'। এই শপথ নিয়েই আমি দেশ সেবার পথ নিয়েছি"।

শোষিত জনগণের প্রতি আন্তরিক দরদ, অনেক সময় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা, কংগ্রেসে যোগদান, কংগ্রেস ত্যাগ, লীগে নেতৃত্ব দান, লীগ পরিত্যাগ প্রজা পার্টি গঠন, প্রজা পার্টির। নিষ্ক্রিয়তা এসব ক্ষেত্রে ফজলুল হক দ্বৈত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে তাঁর কৃষক শ্রমিক দল বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে চড়াই উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হন, যদিও আইনসভায় তাঁর দল আওয়ামী মুসলিম লীগের চেয়ে অনেক কম আসন লাভ করেছিল। এটা তার রাষ্ট্রপরিচালনার দক্ষতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশক। পাকিস্তানের সদ্য গঠিত গণপরিষদে তাঁর যথেষ্ট সমর্থক ছিল। তারা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতেন যার ফলে ১৯৫৫ সালের আগষ্টে ফজলুল হককে স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন এবং ১৯৫৮ সালে যে পদ থেকে অপসারিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তার মৃত্যুর পর থেকেই কৃষক শ্রমিক পার্টি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারিয়ে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি দলটির অস্তিত্ব প্রশ্নবোধক হয়।

সুতরাং শেষ অধ্যায়ে কৃষক শ্রমিক পার্টির সবচেয়ে সফল সময় এবং একই সঙ্গে দলটির দ্রুত ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ পূর্বক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নিজস্ব অভিমত তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার সময়কাল যেহেতু ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত। সেহেতু সফলতা ও ব্যর্থতা আলোচনায় এই সময়কালকেই আর্থিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬.১ কৃষক শ্রমিক পার্টির অবস্থান, সফলতা ও ব্যর্থতা (১৯৫৩-১৯৫৮)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। কিন্তু সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে যুক্তফ্রন্ট তথা কৃষক শ্রমিক পার্টির এই বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেমন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন,"Despite its victory in 1954, the United Fron was unable tobring about radical change in Pakistan's Political life largely because of its own internal factional rivallries".[১৩৩] অর্থ্যাৎ প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণেই, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্বেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে যুক্তফ্রন্ট কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও চুয়ান্নর নির্বাচনোত্তর কালে এর গতি হারিয়ে ফেলে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ১৯৫৬ সালের পর থেকে সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তবে লক্ষনীয় বিষয় হলো উপরোল্লিখিত মন্তব্যের আঁটসাঁট বুননের বাইরে যে স্রোতধারা সদা বহমান ছিল যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার মধ্যেও তা থেমে যায় নাই। আর তা হল রাজনৈতিক দল হিসাবে কৃষক শ্রমিক পার্টি এদেশের কৃষকদের মনে যে জাগরণের বার্তা পৌঁছে। দিয়েছিল তার অবিনাশী অস্তিত্ব কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। পাকিস্তানের জন্মলগ্নের মূখ্য অংশীদার অর্থাৎ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক হওয়া সত্বেও বাংলার আপামর জনসাধারণের নয়নমনি কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়।

---

১৩৩. Talukder Maniruzzaman (2003), Radical Politics and the emergence of Bangladesh, Dhaka Mowla Brothers p-75).

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এই দলের নেতা ফজলুল হক বাংলার রাজনীতির প্রতিভূসত্তা হিসেবে পূর্ণ মর্যাদায় ফিরে আসেন। কিন্তু অপরদিকে এই নির্বাচনের পরাজিত মুসলিম লীগ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। 'গণ জাগরণ' এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবর্তে এসময় প্রতিশোধ স্পৃহা দ্বারা মুসলিম লীগের প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পরিচালিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক 'দৈনিক আযাদ' যা কিনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর স্বত্বাধিকারে ছিল, সেই পত্রিকা প্রচারে শেরে বাংলা ও বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

অথচ শেরে বাংলা কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উথাপনের পূর্বে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলমানদের নিকট মর্যাদা পূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। যাঁর কারণে মুসলিম লীগের শক্তি সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল তাঁকেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করার প্রকৃত প্রস্তাব ছিল অপচেষ্টা স্বরুপ। তাই দেখা যায় শত অপপ্রচার সত্বেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে ফজলুল হককে তার নিজের আসনে পরাজিত করতে পারেনি মুসলিম লীগ। অথচ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ফজলুল হক ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার আপামর জনসাধারণের সম্মুখে মুসলিম লীগের আসল চেহারা তুলে ধরে জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে সাড়া দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি বাংলার জনগণ। ব্যাপক গণজাগরনের জোয়ারে মুসলিম লীগ সেদিন ভেসে গিয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এইরুপ গণজাগরণ ১৯৫৪ সালের পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। তাই দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় বিজয়ের পাশাপাশি নুরুল আমিনের মত জাতীয় পর্যায়ের নেতাও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা তথা আপামর জনসাধারণের গণজোয়ারকে সাংবিধানিক রাজনীতি অভিমুখে এগিয়ে নেয়ার এমন প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ ১৯৫৪ সালের আগে আর কখনোই বাংলায় দেখা যায় নাই। এই জাগরণের অন্যতম পথিক ছিল রাজনৈতিক দল হিসেবে কৃষক শ্রমিক পার্টি আর অন্যতম নেতা হিসেবে ছিলেন শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক। এখানেই মুসলিম লীগের সাথে কৃষক শ্রমিক পার্টির তথা যুক্তফ্রন্টের পার্থক্য আর নেতা হিসেবে নুরুল আমিনসহ তার পর্যায়ের যে কোন মুসলিম লীগের নেতার সাথে ফজলুল হকের মৌলিক পার্থক্য।

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে সংসদীয় দলের প্রধান করে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দল গঠন করা হয়। এই দিনই ফজলুল হক মূখ্য মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে

Dhaka University Institutional Repository

শপথ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ ছিল। যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা কালে এ অবস্থা আরও খারাপ হয়। আইনশৃঙ্খলা খারাপ হবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের শরীক কম্যুনিষ্টদের দায়ী করেন। পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দলের বিরোধিতার কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হবার ব্যাপারে কম্যুনিষ্টদের প্রতি সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে এবং কোলকাতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও উপমহাদেশ বিভক্তি সম্বন্ধে ফজলুল হকের বিবৃতি যুক্তফ্রন্টের বিশ্বস্ততার প্রতি সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়।

নির্বাচনের পরপরই যুক্তফ্রন্ট কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি বাতিল এবং বাঙ্গালী সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলেন যারা বিগত সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংবিধান প্রণয়ন বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কেন্দ্রের সম্পর্কের ব্যাপারে ফজলুল হকের সাথে প্রধান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের আলোচনা অসফল প্রতীয়মান হয়। প্রধান মন্ত্রীর মতে ফজলুল হক কৌশলে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আর তিনি (ফজলুল হক) শুধুমাত্র অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বৈদেশিক বিষয়, মূদ্রা এবং প্রতিরক্ষা বিষয়াদি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালে ২৯ মে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন আর এই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের কারণ হিসেবে প্রধানত: আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বহাল রাখতে ফজলুল হক মন্ত্রী সভার ব্যর্থতাকে দায়ী করা ছাড়া প্রধান মন্ত্রী এসময় ফজলুল হককে পাকিস্তানের একজন স্বীকৃত বিদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অসহযোগিতায় Underterred থেকে এবং সেখানে জনগণের রায়কে অবহেলা করে মোহাম্মদ আলী সংবিধান প্রণয়নের কাজ হাতে নেন। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরের নভেম্বর মাসে সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা পরিত্যাক্ত হয়েছিল। কন্সটিটিউন্ট এ্যাসেম্বলি ১৬তম অধিবেশন ১৪ মার্চ আহবান করা হয়েছিল আর এটি ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ পর্যন্ত অব্যাহগত ছিল।[১৩৪] এসময় Basic principles Committee Report চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়। এই রিপোর্টের সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রা প্রভৃতি সীমিত রাখার কথা বলা হয়। বিরোধী দলের একজন হিন্দু ধর্মাম্বলী সদস্য এ সময় স্মরণ করিয়ে দেন যে পূর্ব বাংলার জনগণ ঘোষণা করেছেন, যে সমস্ত সদস্য এখানে বসে আছেন তারা পূর্ব বাংলার জনগণের মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং তাদের পক্ষে কথা বলার অধিকার এই সদস্যদের নেই। রিপোর্টের শিডিউল ১ এর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনকালে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের বক্তৃতা ছিল। কিন্তু বিরোধী সদস্যদের ইঙ্গিত ও অভিযোগ পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১৩৫]

---

১৩৪. Index to the Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol.xvi, 1954 (14 March 1954 to 21 September 1954).

১৩৫. Constituent Assembly Debates, Vol.xvi, No. 27 (15 September 1954) 375

Dhaka University Institutional Repository

তাই মুসলিম লীগের সদস্যগণ গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি পুরোপুরি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন।

তবে পাঞ্জাবী নেতৃত্ব, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে রাজনৈতিক আঙ্গিনায় যে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যে নিরংকুশ ভোট পড়েছিল তার প্রভাব অতি দ্রুত অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলো। পার্লামেন্টে বাঙ্গালীদের খাঁটি সংঘবদ্ধতা খুব সহজেই ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোকে প্রণোদিত করতে সক্ষম ছিলেন আর এ প্রভাবে পাঞ্জাবী প্রভাব ক্ষুন্ন করার প্রয়াস চলতো। লীগ দলীয় নেতাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের যে ফর্মূলা মোহাম্মদ আলী গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি পাঞ্জাবী নেতৃত্ব সহমত পোষণ করেছিলেন। তবে মুসলিম লীগ, নেতৃত্বে সামঞ্জস্য বিধানে যত দ্রুত রাজী হয়েছিলেন, বাঙ্গালী রাজনীতিকগণ অতি সহজেই তাতে রাজী হতে পারেন নাই। কারণ মুসলিম লীগের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলো। ব্যাসিক প্রিন্সিপালস কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন যখন চূড়ান্ত স্তরে ছিল তখন পাঞ্জাবের মূখ্য মন্ত্রী ফিরোজ খান নুন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহের জন্য আঞ্চলিক উপ-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। এর প্রেক্ষিতে আরো উত্তপ্ত বিতর্ক সংঘটিত হয়। একজন বাঙ্গালী সদস্য অভিযোগ করেন যে পাঞ্জাবের মূখ্য মন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানকে স্থায়ী সংখ্যালঘু বানানোর জন্য চেষ্টা করছে আর এ প্রচেষ্ঠায় অন্যান্য প্রদেশগুলোকে সামিল হতে বাধ্য করছেন যাতে তারা তার লৌহ আলিঙ্গন ছেড়ে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ না করতে পারে।[১৩৬]

পাঞ্জাবী সদস্যরা যখন পাঞ্জাবের মূখ্য মন্ত্রীর প্রস্তাবকে সমর্থন করছিল তখন পূর্ব পাকিস্তান এবং ছোট প্রদেশগুলোর সদস্যগণ এই প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করছিল। সভায় তাদের এই সব বিরোধীতাগুলো বিবেচনায় আনা হয় নাই এবং সংবিধান প্রণয়ন কাজ এগিয়ে যেতে থাকে।

পরিষদে সদ্য নির্বাচিত বাঙ্গালী প্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতি প্রস্তাবে পাঞ্জাবের সম্মতির মধ্য দিয়েই সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা এক ধরণের সংকটের অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। সরকারি সদস্যগণও গর্ভনর জেনারেলের কাছ থেকে কিছু প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এটি বোঝা যায় গভীর গোপানীয়তা ও জরুরী ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর দুটি আইনগত পদক্ষেপের ব্যাখ্যায়। ওগুলো ছিল (ক) পাবলিক এন্ড রিপ্রেজেন্টিটিব অফিসার্স ডিসকোয়ালিফিকেশন (অযোগ্যতা) এ্যাক্ট, ১৯৪৯ (PRODA) বাতিল । এবং (ক) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধন।

১৩৬.
আবুল মনসুর আহমদ- আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- Vol. 1. PP- 48-49

Dhaka University Institutional Repository

প্রোডা ব্যবহার করা হত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে। এই আইনে কেউ সাজা প্রাপ্ত হলে সে নির্বাচনে অযোগ্য বিবেচিত হত। গভর্ণর জেনারেল কেবল এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ শুরু করতে পারতেন। আর দেখা গিয়েছিল আইন পরিষদের সদস্যসহ কতিপয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ অর্থ্যাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধনের পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল প্রধান মনত্রীকে বাতিল করে দেয়ার ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা রহিত করা যা নাযিম উদ্দিনের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। একজন বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উথাপিত বিল দুইটির উপর বিতর্ক চলা কালে, সরকার কোন ভুমিকা পালন করে নাই। শুধু আইন মন্ত্রী এর খসড়াটি শুদ্ধ করেছিলেন, আর উথাপনের খুব দ্রুত এ দুটি আইন পরিষদে পাস হয়ে যায়। সংবিধানিক কাঠামো এবং উল্লিখিত দুটি আইন পাস হবার পর সংবিধান বিল গ্রহণের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত কন্সটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মূলতবী হয়ে যায়।[১৩৭, ১৩৮]

এসব কিছু পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হবার আগেই ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ গভর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা দ্বারা জনগণের আস্থা হারিয়েছে এই কারণ দেখিয়ে কন্সটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি বাতিল করে দেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে এই এ্যাসেম্বলী সাত বছর যাবত নিজেকে স্থায়ী করে রেখেছে এর মধ্যে বেশীর ভাগ সদস্য কাউকে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা হারিয়েছে। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণতন্ত্র মনা ছিলেন না। তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা ছিল নিজস্ব সংবিধান চাপিয়ে দেয়া। এটি ২৭ মার্চ ১৯৫৫ সালে জারিকৃত ক্ষমতা অধ্যাদেশের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই অধ্যাদেশ বলে গভর্ণর জেনারেলের নিকট পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান আদেশ জারি করেই ক্ষান্ত হন নাই। বিদ্যমান সংবিধানের কতিপয় বিধান বাতিল অথবা সংশোধন করেন অধ্যাদেশের একই সাথে ইস্যুকৃত জরুরী অবস্থার ঘোষণার দ্বারা উত্থিত কোন বিষয় আদালতের এখতিয়ার থেকে বহির্ভূত করেন। কন্সটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে পথ খুজে পেতে ব্যর্থ হয়ে গভর্ণর জেনারেল এবং পাঞ্জাবী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখন চিন্তা করেন যে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংবিধান আরোপ করে দেয়া ছাড়া পাঞ্জাবের অধিকার রক্ষা করা যাবে না।

---

১৩৭. CAD Vol.xvi, No 30 (20 September 1954)

১৩৮. CAD vol.xvi, No. 31 (21 September 1954).

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করে ফেডারেল কোর্ট এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় এবং এর বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ ঘোষণার দ্বারা অতিরিক্ত আইনগত ক্ষমতা গ্রহণ থেকে গভর্ণরকে বিরত করেন। তমিজ উদ্দিন খান এবং ইউসিফ প্যাটেলের মামলায় আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাতে দেশের সমগ্র আইনগত সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। প্রধান বিচার পতি মোঃ মনিবের নেতৃত্বে ফেডারেল কোর্ট গাইড লাইন মোতাবেক গভর্ণর জেনারেলকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রবর্তন করতে বাধ্য করেন।

তবে কন্সটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী বাতিলকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সংক্রান্ত ফেডারেল কোর্টের পরোক্ষ তৎপরতা একটি খারাপ উদাহরণ হিসাবে সমালোচিত হয়েছে। বাতিলকৃত পরিষদের স্পীকার সিন্ধুর চীফ কোর্টে গভর্ণর জেনারেলের বিরুদ্ধে রীট পিটিশন দাখিল করনে।

এর প্রেক্ষিতে আপীল ফেডারেল কোর্ট পরিষদ বাতিলের ব্যাপরে গভর্ণর জেনারেলের কাজের গুনাবলীর দিকে যান নাই। অন্তবর্তী সংবিধান হিসেবে গৃহীত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের টেকনিক্যাল যুক্ত প্রদর্শনের দিকে এটি ধাবিত হয়, যাতে রীট ইস্যু করায় ব্যাপারে কোর্টে এখতিয়ার দেয়া আছে। তবে এটি বৈধ নয় কারণ গভর্ণর জেনারেলের সম্মতিতে এটি লাভ করে নাই (পাকিস্তান ল ডিসিশনস (পি এল ডি) ২৪১)। গভর্ণর জেনারেলের রেফারেন্স হিসেবে ১৯৫৫ সালের ১০ মে কোর্ট এর রায়ে পরিষদ বাতিলের ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল কে উপযুক্ত গণ্য করেন।

পরিষদীয় দলগুলোর জন্য পরিষদ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তাই এটি বাতিলের কারণে অবশ্যম্ভাবী ভাবে যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুটি শরীকদল কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী লীগ গভর্ণর জেনারেলের Favours পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।[১৩৯] পরিষদ বাতিলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করার কারণে সোহরাওয়ার্দীকেও এই মর্মে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রতিশ্রুতি দেন যে, কোয়ালিশন মন্ত্রি সভা গঠন করা হলে সোহরাওয়াদী কে প্রধান মন্ত্রী বানানো হবে। প্রাক ১৯৪৭ রাজনৈতিক উন্নয়ন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের বিষয় এটি অনেকটা ব্যক্তিগত বিবরণ যা ১৯৬০ পরবর্তী বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।[১৪০]

---

১৩৯. Basic Constitutioal Documents, vil.1,279
(All Pakistan Lead Decisions (PLI) 1955, Vol

১৪০. M Rafiqul Afzal -Political Parties in Pakistan 1947-1958 Islamabad: National Istitute of History and Cultural REsearch, 1986, Vol.1, p. 147).

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত মোহাম্মদ আলীর ঈধনরহবঃ ড়ভ ঃধষবহঃং এ ডিসেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দীকে যুক্ত করে নেয়া হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যার প্রতি যুক্তফন্ট্রের সমর্থন ছিল, ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে সোহরাওয়ার্দীকে ভারসম্য করার লক্ষ্যে ফজলুল হকের মনোনীত একজনকে কেবিনেট সংযুক্ত করেন। ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী যুক্তফন্ট্রের প্রধান এই দুই নেতা গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রী পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন নাই। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর এপ্রিল ১৯৫৫ মাসে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব থেকে ফজলুল হককে অপসারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।[১৪২]

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসুচিতে তাঁরা সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন তথাপি মূলতঃ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এই বিভক্তি দেখা দেয়া। বাঙ্গালীর স্বার্থের ব্যাপারে ফজলুল হকের আপসহীনতার বিপরীতে ব্যক্তিগত পদ লাভের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী আপসকামীতা এই বিভক্তিকে প্রকট করে তোলে।[১৪৩]

এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, যে অবাঙ্গালী নেতৃত্ব ফজলুল হকের রাজনৈতিক সহযোগিতায় পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌছাতে পেরেছিলেন সেখানে সোহরাওয়ার্দীর ভুমিকা ছিল না বললেই চলে। বিশেষতঃ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হক যে প্রস্তাব করেছিলেন এবং যার কারণে পাকিস্তান আন্দোলন তথা জিন্নাহর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্র হয়েছিল সেখানে সোহরাওয়ার্দীর কোন ভুমিকা দেখা যায় না। সেই সময় (১৯৪০ সালে) যে বাঙ্গালী নেতৃত্বের ভূমিকা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য হয়েছিল সেই নেতৃত্বই পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথমে অবহেলিত এবং পরে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'গণ জাগরণ' এবং সাংবিধানিক রাজনীতির মোড় হিসেবে যদি এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা যায় তা হলে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় যে, লাহোর প্রস্তাব ছিল বঞ্চিত মানবতার মুক্তির দাবী আর সে দাবী বাস্তবায়ন এবং তা প্রতিপালনের প্রতিভূ ছিলেন ফজলুল হক। ১৯৫৪ সালেও তিনি ছিলেন তাই। জিন্নাহ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের সময় কোন জন প্রতিনিধিত্বকারী নেতা ছিলেন না। তা হলে জিন্নাহ নিজেই তো মুসলমানদের দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি উত্থাপনের দায়িত্ব নিতে পারতেন।[১৪৪]

---

১৪২. (Afzal, Plitical parties vol.1 পৃষ্ঠা-150)

১৪৩. Afzal, Political Parties vo.1 পৃষ্ঠা- 151

১৪৪. Kamruddin Ahmed. The Social History of East Pakistan Dhaka, 1967, c,,ôv 133-35|

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হককে এই প্রস্তাব উত্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই কারণেই যে, ফজলুল হক উত্থাপন করলে তা ভারতীয় জনগণ এবং তৎকালীন বৃটিশ শাসক উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কারণ তিনি কৃষক তথা বেশীরভাগ জনগণের পরীক্ষিত নেতা। সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কারণ ফজলুল হক সাংবিধানিক রাজনীতিরও পরীক্ষিত নিয়ন্তা তথা অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। জিন্নাহ যদিও বৃটিশ পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তাঁর যে ভূমিকা তা এই ব্যবস্থার সাংবিধানিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের নামান্তর বৈ কিছুই ছিল না।

অপরদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনিয়মতান্ত্রিকতাকে মজবুত করতে সহায়ক হয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার অসাংবিধানিক প্রবনতার সূত্রপাত করেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। জিন্নাহর মৃত্যুর পর সেই ধারা অব্যাহত ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে গণজাগরণ ও সাংবিধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পরীক্ষিত নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙ্গালীদের যে রাজনৈতিক জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল তা ছিল অসাংবিধানিক ও গণবিরোধী রাজনীতির ধারক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে হুমকি স্বরুপ।

পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান, যিনি নতুন মন্ত্রী সভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রি ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের বর্তমান এবং ভবিষ্যত সমস্যা সম্পর্কে মন্ত্রি পরিষদের কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি জোড়ের সাথে এই বক্তব্য তুলে ধরেন যে প্রথম করণীয় হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানকে একীভূত করা এবং এ জন্য খুব কঠিনভাবে চাপ প্রয়োগ করেন এবং প্রদেশগুলোর একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। বস্তুত এ ধারনাটি পুরাতন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে স্যার আর্চিবল্ডরাওল্যান্ডস (Sir Archibald Rowlands) পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বলেছিলেন, 'I personally think that on grounds of econmy, both in terms of money and of adminstrative manpower, there is in fact, a great deal to be said for such on amalgamanation (of West Punjab Sind, the NWFP and the Balochistan to be christended West Pakistan), but I recognize that such a solution is politically impossible at least in the immediate future". তবে এটা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থ ও প্রশাসিনক জনশক্তির ক্ষেত্রে, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশগুলোকে পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি প্রদেশে একীভূত করা সম্পর্কে অনেক বলার আছে, তবে এটাও বলা হয়

Dhaka University Institutional Repository

যে অন্ততঃপক্ষে নিকট ভবিষ্যতে এ ধরণের রাজনৈতিক একটি সমাধান অসম্ভব। ১৯৫৪ সালের গোলমেলে পরিস্তিতির সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়টি প্রধান বিবেচনা হিসেবে গণ্য হয় নাই, যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ওগুলোকেই প্রকৃত যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এ সময় একীভূতকরণের তাৎপর্য ছিল বাঙ্গালী কর্তৃত্বের আসন্ন হুমকি মোকাবেলা করা।[১৪৫]

একটি নতুন আইন সভা গঠনের উদ্দেশ্য সম্বলিত ১৯৫৫ সালের কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী আদেশে দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের সাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। বিগত পরিষদে বাঙ্গালীদের সংখ্য গরিষ্ঠতা ছিল এবং যদিও সাম্যের নীতি মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দলগুলো তখনও এই ফর্মূলায় সম্মতি জানায় নাই। যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলো নতুন কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর নির্বাচন বয়কট করার কথা ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলকে আলাদা আলাদা ভাবে সামলাতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগকে সামলানোর জন্য ভাসানীকে পাকিস্তানে ফিরে আসতে সম্মতি এবং যথারীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি হিসেবে অধিষ্ঠিত সোহরাওয়ার্দীকে প্রধান মন্ত্রীত্বের যুক্তিপূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিকে সাম্য নীতিকে গ্রহণে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি করান। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ পুনঃবহাল করে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে মূখ্য মন্ত্রী করায় সহজেই কৃষক শ্রমিক পার্টির এবং এর নেতা ফজলুল হককে সম্মত করা সম্ভব হয়।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৮০ সদস্যের আইন সভায় ২৫ জন সদস্য সহ মুসলিম লীগ ছিল বৃহত্তম একক রাজনৈতিক দল, মুহাম্মদ আলী নামের একজন বাদে মুসলিম লীগের ২৪ জন সদস্য, পশ্চিম পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের ছিলেন (আওয়ামী লীগ বাদে) ১৬ জন সদস্য, এবং আওয়ামী লীগের ছিল ১২ জন, অবশিষ্ট আসনগুলো ছোট ছোট দল এবং স্বতন্ত্র সস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৭ই আগস্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আলী যিনি ইস্কান্দার মির্জার নিয়োগকে বাধাগ্রস্থ করছিলেন, তাঁকে জেলে যেতে হয়। সোহরাওয়ার্দীকে প্রধান মন্ত্রী করার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের বিরোধীতার কারণে মুসলিম লীগের সাথে আওয়ামী লীগের দেন দরবার ব্যর্থ হয়ে যায়। ফজলুল হক একুশ দফা প্রশ্নে আপস করতেও নারাজি ছিলেন।

---

১৪৫. "The looming threat of Bengali domination", Hasan Azheer, The seperation of East Pakistan, The Rise and Realization of Bangali Muslim Nationalism, Dhaka The University Press Ltd. 2001, p-38.

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ১৯৫১ সাল থেকে প্রতি মন্ত্রি সভায়, একজন মন্ত্রি হওয়া সাবেক বেসামরিক কর্মকর্তা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা হল এবং এভাবে তিনি লীগ যুক্তফ্রন্ট কোয়ালশন মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ প্রথম যে আইনটি পাস করে তা হলো Establishment of West Pakistan Act. এটি হয় ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যে প্রকৃতি অনুসরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের একীভূত করা হয় আওয়ামী লীগ এই বিলটির বিরোধীতা করেছিল যদিও আইন মন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী এর খসড়াপ্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন। তাই কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে এই বিল পাশ করতে কোন অসুবিধা হয়নি। বস্তুত পক্ষে অনুমোদন দেয়া ছাড়া পরিষদের আর কোন বিকল্প ছিল না। ১৪৬

কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী যখন ভেঙ্গে দেয়া হলো তখন খসড়া সংবিধান প্রস্তুত হয়েছিল, তবে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে কয়েকটি বিতর্কিত পয়েন্টে পুনঃআলোচনার দরকার পড়েছিল। ৩ নভেম্বর ১৯৫৫ সনে আইনমন্ত্রী আই, আই, চূন্দ্রীগড় মন্ত্রি পরিষদের নিকট চারটি পয়েন্টে সরকারের সিদ্ধান্ত চেয়ে রিপোর্ট করেন। ওগুলো ছিল (ক) প্রদেশগুলোর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বন্টন (খ) নির্বাচন সকল সম্প্রদায়ের যুক্তভাবে, না মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যা লুঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে হবে (গ) কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলোর ভাষা কি হবে আর ইংরেজী যদি অফিসিয়ালভাবে ব্যবহৃত হয় তবে তা কতকালের জন্য এবং (ঘ) সংবিধানে ইসলামী নিয়ম কানুন এবং আকৃতি কিভাবে সংযোজিত হবে। প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে কোয়ালিশন পার্টি কর্তৃক গঠিত সাব কমিটির নিকট এই সব ব্যাপারে উপস্থাপন করা হলো। এই সাব কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ফজলুল হক এবং তাঁর দলের দুজন সদস্য, স্বল্প পরিচিত একজন ধর্মীয় নেতা, এবং দুজন হিন্দু সদস্য। ১৪৭

১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারী কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে খসড়া সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়। এখানে পূর্ব পশ্চিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের তালিকা যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক এবং যুগ্ম গুলো ছিল মূল ইস্যু। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, অন্তবর্তী সংবিধান এবং ব্যাসিক প্রিন্সিপালস কমিটির রিপোর্টের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

১৪৬.
(Mohammad Ayub Khan, Friends not Masters (Karachi Oxford University Press 1967) p-192.

১৪৭.
Sir Archibald Rowlands Report on the Economic prospects of Pakistan, in Rowlands to Quai-I-Azam, No. 229/AGG, 4 December 1947, Rizwan Collection (Karachi Handard Library)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম ছিল শুধু এই যে, প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধানে বা Basic Principles Committee-র চূড়ান্ত রিপোর্টে প্রদেশগুলোর ওপর রেলওয়ের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। আর যেসব বিষয়সমূহ তালিকার মধ্যে উল্লেখ নেই সেগুলো প্রদেশের উপর দেয়া হয়। কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলোর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য নিয়মকানুন পূর্বে যেমন প্রস্তাব করা হয়েছিল সে রকমই ছিল। কেন্দ্রের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ শান্তিকালীন নিয়মকানুনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। যেমন প্রদেশগুলোরে প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দেশনামা জারী করার ক্ষমতা, গভর্ণরদের নিয়োগদান, এবং প্রদেশগুলোতে সিনিয়র সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। কঠিন আপতকালে, প্রেসিডেন্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে এবং প্রদেশের সকল আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, প্রেসিডেন্টই একমাত্র নির্ধারণ করতে পারত যে জরুরী অবস্থা জারি হবে কিনা। একটি মাত্র কাঠামোগত পরিবর্তন ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংঘটিত হয় তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানের একীকরণ। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা মর্যাদা দেয়া হয়, আর বলা হয় যে নির্বাচক মন্ডলীর বিষয়াদি পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।[১৪৮]

১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারী কৃষক শ্রমিক পার্টির নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব দুই অংশের মধ্যেকার সমস্ত বিষয়াদিতে সাম্যনীতির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মতদ্বৈতার বিষয়গুলো নিরসনের জন্য যদিও আওয়ামী লীগের ২১ জানুয়ারী ১৯৫৬ সনের তারিখে সভায় সর্বদলীয় প্রস্তাব করা হয়, তথাপি এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী নরম মনোভাব পোষণ করতেন। তবে আওয়ামী লীগের এই প্রস্তাবে ফজলুল হক রাজী ছিলেন। তখন সোহরাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রী আর তার পূর্বে প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তাব নাকচ করার বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম যে তিনি And the gentleman who led the United Frontparty (Fazlul Haq) togethger made a prayer to the Prime Minister (Chowdhury Muhammad Ali) to suspend the sitting (of Constituent Assembly)for only two or three days for the purpose of harashing out the controversial matters but the Prime Minsiter refused to give that time.[১৪৯]

১৪৮.
G.W. Chowdhury Constitutional Developent in Pakistan, (London Longman) p. 80. Dawn 23 February 1955

১৪৯.
Hasan Zaheer, the separation of East Pakistan ,the rise and Realization of Bangali Muslim Nationalism .

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ্যাৎ যে ভদ্রলোক যুক্তফন্ট্র দলের নেতৃত্বে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী তাঁর সাথে একত্রে প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নিকট দুই অথবা তিন দিনের জন্য কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাতে অমিমাংসিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায় কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

চৌধুরী মুহাম্মদ আলী জানতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দলগুলো একত্রে সমবেত হলে তাকে একটি সলিড ফ্রন্টের মোকাবেলা করতে হবে। পৃথকভাবে তিনি ফজলুল হক ও তাঁর দলকে সাংবিধানিক প্রস্তাবগুলো সমর্থনের জন্য রাজি করাতে পারবেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্টের সন্দেহজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও এর মন্ত্রীসভাকে টিকিয়ে রাখা হয়। একজন চতুর রাজনীতিক হিসাবে সোহরাওয়ার্দী প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা প্রভৃতির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আটকে রাখা যে বাস্তব রাজনীতি নয় এটা অনুধাবন করে ক্ষমতার জন্য কেন্দ্রের সাথে যে কোন কিছুর বিনিময়ে আপোষ করতে চাচ্ছিলেন।

কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হকের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এবং দল হিসেবে কৃষক শ্রমিক পার্টির অবস্থান বুঝতে হলে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি তুলনা মূলক আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে আলেক্স ডি টকভিলের বক্তব্যকে নির্দেশিকা হিসাবে তুলে ধরা যায়। টকভিল বলেছেন- without comparison my mind does not know how to proceed. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত পূর্ব পাকিস্তানের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আওয়ামী লীগ আর এদল দুটির নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিনিধিত্ব চরিত্রের গুণগত মান ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ফজলুল হক বাংলার কৃষক নেতা হিসাবে ১৯৩০ এর দিকেই আবির্ভূত হন। তাঁর প্রভাব ছিল ব্যক্তিগত। আর তিনি যখন যা সুবিধাজনক মনে করতেন সেই অনুসারে তাঁর দলের মর্যাদা পরিবর্তিত হতে থাকে। চুয়ান্নর নির্বাচনোত্তর পাকিস্তানের রাজনীতির বিভিন্নমুখী মেরুকরণের সময় ফজলুল হক ছিলেন ৮৪ বৎসর বয়সের প্রবীন। শহর কেন্দ্রীক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্বের জেনারেশনই ছিল কৃষক, আর ছাত্রদের অভিভাবকদের প্রায় সবাই ছিল কৃষক। পূর্ব পুরুষ এবং অভিভাবক কৃষকদেরকে দুর্দশা থেকে মুক্তির বার্তা শুনিয়েছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি। সেই মুক্তির বার্তা রা গণজাগরণের বাহক ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নেতা ফজলুল হক। গণজাগরণের বার্তাকে ফজলুল হক সাংবিধানিক রাজনীতির ধারায় প্রবাহিত করেছেন। ফজলুল হকের বয়সে এবং তাঁর অনুসৃত গণমুখী রাজনীতির ধরণ অনুসরণ করে আওয়ামী লীগসফলতার সাথে গণজাগরণ ও সাংবিধানিক রাজনীতির বাহকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক ইস্যুগুলো টেকসই আকারে মিমাংসা করার মতন ঐক্যমতের গুণাবলী পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ছিল না। সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট করার বিল তৈরী করেছিলেন। তবে এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপনের সময় তার অবস্থান ছিল বিরোধী দলে, তিনি তাঁর নিজের তৈরী করা বিলের বিরোধীতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন এক ইউনিটকে বাতিল করার প্রস্তাব শক্তিশালীভাবে প্রতিহত করেন। একই সাথে তিনি ঘোষণা করেন যে সংবিধানে শতকরা ৯৮ ভাগ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা হয়েছিল। তবে পরিষদে সমস্ত প্রকার বিরোধিতা এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশের মুখে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধান বিল পাস হয়। পরিষদে চুড়ান্ত ভোট দান হবার পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়াক আউট করে, এবং পরপরই হিন্দু সদস্যগণ, গণতন্ত্র দল এবং আজাদ পাকিস্তান পার্টি ওয়াক আউট করে।[১৫০]

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে সংবিধান কার্যকর হয় তবে পূর্ব পশ্চিম সম্পর্ক আগের মতই টানাপোড়নের মধ্যে রয়ে যায়। ভাসানীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং শেখ মুজিবর রহমানের সাংগঠনিক দক্ষতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের শ্লোগানে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান সংহত করতে থাকে। নতুন সংবিধানের অধীনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রীত্বে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান (নেতৃত্বে) মূখ্য মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা লাভ করে। কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তবে সব জায়গায় আওয়ামী লীগই থাকে প্রধান অংশীদার। বলা যায় প্রথম ও শেষ বারের মত ক্ষমতা কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তান অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার কালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থন নিয়ে তিনি তাঁর মুসলিম লীগ সরকার পরিচালনা করেছিলেন। ৮০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভায় সোহরাওয়ার্দী তার আওয়ামী লীগ দলীয় ১৩ জন সদস্য নিয়ে বিরুধী দলে অবস্থান নেন। এদিকে কিছুদিন ধরে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ইস্কান্দার মির্জার পৃষ্টপোষকতা ও ইন্ধনে মুসলিম লীগের দলীয় সদস্যদের অনেককে নিয়ে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল সৃষ্টি করা হয়।

এ দল গঠনে আব্দুল গাফফার খানের (সীমান্ত প্রদেশ) ভ্রাতা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব নেতৃত্ব দেন। বাধ্য হয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও তাঁর সরকার পদত্যাগ করেন।

---

১৪৮. National Assembly of Pakistan Debates Vol. II No. 3 10th October, 1956. P. 163

Dhaka University Institutional Repository

কাল বিলম্ব না করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা বিরোধী দলের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৫ জন করে মোট ১০ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রি সভা গঠন করেন। এর সদস্যরা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দী (পূর্ব পাকিস্তান), মালিক ফিরোজ খান নুন (পশ্চিম পাকিস্তান), আবুল মনসুর আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান), সৈয়দ আমযাদ আলী (পশ্চিম পাকিস্তান), এম. এ, খালেক (পূর্ব পাকিস্তান), মীর গোলাম আহমেদ (পূর্ব পাকিস্তান), মিয়া জাফর শাহ (পশ্চিম পাকিস্তান), জহিরুদ্দিন (পূর্ব পাকিস্তান) এবং সরদার আমির আযম খান (পশ্চিম পাকিস্তান)। এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তান থেকে রসরাজ মন্ডল (তফসিলি ফেডারেশন), আবদুল আলিম ও নুরুর রহমান এং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজী মওলা বক্স সুমরো প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভা গঠনে সোহরাওয়ার্দী নিজ দলের বাইরে ৭ জন সদস্য, ২০ জনের মতো রিপাবলিকান পার্টির সদস্য এবং কিছু স্বতন্ত্র সদস্যসহ মোট ৪৭-৫০ জন সদস্যের সমর্থন লাভ করেন।[১৫১]

১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে হোসেন সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর আই. আই. চুন্দ্রিগড় রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। তাঁর সরকার ৩ মাসের কম সময় (১৮ অক্টোবর – ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭) স্থায়ী হয়। এরপর আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির সংসদীয় দলের নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন সরকার গঠন করেন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭)। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় নেতা এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়াদীর সঙ্গে তাঁর এই মর্মে সমঝোতা হয় যে, দেশে যথাশীঘ্র সম্ভব সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা সম্পন্ন করা হবে বলেও স্থির করা হয়। এদিকে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যদের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনা চলাকালে ডেপুটি স্পিকার সাহেদ আলী মারাত্মকভাবে মাথায় আঘাত পেয়ে তিন দিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এমনই এক অবস্থায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।

---

১৫১. Samsul Huda harun Parliamentary Behaviour in A Multi National State, 1947-58: Bangladesh Experience, Dhaka 1948, PP 209-11)

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী ও ইস্কান্দার মীর্জার মধ্যে প্রথম দিকে এক ধরনের সুসম্পর্ক বজায় থাকলেও শীঘ্রই তাতে ফাটল ধরে। পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের কারণে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দিন দিন ঈর্ষান্বিত ও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বস্তুত তিনি (মীর্জা) ছিলেন পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক শক্তি ও স্বার্থের প্রতিনিধি। সরকার গঠনের পর সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার এ শক্তিকে বিচলিত করে। গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ক্ষমতা থেকে তাঁর বিদায়ের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকারোক্তি করেন ঃ-

> '১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবার পর আমার প্রথম বিবৃতিতেই আমি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছিলাম যে, আমার নীতির একটি মৌলিক বিষয়বস্তু হলো প্রথম সুযোগেই দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সে সময়ে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে, (এ দ্বারা) আমি আমার মন্ত্রিসভার পতন আসন্ন ও অবশ্যাম্ভাবী করে ফেলেছি।'

সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করাতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পূর্বে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বেলায় যে কুটকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁরই ইন্ধন ও পরামর্শে রিপাবলিকান পার্টি প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে পূর্বের প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবন দাবি করে। সোহরাওয়ার্দী এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। এরপর রিপাবলিকান পার্টি সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে। এই সুযোগে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সোহরাওয়ার্দীকে প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। সোহরাওয়ার্দী জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে আস্তা ভোট গ্রহণের সুযোগ দানের আবেদন জানালে তা অগ্রাহ্য হয়। অবশেষে তিনি ১১ অক্টোবর পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সামরিক শাসনাধীনে আসে। এর সঙ্গে দেশটির প্রথম এক দশকের রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

তাছাড়া পাকিস্তানের প্রথম দশকে বিশেষত ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার যেসব অর্থনৈতিক ক্ষোভসমূহ ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্ত জননীতি অনুসারে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করলে দেখা যাবে এর পিছনে কয়েকটি কারণ নিহিত ছিল। যেমন- কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে, রাজস্ব বন্টন, পাট এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা।

এর প্রতিটি কেন্দ্রীকতার কারণে সমালোচিত হচ্ছিল এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যুক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এরই চূড়ান্ত পর্যায়ে ছয় দফা রাজনৈতিক কর্ম সূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৬.২ গবেষণার ফলাফল ঃ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের সঙ্গে একজোট হয়ে গণতন্ত্র বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল পূর্বক জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে। সংবিধান ও জাতীয় পরিষদ বাতিলের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রি চুন্দ্রিগড়ের মন্ত্রি সভা বাতিল হয়ে যায়। মির্জা ও আইয়ুবের এই অভ্যুত্থান পূর্ব সমঝোতার ভিত্তিতে জেনারেল আইয়ুব হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আর মির্জা হন প্রেসিডেন্ট। বিলাতের সান্ড হার্স্ট মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আইয়ুব খান ছিলেন সাংঘাতিক ধূর্ত ও উচ্চাভিলাষী। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের মাধ্যমে অতীব ক্ষমতাধর গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করা হয়। বিলে বলা হয় গভর্নর জেনারেলের কর্মক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীও পরামর্শক্রমে পরিচালিত হবে। Governor General shall be bound by the advice of the Prime Minsiter. এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাকিস্তানের ষড়যন্তের রাজনীতির হোতা বলে পরিচিত গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে বরখাস্ত করলেও আশা ব্যঞ্জকভাবে তাকেই আবার সংশোধিত মন্ত্রিসভা গঠন করার নির্দেশ দেয়া হয়। গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদের আদেশ অমান্য করার মত সাহস তার ছিল না। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর গতিবিধির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদের নির্দেশেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আইয়ুব খান যেন রক্তের স্বাদ পেলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বলেছেন Appointing the Commander in Chief as defence Minister in a cabinet of tottering Politicians, was like putting a cat among the pigions. আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্তি বিড়ালকে কবুতর পাহাড়া দেয়ার সাথে তিনি তুলনা করেছেন। চার বছর সামরিক বাহিনীর প্রধানের দায়িত্বপালন শেষে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে সামরিক বাহিনী হতে আইয়ুবের অবসর নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতা লিপ্সু আইয়ুব দূর্বল মন্ত্রিসভার ওপর তার প্রভাব খাটিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব আর এক দফা নবায়ন করে।[১৫২]

১৫২. জেনারেল খালিদ মাহমুদ আরিফ - Khaki Shadows (1947-1977)|

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের সামরিক আইন জারির তিন সপ্তাহের মাথায় ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে আর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে নিজে দেশের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসকের পদ দুটি দখল করেন। আইয়ুব ভাল করেই জানতেন যে, সামরিক বাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে গণ্য করা হবে যা সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার ও লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হিসেব অনুযায়ী সরাসরি সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। এটি মাথায় রেখেই আইয়ুব তখন সিভিল প্রশাসনের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে ব্যবহার করে ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করান। আর তখন এটিকে সামরিক অভ্যুত্থান না বলে বিপ্লব বলে প্রচার করাহয়। আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনকালে এটিকে বিপ্লব দিবস হিসেবে পালন করা হতো। সামরিক শাসন জারির সাথে সাথে নিয়ম অনুযায়ী সমগ্র পাকিস্তানে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফার খান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী , সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জিএম সাঈদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমেদ, শেখ মুজিব, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই ইস্কান্দার মির্জাকে এক কাপড়ে বিমানে তুলে লন্ডন পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তিনি লন্ডনের বিখ্যাত ক্লারিজেস হোটেলের জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন।

৬ ঃ ৩ অভিমত

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কথা তাকে ভাবতে হতো, সমগ্র বাঙালী জাতির অগ্রগতির চিন্তায় তিনি ছিলেন মগ্ন। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একটি সঙ্গতিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলার মানুষ হককে স্মরণ করে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, বিপুল সংখ্যক কৃষকের দারিদ্র বিমোচন ও তাঁর উদার প্রকৃতির জন্য।

গ্রামীণ অভিজাতদের তাঁর শক্তির ভিত্তিরূপে গড়ে তোলা ছিল এ.কে. ফজলুল হকের রাজনৈতিক কৌশল। স্বল্পস্থায়ী কলকাতা কৃষি সমিতি (১৯১৭) এবং বেঙ্গল প্রজা পার্টি নামে আরও একটি স্বল্পস্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এ পার্টিই নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে কৃষক প্রজা পার্টি রাখা হয় এবং ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য হক, মাওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারনার পক্ষে জনগণকে সমবেত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শেরে বাংলার ভক্তি ও উৎসাহ সঞ্চয়ের ক্ষমতা বিপুল ভোটে ফ্রন্টের জয় লাভের একটি প্রধান কারণ ছিল। জয় লাভের পর যে মন্ত্রিসভা প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে তা ছিল বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর দ্বিগুণ, যাদের আদর্শগত অবস্থান ছিল ভিন্ন। কিন্তু ফজলুল হকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই এ ঐক্য সম্ভব হয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন সকলেরই আস্থাভাজন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কোয়ালিশনে দলগত বিতর্ক ও কলহ শুরু হলে যুক্তফ্রন্ট হুমকীর সম্মুখীন হয়। এটা ঘটেছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আনুগত্য পরিবর্তন এবং প্রদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভে লীগের দৃঢ় সংকল্প।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এ.কে. ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হন। যদিও আইনসভায় তার দল আওয়ামী মুসলীম লীগের চেয়ে অনেক কম আসন লাভ করেছিল। এটা তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশক। পাকিস্তানের সদ্য গঠিত গণপরিষদে হকের যথেষ্ট সমর্থক ছিল। তারা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করতেন, যার ফলে ১৯৫৫ সালের আগষ্টে ফজলুল হককে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন এবং ১৯৫৮ সালে সে পদ থেকে অপসারিত হন। তারপর থেকেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রণ করেন।

এই পটভূমিকালে সামনে রেখে আমরা কৃষক শ্রমিক পার্টির বিশেষত ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে ভূমিকা ও অবস্থান এবং পরিণতির উপর অভিমত ব্যক্ত করবো। গবেষণার অনুসন্ধানের পর আমি ও পর্যায়ে আমার অভিমত তুলে ধরবো।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি বাংলার জন্য একটি বিকল্প ধারার সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিল। তা ছিল আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা। 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ' কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ফজলুল হকের পক্ষে ফ্লাউড কমিশন গঠন ব্যতীত এ লক্ষ্যে আর কিছু করা সম্ভব হয় নি। যেহেতু প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেহেতু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দও এর অংশীদার ছিলেন। ফলে দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থকে সামনে রেখে তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোন যৌক্তিকতাই থাকলো না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭-১৯৪৭ কালপর্বে বাংলায় যে চারটি মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ছিল সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা কতিপয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন রচনা করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য মন্ত্রিসভা একদিকে যেমন স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন থাকে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তাদের প্রায় পুরো সময়ই ব্যয় করতে হয়। এ কথা ঠিক যে, ফজলুল হক ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নিজ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার আমলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীদের কাছে সরকার মনোনীত প্রার্থীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ও জামানত হারায়। আইনসভার ভিতরে সরকারি দল প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সদস্যরা পক্ষ পরিবর্তন করে লীগে যোগদান শুরু করে। অবশেষে ফজলুল হককে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়, কেননা তখন পর্যন্ত তাঁর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন বহাল ছিল।

বাংলাকে ঘিরে ফজলুল হকের যে রাজনৈতিক স্বপ্ন ছিল প্রকৃতভাবে তাঁর সে স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে। আসলে বহু আগেই কৃষক প্রজা পার্টির দ্বিধাবিভক্তি ও আনুষ্ঠানিকভাবে ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদান করার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে অস্থির করে তোলে।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সন পর্যন্ত তাঁকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তেমনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও তিনি ছিলেন অস্থির এবং দ্বিধাগ্রস্থ। যার ফলে তাঁর নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেও দ্রুত হারিয়ে যেতে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হকের মধ্যে একজন বড় মাপের নেতার বহু গুণই ছিল। কিন্তু তিনি একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেননি। তাই আমরা দেখতে পাই কৃষক শ্রমিক পার্টিকে তিনি একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে না তুলে বরং নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন।

স্বভাবতই দলে নেতৃত্ব ধরে রাখার মত নেতা সৃষ্টি হবার সুযোগ একদিকে যেমন সীমিত হয়ে পড়ছিলো অপর দিকে দলটি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, বলা যায় ১৯৪৭ সালে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠে তখন পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ নতুন পথের দিগন্ত খুঁজে পায়। তাই তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাদের মোহ ভেঙ্গে যায়। কেননা তারা তাদের কল্পিত পাকিস্তানে যে স্বপ্নের স্বাদ পেতে চেয়েছিল সে পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ। কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাঙালীদের অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উদাসীনতা, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাঙালীদের রাজনৈতিক নের্তৃত্বের অভাব ইত্যাদি কারণে বাঙালী জনগণ তথা রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। প্রথম থেকেই অবাঙালী শাসকবর্গ বাংলাকে একটি কলোনী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কখনও পূর্ব বাংলার ন্যায় দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন দেয়নি। সুতরাং বলা যায় পূর্ব বাংলার ইতিহাস ছিল মূলতঃ শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের ঐ অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের রোষানলে পড়ে, যার ব্যাপক নগ্ন প্রকাশ ঘটে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী পরিষদের ওপর হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে।

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি ও এদলের নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হকের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অনুসন্ধান শেষে আমাদের সামনে গণ জাগরণ ও নিয়মতান্ত্রিকতা সৃষ্টির অঙ্কুরোদগমের চিত্র উপস্থাপতি হয়। সামরিক শাসকের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যা বারে বারে ব্যহত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক দল হিসেবে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এর নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৫৪-১৯৫৮ সময় কালে যে ভূমিকা পালন করেছেন তার সফলতার সিঁড়ি পেরিয়ে এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী কালের রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক শাসন বিরোধীগণ, অভুত্থানের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পথে যে সফলতা আসে তার ধারাবহিকতায় আসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। যার ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

'কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯৫৩ - ১৯৫৮ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ' এই গবেষণা কর্মটিকে তথ্যবহুল, সমৃদ্ধ ও বিরল কিছু বিষয় সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল ঘটনা সংগ্রহের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্ন পত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছি তার নমুনা অপর পৃষ্ঠায় প্রদান করা হলো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ

*	এ.কে. ফায়েজুল হক	–	শেরে বাংলার পুত্র
*	অধ্যক্ষ এনায়েত করিম	–	চাখার
*	প্রফেসর ড. পারভীন হাসান	–	মরহুম সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়ার কণ্যা, অধ্যাপক ঢাবি
*	প্রফেসর ড. হারুন-অর রশীদ	–	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
*	ড. অরুন কুমার গোস্বামী	–	জগন্নাথ, বিশ্ববিদ্যালয়।
*	ফখরুল ইসলাম খাঁন	–	সম্পাদক,সাপ্তাহিক খাদেম, বরিশাল।
*	কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদ	–	সভাপতি, বরিশাল বিভাগ সমিতি, ঢাকা।
*	সৈয়দ আশরাফ আলী	–	সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

১. কৃষক প্রজা বা কৃষক শ্রমিকদের কল্যানে তাদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ফজলুল হকের মানসিক ইচ্ছা কি কারণে গড়ে উঠেছে ?

২. দল গঠনে কাজের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কেন ?

৩. বৃটিশ ভারতে এ ধরনের দল গঠন বা এই শ্রেণীকে নিয়ে রাজনীতিতে আসতে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল ?

৪. বৃটিশ ভারত ও পাকিস্তানে এই দলের লক্ষ্য, কার্যক্রম ও ভূমিকার মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করেন ?

৫. দলটির সবচেয়ে সফলতা কখন এবং কি কারণ বলে আপনি মনে করেন ?

৬. দলে কৃষকদের ভূমিকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?

৭. ব্যক্তি কেন্দ্রিক না আপামর জনগণের দলে পরিণত হতে পেরেছিলো- হ্যাঁ বা না হলে কেন?

৮. দলটির সীমাবদ্ধতাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?

৯. পাকিস্তানের রাজনীতির ধারার সঙ্গে কৃষক শ্রমিক দলটির সংঘাত কি ছিল ?

১০. যে উদ্দেশ্য নিয়ে দলটি গঠিত হয়েছিল তা কেন সফল হোল না এর দুর্বলতাগুলো আপনি কিভাবে চিহ্নিত করবেন ?

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

আব্দুল করিম	ঃ	ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।
তফাজ্জুল হোসেন মানিক মিয়া	ঃ	পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর সম্পাদনা; আব্দুল হামিদ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৬০।
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা, কলিকাতা, জি, এ, ই, পাবলিশার্স, ১৯৬৮।
বদরুদ্দীন ওমর	ঃ	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খন্ড, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৩।
বদরুদ্দীন ওমর	ঃ	পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ২য় খন্ড, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৩।
আবুল মনসুর আহমেদ	ঃ	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৮।
কালিপদ বিশ্বাস	ঃ	যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৬।
আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমেদ রেজা	ঃ	২১ দফা থেকে ৫ দফা, ঢাকা ১৯৮৭।
ওলি আহাদ	ঃ	জাতীয় রাজনীতি।
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার	ঃ	সোহরাওয়ার্দী স্মৃতিকথা।
বিডি হাবিবুল্লাহ	ঃ	শেরে বাংলা, ১৯৬২ বরিশাল, ঢাকা।
এস,এম আজিজুল হক	ঃ	শতাব্দীর কণ্ঠস্বর, ঢাকা, ১৯৬৬।
খন্দকার আব্দুল খালেক	ঃ	এক শতাব্দী, ঢাকা, ১৯৬৪
অমলেন্দু দে	ঃ	পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, ১৯৭১।
মোঃ আব্দুল খালেক সম্পাদিত	ঃ	মহাপুরুষ ফজলুল হক, ১৩৯০।
কামরুদ্দীন আহম্মেদ	ঃ	বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ ১ম খন্ড, ঢাকা।
সিরাজুল ইসলাম	ঃ	ফজলুল হক স্পীকস ইন কাউন্সিল ১৯১৩-১৬, ঢাকা. ১৯৬৭।
অমলেন্দু দে	ঃ	স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস, পরিণতি, কলিকাতা, ১৯৭১।
সিরাজউদ্দিন আহমেদ	ঃ	বরিশালের ইতিহাস, ১৯৮৫, ঢাকা, বরিশাল।
আবুল মনছুর আহমেদ	ঃ	আত্মকথা।

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Ahmed, Kamruddin : The Social History of East Pakistan Dhaka Pioneer Press, 1969.

Ahmed, Mushtaq : Government and Polities in Pakistan Karachi, Pakistan Publishing 1963.

Anishur Rahman, Mohamed : East and West Pakistan: A Problem the Political Economy of Regional Planning: Cambridge Center for International Affairs, Harvard University, 1968.

Ayub Khan, Mohammad : Friends Not Masters, A Political Autobiography London, Oxford University Press, 1967.

Beveridge, Lord : India Called Them London, Allen and Union Ltd. 1957.

Binder Leonard : Religion and politics in Pakistan, Berkely. University of California Press, 1961.

Moniruzzaman Talukdar : The Bangladesh Devolution and its Aftermath Dhaka, Bangladesh Books International, 1980.

i an Stephems : Paleistan : Old country New Nations (London 1963).

Kamrul ahsan, Sayed : Polities and personalities in Pakistan (Dacca 1967).

Chowdhuary, G.W : The Last Days of United Pakistan, London, C Hurst and company, 1974.

Chowdhuary, G.W : Democracies in Pakistan Dhaka, Green Book House (1962).

Chowdhuary, Najma : The Legislative Process in Bangladesh : Polities and Functioning of the East Bengal Legislates, 1947-1958 University of Dhaka, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

Harun, Shamsul Huda : Parliamentary behaviors in a multi national state (1947-1958) Bangladesh Experience, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh 1984.

Jahan, Rounaq : Pakistan : Failure in National Integration, Dacca Oxford University press, 1973.

Karl Von Vorys : Political Development in Pakistan, Princeton Princeton University Press, 1965.

Khan Fazal Muqueen : Pakistan's Crisis in Leadership, Lahore, National Book Foundation, 1966.

Moniruzzaman Talukder : The Polities of Derailment : The case of Pakistan (1947-1956). Dhaka Green Book House Ltd 1971.

Newman, K.J : Essays on the constitution of Pakistan, Dhaka, Cooperative Book Society, 1956.

Rashiduzzaman M : Pakistan : A Study of Government and polities Dhaka, Ideal Library, 1967.

Ray Jayanta Kumar : Democracy and Nationalism on Trial : A study of East Pakistan, Simla, Indian Institute of Advanced Study, 1968.

Sayeed K.B : Pakistan : The Formative phase, Karachi, Pakistan publishing House, 1960.

Sayeed K.B : The Political System of Pakistan, Karachi, Oxford University Press, 1967.

Ziring, Lawrence : The Ayub Khan Era : Polities in Pakistan 1958-1969, Syracuse, Syracuse University Press, 1971.

Afzal M Rafiqul : Political Parties in Pakistan 1947-1958, Islamabad, 1986.

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed Emajuddin	:	Bangladesh Polities C.S.S.DU, 1980.
Allama, Ghulam Ali	:	Pakistan Movement Historic Document, Karachi, University of Karachi, 1967.
Azad Maulana A,K	:	Indian wins Freedom New York, Long mans Green and Co, 1960.
Callard Keith	:	Political Force in Pakistan 1947-59, New York, Institute of Pacific Relations, 1959.
Coup Land R	:	Report on the constitutional problem in Indian London; Oxford University Press, 1943.
Gopal, S	:	British Policy in Indian Cambridge, Cambridge University Press, 1965.
Khaliquzzaman Chowduary	:	Pathway to Pakistan, Lahore Long mans, 1957.
Khan, Fazal Muqueem	:	The Story of the Pakistan Army, Karachi, Oxford University Press, 1963.
Menon, V.P	:	Transfer of power is Indian Calcutta; oriel Longmans Pvt. Ltd, 1957.
Sen Gupta, Jyoti	:	History of Freedom Movement Of Bangladesh (1943-973), Some Involvements, Calcuta. Naya Prokash, 1974.
Tinker Hugh	:	India and Pakistan: A political Analysis. New York, Fed federick Pnaeger, 1963.

বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ১ম খন্ড রাজনৈতিক ইতিহাস, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৌষ ১৪০০/ডিসেম্বর ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল প্রবর্তন, ইসলাম মোঃ নুরুল। 324.2/ISA

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক একটি বিশ্লেষণ আলম, মোঃ সামছুল 320.95492/ACH

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ভাঙ্গন ঃ সমীক্ষায় আওয়ামীলীগ, আহমেদ, ইয়াসমিন। 320/AHB

বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ ১৯৮২ খাতুন, নাসিমা। 320.5492/KHB

মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন তাহের, তাসনীম। 320.092/TAM

বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা হালদার, রমা রাণী। 324.2/HAB

আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান সিদ্দিকা নাজমুন নাহার। 324.25492/S.A

দফার রাজনীতি ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব সাহা, ভবানী। 320/SHD

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) চুয়ান্ন সালের নির্বাচন ঃ স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে, বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, ১৯৯৩।

মুসা আনসারী : বামপন্থী রাজনীতি, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৩-৩৮।

Chowduary G.W : The East Pakistan Political Scene 1955-1970, Pacific affairs , Vol. XXX, NO-4, December, 1957.

Chowduary G.W : "Failure of Parliamentary Democracy in Pakistan", Parliamentary affairs , vol, XII, 1959.

Muniruzzaman T : "National Integration and Political Development in Pakistan", Asian survey, vol. VII, No. 12, 1967.

Harun or Rashid : "The Muslim League is East Bengal. The 1954 Elections and after". Journal of the Asiatic Society of Bangladesh Vol. XXX III No-1, June 1988 PP 15-27.

Dhaka University Institutional Repository

M. Rashiduzzaman	:	"The Awami League is Political Development in Pakistan Asian survey. Vol. X. No-7 (July 1970).
Mahafuzul Huq	:	Electoral problems in Pakistan (Dacca-1966).
Barnals, William J.	:	"Pakistan : Old issues in New Context". The word today Vol. 26, No 11, November, 1970.
Callard, Keith	:	"The Political Stability of Pakistan Pacific affairs, Vol. XXX, No-1, March- 1956.
Rashiduzzaman, M	:	"The Awami League in Political Development of Pakistan. Asian Survey, July 1970, Vol. X, No-7.
Jahan, Rounaq	:	"Bangladesh Politics (A Collection of Articles) UPL, Dhaka, 1980.

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরজী)

দৈনিক আজাদ	-	২২শে মার্চ ১৯৫৪	-	সম্পাদকীয়
দৈনিক আজাদ	-	৩০ আগষ্ট ১৯৬০	-	"
ইত্তেফাক	-	১৯ এপ্রিল ১৯৫৪	-	"
ইত্তেফাক	-	২২ মার্চ ১৯৫৬	-	"
দৈনিক পাকিস্তান	-	১৯৬৪	-	"
দৈনিক পাকিস্তান	-	১৯৬৫	-	"

The Pakistan Observer	-	May, 5	1958
The Pakistan Observer	-	October, 3	1958
Dawn	-	February, 23	1955

Dhaka University Institutional Repository

দলিল (Documents)

1. East Pakistan Assembly Processdings, Vol XV 1, No-6, 1957.
2. Constitutional Assembly of Pakistan Debates, Vol. 2 No. 1 (February 24, 1948).
3. Election Commission of Bangladesh, Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly 1954 (May 1977).
4. সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর ১৯৫৫।
5. Pakistan Review, 11.6 (1954)
6. Report of the Election to the East Bengal Legislative Assembly, 1954.
7. Report of the Constitution Commission, Pakistan, 1961.
8. বঙ্গীয় আইনসভার কার্যবিবরণী, ১৯১৩-১৯৪৭।
9. Constitutional Assembly of Pakistan Debates, Vol. XV, 1954 (14 March 1954 to 21 September, 1954).
10. Constitutional Assembly Debates, Vol, XV 1, No- 27 (15 September, 1954).
11. পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার কার্যবিবরণী- ১৯৪৭-১৯৫৮
12. পাকিস্তান গণপরিষদের কার্যবিবরণী- ১৯৫৫-১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছক

ক্রমিক

১. ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

২. ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

৩. ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলীম লীগের কমিটি

৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

৫. যুক্তফ্রন্টের দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন

৬. ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের সার্বিক ফলাফল

৭. ১৯৫০-৫৮ সনে সিভিল সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

৮. ১৯৫৬ সনে কেন্দ্রে সচিব পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব

৯. ১৯৫৬ সনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা পিছু আয়ের পরিসংখ্যান

১০. পাকিস্তানের কেন্দ্রের ১৯৪৭-৫৮ সন পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব।